ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

[মুসলীম যুগ]

ডাঃ বিমল রায়, এম্. বি.

অধ্যাপক, মিউজিক টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, নবদ্বীপ এবং সঙ্গীত-প্রবীণ বিভাগ,
ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ, কলিকাতা। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ ও সঙ্গীত
ভারতীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে সঙ্গীত-ইতিহাসের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা

আপনাকে জানাবার সাধনায়
নিবেদিত প্রাণের উদ্দেশে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ
করলাম

মুখবন্ধ

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে খাঁ সাহেব মেহেদী হুসেন খাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর মুখ থেকে নানা সঙ্গীতবিষয়ক কাহিনী ও ঘরানা-সঙ্গীতজ্ঞদের কীর্তিকথা শুনতে শুনতে সাঙ্গীতিক ইতিহাস সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগে, এবং নানাভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি একখানি খাতায় লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করি। কিন্তু ইতিহাস লিখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি নি বা ইচ্ছাও জাগে নি। বরংচ পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাঠ করে ভারতীয় ইতিহাস-সন্ধানীদের প্রতি বিরূপতা এসেছে, মনে হয়েছে এ ইতিহাস পড়ে লাভ কী। তা ছাড়া, কোন্ সঙ্গীতজ্ঞই বা অকারণে ইতিহাস পড়তে আসবেন ?

১৯৩৯ সাল থেকে আমি সৈদ্ধান্তিক সঙ্গীত সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ও সম্মেলনে আলোচনা আরম্ভ করি। 'সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে **বাহাত্তর ঠাট**।

এই প্রকাশনাসূত্রে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পরিচয় হয় গৌরীপুরের স্বনামধন্যপুরুষ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে একটি গ্রন্থাগার ছিল। সেই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংগ্রহের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় আবার নতুন করে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করবার সুযোগ আসে। পরস্পরবিরোধী বা সংশয়িত এই উপাদানগুলির সঙ্গে খাঁ সাহেব -প্রদত্ত অপ্রমাণিত তথ্যগুলির বিচার করে এই সময়ে আমি মুসলীম ও বৃটিশ যুগ সম্বন্ধে একটি যুক্তিযুক্ত মত গঠনে প্রয়াস পাই এবং সেই মত সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি আমার যুক্তি স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে আরো অগ্রসর হতে বলেন। অপর দিকে বন্ধুবর শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের আগ্রহে 'দীপালি' প্রমুখ পত্রিকায় আমার মতামত সম্পর্কিত কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকি।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে কুমার শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আমন্ত্রণে অমৃত-বাজারের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে Indian Music নামে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করি এবং সঙ্গীতরত্নাকরের পৃষ্ঠা থেকে ধ্রুপদের জন্ম-ইতিহাস উদ্ধার করি। অবশ্য তখনো ধ্রুপদের জন্মের সন-তারিখ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হতে পারি নি, কিন্তু এই আবিষ্কার আমাকে ইতিহাস সম্পর্কে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করল— আমি একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় হাত দিলাম।

এই সময়ে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও তাঁর পুত্রের আগ্রহে আমাকে বেঙ্গল মিউজিক কলেজের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি সেকশনে আই. মিউজ. ও বি. মিউজ. ক্লাসে সাঙ্গীতিক ইতিহাস অধ্যাপনার কর্ম গ্রহণ করতে হয়। পাঠ্যবিষয় ছিল কতকগুলি জীবনীর মাধ্যমে সাঙ্গীতিক বিবর্তনের ইতিহাস শিক্ষা। এইস্থানে শিক্ষাদানকালে পাঠ্যবিষয়-অনুসারে নূতন পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার উৎসাহ পেলাম।

রচনাকার্যে মনোনিবেশ করার কয়েকদিনের মধ্যেই সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের দিক থেকে যুগ্মসম্পাদনায় একখানি সঙ্গীতের অভিধান লিখবার প্রস্তাব এল। সানন্দে সম্মতি দিয়ে একই সঙ্গে দুখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করে চললাম, এবং আশা করলাম ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই গ্রন্থ দুখানি সম্পূর্ণ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হব। কিন্তু এই সময়ে একটি অবিবেচনার জন্য আমার সম্পাদনার কাজ বন্ধ হয়ে রইল পুরো পাঁচটি বছর। সে অবিবেচনা হল গবেষণার দুরাশায়, সাহায্যের মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে একটি সঙ্গীত সংস্থায় যোগদান। গবেষণার প্রকৃত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যে মৌখিক প্রতিশ্রুতির কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে সেই সত্যকে আমি উপেক্ষা করেছিলাম এবং সে কারণে ক্ষতিস্বীকার করতে হল এই পাঁচ বছরের মূল্যবান সময়।

দেখলাম এই অবসরে আরো দু-চারখানি ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—কোথাও যুগালোচনাকে প্রাধান্য দিয়ে, কোথাও-বা সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী আলোচনা করে। এই গ্রন্থগুলিতে আধুনিক গবেষকদের মতামত সংগৃহীত হয়েছে এবং সেদিক দিয়ে গ্রন্থগুলি যুগধর্মী সুতরাং পাঠোপযোগী। সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে উৎসাহী গুণী-জ্ঞানী প্রত্যেকেই এই গ্রন্থগুলিতে আলোচিত তত্ত্ব ও তথ্য -পাঠে উপকৃত হবেন।

কিন্তু কোনো গ্রন্থে একই সঙ্গে দুটির আলোচনা নেই। আমার ইতিহাস পুস্তক এদিক থেকে একক হলেও নানা গোলযোগে সেখানি অসমাপ্ত অবস্থাতেই পড়ে ছিল। গ্রন্থখানির সম্পাদনা এবং প্রকাশ সম্বন্ধে যখন নিতান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, তখন হঠাৎ 'জিজ্ঞাসা'র স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় আমার কাছে স্কুলকলেজের সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যোপযোগী একখানি সঙ্গীতের ইতিহাস পুস্তক রচনা করে দেবার প্রস্তাব করলেন।

এই প্রস্তাবের এবং সজ্জন কুণ্ড মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগের ফল হল আমার 'ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড' গ্রন্থখানি। পাণ্ডুলিপি শ্রীশবাবুর হাতে দিয়েই

আমি নিশ্চিন্ত, প্রকাশনার যা-কিছু ব্যবস্থার ভার তাঁর উপর। প্রুফ দেখা এবং অন্যান্য দায়িত্ব বিশ্বভারতীর শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস মহাশয় নিজ স্কন্ধে নিয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে এঁদের ছোট করব না। শুধু মনে রাখব যে, প্রকাশনের যা কিছু কৃতিত্ব সব এঁদেরই প্রাপ্য ও আমার প্রাপ্য কিছুটা অসম্পূর্ণতার লজ্জা। কারণ, ইতিহাসকে প্রমাণসহ করতে গেলে অপ্রাপ্ত, অপ্রকাশিত প্রমাণপঞ্জী, পাণ্ডুলিপি ও স্থানীয় বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার নিতান্ত প্রয়োজন, সে অভিজ্ঞতা আমার হয় নি এবং আমি জানি এরূপ ক্ষেত্রে তথ্য খণ্ডিত বা বিকৃত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আমার অসম্পূর্ণতার মধ্যে যতটুকু আমি দিতে পারলাম তা থেকে সঙ্গীত-সেবী ব্যক্তিগণ যদি কিছুমাত্র উপকৃত হন তা হলেই শ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থে লোকসঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার সঙ্গীতেরই ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস স্থানীয় পণ্ডিতগণ বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করেছেন বলে কর্ণাটক সাঙ্গীতিক বৃত্তান্তগুলিকে কিছু সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। কীর্তন ও ভজন -সম্পর্কিত ইতিহাস প্রয়োজনানুরূপ করবার চেষ্টা করেছি। কতদূর কৃতকার্য হয়েছি তা বিচার করবার ভার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর।

শেষ এই কথাটাই বলতে চাই যে, পরিশিষ্ট এ গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, আমার গ্রন্থের বক্তব্য বিনির্ণয়ে যা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। পরিশিষ্টটি এই গ্রন্থের পরিপূরক অংশ। অধ্যায়গুলির একত্রীকরণকালে যে যে মন্তব্য বা বক্তব্য বাদ পড়েছে সেইগুলিকে পরিশিষ্টের ক অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিশিষ্টের খ অংশে বিভিন্ন গ্রন্থকারের মতামত সম্বন্ধে প্রয়োজনমত আলোচনা করা হয়েছে, গ্রহণের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশনা-প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কথা। তিনি আজ পরলোকে, কিন্তু তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক কথাগুলি চিরদিন আমার মনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। কুমার শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাগচী নানা-ভাবে উৎসাহিত করে আমার লেখনীকে সচল রেখেছেন। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। পরমবন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের ভালোবাসা আমার পাথেয়; আর পাথেয় আমার গুরু খাঁ সাহেব মেহেদী হুসেন খাঁর স্নেহ— স্বর্গপারের ঐ দিশারীকে আমার সশ্রদ্ধ আদাব।

১৯৬৪ শ্রীবিমল রায়

উপক্রমণিকা

প্রয়োগসিদ্ধ বস্তুগুলি অন্যনিরপেক্ষ, অতএব তার পক্ষে ইতিহাসের প্রযোজন অতি সামান্যই— এই ধারণা আজও অত্যন্ত প্রবল। সঙ্গীতগুণী যাঁরা তাঁদের কাছে ইতিহাস কেন, উপপত্তিরও কোনো মূল্য নেই, কারণ তাঁরা ক্রিয়াত্মক সঙ্গীত নিয়েই ব্যস্ত, এবং নানা ভাবে তার উন্নতিকরণেই ব্যাপৃত। কিন্তু মূলকে ছেদন করে শাখাপ্রশাখার উন্নতিকামনা নিরর্থক। প্রাচীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তবে তো নবীন নূতনতর হবার স্পর্ধা প্রকাশ করবে। সেই প্রাচীন তথ্য সংকীর্ণ, স্বল্পপ্রসারী দৃষ্টিতে যতটুকু দেখা যায সেইটুকুই নয়, অপ্রত্যক্ষ বহুদূর অবধি রয়েছে তার বিস্তার। সুতরাং আধুনিক তখনই নবীন ও সার্থক যখন সে প্রাচীনকে অতিক্রম করে অচিন্ত্যপূর্ব কোনো সৃষ্টির পানে অগ্রসর হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগবে, ঐ সৃষ্টি যে অচিন্ত্যপূর্ব সে কথা জানা যাবে কী উপাযে।

একমাত্র উত্তর আসবে— ইতিহাসের শিক্ষা থেকে। ইতিহাস যদি শুধুমাত্র কতকগুলি ঘটনার পঞ্জী হতো, তবু তার মূল্য কম হত না। কারণ কবে কী হয়েছিল, কী সৃষ্টি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এটুকু জানারও দাম অনেক। কিন্তু ইতিহাস তো ঐটুকু জানিয়েই নিশ্চিন্ত হয় না, সে বিবর্তন-বিচিত্রতার সংবাদ বহন করে; কোনো বস্তুর জন্ম ও বিকাশের তথ্য প্রকাশ করে; পরিবর্তনের আকস্মিকতার নির্দেশ দেয়; বহিঃপ্রভাবের চিহ্ন ধরে রাখে; প্রাচীন ও নবীনের মাঝের যোগসূত্র সম্বন্ধে অবহিত করে; বিভিন্ন কালের বিশ্বাস, প্রবণতা ও মননশীলতার পরিচয় দেয়; বিকাশ ও প্রকাশ যে অসম্বদ্ধ, বিভিন্নমুখী, বিভিন্নজাতীয় ও নানাস্তরভুক্ত তার প্রমাণ বহন করে; এবং প্রকাশ যে বহু সময়ে পুনরাবর্তন করে তারও ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং সঙ্গীতের চর্চায় ও উন্নতিকল্পে ইতিহাসের স্থান গুরুত্বপূর্ণ; এবং সেই সঙ্গে এই ইতিহাস যাঁদের সাধনায় গড়ে উঠেছে তাঁদের জীবন, কার্যাবলী ও দান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু এই কর্তব্যপালন নির্বিঘ্ন নয়, কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো প্রামাণ্য ইতিহাস দুর্লভ। তার কারণ নিহিত থাকতে পারে বহিঃশত্রু আক্রমণে, গ্রন্থাদির বিনাশের মধ্যে, ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধার মধ্যে, অথবা ইতিহাস-সৃষ্টির

প্রতি বিমুখতার মধ্যে। কারণ যাই হোক, প্রাচীন অস্পষ্ট হওয়ার জন্য নূতন ইতিহাসগ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার; কোনো পরস্পর-সম্বদ্ধ, পরম্পরাযুক্ত গ্রন্থাবলী বা অন্যান্য নির্দেশ না মিললে সত্য ইতিহাস সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, যদিও কল্পনার সহায়তায় অনেক কিছু নির্দেশ গড়ে নেওয়া খুবই সহজ।

বেদ, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য, পুরাণ ইত্যাদিতে কিছু কিছু সাঙ্গীতিক উপকরণ আছে বটে, কিন্তু কালনির্দেশনা না থাকায় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বোধগম্য না হওয়ায় প্রকৃত ইতিহাস-সৃষ্টিতে তা খুব সহায়ক হয় নি। কোন্ গ্রন্থ প্রাচীনতর, কোন্ গ্রন্থ অর্বাচীন, কোন্ জ্ঞানী পূর্বজ, কোন জ্ঞানী কনিষ্ঠ সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য কোথাও নেই, সুতরাং উপাদানগুলির পারম্পর্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হওয়া প্রায় অসম্ভব।

অতএব বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগের বিবরণ ভ্রমসংকুল হতে পারে; এমন অবস্থায় ঐ যুগ সম্পর্কে আলোচনা স্থগিত রেখে যে ইতিহাস কিছুটা প্রমাণবহ তাকে নিয়ে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন। সত্যকথা বলতে কি, সাঙ্গীতিক ইতিহাস অর্থে যা বোঝা উচিত তার আরম্ভ হয়েছে মুসলিম যুগ থেকে; ঐ সময়ের মুসলিম ঐতিহাসিক ও নবাব-ওমরাহদের ঘটনা-পরম্পরার প্রতি নিষ্ঠা বহুভাবে ইতিহাসের সত্য প্রকাশে সহায়তা করেছে। অতএব অস্পষ্ট অতীতের আলোচনা স্থগিত রেখে প্রথমেই আমরা এই যুগের ইতিহাসের কাহিনী দিয়ে আরম্ভ করব। অবশ্য, এ কথা সত্য যে, সাঙ্গীতিক ইতিহাস বলতে যা বোঝায় সে ইতিহাসের উপকরণ মুসলিম যুগেও ঠিকমত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ ঐ যুগের প্রথম দিকে; তবু প্রাচীনের তুলনায় সেটুকু অপ্রতুল নয়, এবং তার বেশীর ভাগটাই প্রমাণবহ ও কার্যকর। এই ইতিহাসের আলোচনাকালে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সাঙ্গীতিক ইতিহাস নিয়ে বহু গুণী জ্ঞানী আলোচনা করেছেন এবং আজও করছেন। কোথায় কী ভাবে গান হত, নৃত্য কেমন ছিল, বাদ্য কত প্রকার পাওয়া যেত, ইত্যাদির বিবরণ তাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন। ঐ দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা না করে এ স্থলে আমাদের কাজ হবে সেইসব স্রষ্টাদের জানবার চেষ্টা করা যাঁরা বিভিন্ন পরিস্থিতি অভিজ্ঞতা ও আত্মিক অনুভূতির সহায়তায় আমাদের সঙ্গীতকে নানা বিচিত্রতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এঁদের কথা জানতে পারলে কোন্ কোন্ আবিষ্কার ভারতের নিজস্ব তাও জানতে পারব, যেমন জানতে পারি গ্রীকদের সাঙ্গীতিক ব্যাপারে। কিন্তু যে কারণেই হোক বহু প্রাচীন

স্রষ্টা হারিয়ে গিয়েছেন কালগর্ভে। এখন প্রয়োজন হল, যাঁরা এখনও সাধারণ ইতিহাসের পাতা আর মনের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যান নি, তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা এবং তাঁদের সৃষ্টির মূল্য নির্ধারণ করা। যেসব ঐতিহাসিক সাঙ্গীতিক তথ্য নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রত্যেকেই বেদের সঙ্গীত নিয়েই শুরু করেছেন এবং করা উচিতও তাই। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত কারণে আমরা প্রথমে মুসলিম যুগ, মধ্যে ইংরাজ যুগ ও আধুনিক যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করব। সব শেষে বৈদিকাদি যুগ সম্বন্ধেও যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে।

পূর্বাভাষ

সঙ্গীত কী ভাবে বিবর্তিত হল তা জানতে হলে বেদ-বেদাঙ্গাদির গভীর অধ্যয়ন অপরিহার্য। এই অধ্যয়নের ফলে একটি অভ্রান্ত তথ্য আমরা জ্ঞাত হই যে, সঙ্গীত বিশেষত মানসিক বস্তু হওয়ার কারণে সর্বদেশেই তার ধারাবাহিক বিকাশের মধ্যে একটি সাদৃশ্য, একটি সামঞ্জস্য আছে। সেই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভারতেও আদিম সঙ্গীত ছিল যার অঙ্গ ছিল গান, বাদ্য ও নৃত্য। বৈদিক যুগে ধর্মীয় সঙ্গীতের চাপে তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল, এবং পরে তার ক্রিয়াকর্ম অন্য রূপ নিয়ে এই ধর্মীয় সঙ্গীতে মিশে গেল। তাই, বেদে একদিকে আমরা যজ্ঞ হতে দেখি, আর তার চারিপাশ ঘিরে গান, বাদ্য ও নৃত্যের প্রয়োগ পাই, অন্যদিকে কৃষ্টির প্রাথমিক পরীক্ষামূলক বিকাশ হিসাবে এক স্বর, দুই স্বর, তিন স্বরের প্রয়োগ-রীতির উল্লেখ দেখি। অর্থাৎ, ধর্মীয় সঙ্গীতের মধ্যেও দুটি পদ্ধতি যে পাশাপাশি চলেছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তবে কৃষ্টি-পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেবার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, যাঁরা এই চেষ্টার পিছনে ছিলেন, কোথাও তাঁদের সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত আমরা পাই না। কয়েক শতাব্দী পরে ধর্মীয় সঙ্গীতের দুটি রূপের প্রভাবে আদিম সঙ্গীত নানা স্থানে লৌকিক সঙ্গীতে পরিবর্তিত হল, এবং এ পরিবর্তনের মূল হলেন শিব নামক কোনো সঙ্গীত-জ্ঞানী। শিবের প্রভাবে লৌকিক সঙ্গীতের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং বৈদিক যুগের শেষের দিকে তার প্রভাবকে স্বীকার না করে উপায় থাকল না। এই সময়ে তিনটি গান-রীতির সৃষ্টি হল— প্রথমটি সামগান, যার সম্পূর্ণ স্বর-সপ্তক তখনও সৃষ্ট হয় নি ; দ্বিতীয়টি গ্রামে গেয় গান, যার রীতিতে আদিমের স্পর্শ ছিল, সমবেত ভাব ছিল, উৎসবাদিতে যার প্রয়োগ হত এবং যার মধ্যে নাট্যের কিছুটা রূপ হয়ত-বা লক্ষ্য করা যেত ; তৃতীয়টি হল শিব-প্রবর্তিত লৌকিক গান, যাতে সাতটি স্বরে গঠিত সপ্তককে খুঁজে পাওয়া যেত— যদিও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটুকুকে আজও আমরা বুঝতে পারছি না।

শিব-প্রবর্তিত লৌকিক গীতির প্রভাবকে অস্বীকার না করেও যিনি বৈদিক গানকে শুদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় রীতির মাঝে কিছু নূতনত্বের প্রয়োগ করলেন তিনি হলেন আদি ব্রহ্মা, যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল শিবের কিছুকাল পরে, বৈদিক যুগের অন্ত্যভাগে। ব্রহ্মার প্রচেষ্টাতেই গান্ধর্ব গীতের প্রচার ঘটল, যাতে লৌকিক-উপাদানের সঙ্গে সামগানের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল। এই গান্ধর্বের

প্রচার ভারতীয় সঙ্গীতের দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ ঐ লৌকিক সপ্তস্বরের প্রভাবে বৈদিক সপ্তক সম্পূর্ণ হবার প্রেরণা পেল, নূতন পরীক্ষা শুরু হল, তিনটি গ্রামের উদ্ভব হল, গ্রাম সৃজন করতে গিয়ে সাতটি স্বরের স্থলে নয়টি স্বরকে খুঁজে পাওয়া গেল, এবং নয়টি স্বরের যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বাইশ শ্রুতির জন্ম হল। ধর্মীয় যে দুটি রীতি ছিল, তার প্রথমটি 'পোপ জন'এর মতো, গান্ধর্বকে মানল না এবং একটি ছোট সাম-গায়ক দলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল; কিন্তু দ্বিতীয় রীতিটি ক্রমে ক্রমে গান্ধর্বের সঙ্গে মিশে গেল। সুতরাং ঠিক বৌদ্ধ-যুগের আগে সাম, গান্ধর্ব ও লৌকিক এই তিন গানরীতি প্রবর্তিত ও প্রচলিত হয়েছিল।

এই সময়ে সদাশিব ও দ্রুহিণ ব্রহ্মা নামে দুইজন প্রসিদ্ধ নাট্যশাস্ত্রজ্ঞের উদয় হয়। সদাশিব লৌকিক নাট্যপদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আর দ্রুহিণ ছিলেন কৃষ্টি-নাট্যপদ্ধতির প্রচারক। নাট্যের মধ্যে বৈদিক যুগের অভিনয়পদ্ধতির সঙ্গে গান্ধর্ব রীতির গানের সংমিশ্রণ করেন এই ব্রহ্মা। নূতন নৃত্যপদ্ধতিও তিনি সৃষ্টি করেন এবং স্বাতি, নারদ প্রভৃতিকে এই পদ্ধতি-অনুগ বাদ্য ও সঙ্গীতে প্রবীণ করে তোলেন। অপর দিকে সদাশিব লৌকিক রীতির অভিনয়ের সঙ্গে লোকধর্মী নৃত্য ও গানের সংযোজনা করেন। যাঁরা লৌকিক রীতির বিরোধী ছিলেন তাঁরা ব্রহ্মাপ্রবর্তিত নাট্যের গানকে নূতন সৃষ্টির সম্মান দিয়ে 'মার্গ' নামে অভিহিত করলেন।

বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মানুরাগীরা ব্রহ্মা ও দ্রুহিণের সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরলেন, সামগান লুপ্তির পথে এগিয়ে গেল, তার গানের শব্দসম্ভার গান্ধর্বে গৃহীত হল, যদিও অর্থ কিছু কিছু বদলাল। বুদ্ধানুরাগিবৃন্দ লৌকিককে গ্রহণ করলেন, নূতন গানরীতি ও নৃত্যপদ্ধতি জন্মাতে লাগল, অন্যান্য স্থানের রীতির বিশেষত্বও এদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকল, এবং তারই ফলে গান্ধর্বের সৈদ্ধান্তিক বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি অবহেলিত হয়ে লুপ্ত হতে লাগল।

তাই পৌরাণিক যুগে শুধু নামগুলিই বেঁচে রইল, তাদের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ভুল তত্ত্ব পরিবেশিত হতে থাকল। তবে গানের উচ্চারণ-ভঙ্গী, লয়ের ও ছন্দের বৈচিত্র্যাদির নূতন চর্চা, শ্রুতি জাতি ও বিভিন্ন তালনামের উদ্ভব ঘটাল। এটুকু লক্ষ্য করা গেল যে, গানের ব্যাপারে লৌকিক রীতি সাধারণের মন বেশী জয় করছে, আর নাট্যের ক্ষেত্রে গান্ধর্ব রীতির প্রয়োগ হচ্ছে বেশী, যদিও লৌকিক রীতির প্রচলনও খুব কম নয়। তাই এক দিকে আমরা তণ্ডু, তুম্বুরু, বাষ্টিক, কম্বল, কশ্যপ, নারদ, আঞ্জনেয়, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি প্রভৃতিকে এই সময়ে দেখতে পাই, আর অন্য

দিকে দেখি স্বাতি, অপর এক নারদ, ভট্টতণ্ডু, নন্দীকেশ্বর, অশ্বতর, বিশাখিল, কাশ্যপ প্রভৃতিকে। প্রথম দলের প্রভাবে লৌকিক নানাভাবে পরিপুষ্ট হতে থাকল, আর দ্বিতীয় দল গান্ধর্ব-নাট্যকে বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে পৃথক পৃথক ভাবে চর্চার ব্যবস্থা করলেন; প্রবন্ধ নামক বস্তুটিও তখন চলতে থাকল।

এই সময়েই সপ্তকের ষড্‌জ পরিবর্তন নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়, এবং তার ফলে গ্রাম-মূর্ছনার উদ্ভব ঘটে। এই মূর্ছনাই জাতি ও রাগ সৃষ্টির প্রথম সোপান। পূর্বে ভাষা ও ভঙ্গী দ্বারা ভাবাভিব্যক্তিই ছিল প্রধান, স্বর ছিল তার বাহন; কিছুকাল পরে অধিগত স্বরগুলিই অনপেক্ষভাবে অভিব্যক্তির বাহক হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তাদের কোনো স্বতন্ত্র নামকরণ হল না। ভাষা, ভাব ও স্থান অনুসারে তাদেব পরিচয় রইল, যেমন আজও পল্লীসঙ্গীতে আছে।

মূর্ছনার জন্মেব পরে দেখা গেল যে, স্বরের নিজস্ব একটি আকৃতি কল্পনা করা যায় এবং তার প্রকৃতিও বিশেষত্বযুক্ত হতে পারে। গান্ধর্ব গুণীরা প্রাচীন গানগুলির পৃথক্ পৃথক্ স্বর আলোচনা করে তাদের নাম রাখলেন 'জাতি', এবং আদিম সপ্তককে তাঁরা আঁকড়ে ছিলেন বলে সেই সপ্তকের সাতটি স্বরনামেই জাতিগুলিকে পরিচিত করালেন। অপর পক্ষে লৌকিক গুণীরা গ্রামকেই প্রধান বলে ধরে নিলেন এবং নূতন সৃষ্টিগুলিকে গ্রামরাগ বলে অভিহিত করলেন। পৌরাণিক যুগে এসে শেষবারের মতো গান্ধর্ব গুণীরা লৌকিক গ্রামরাগ ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করলেন, এবং লৌকিক গীতজ্ঞরা অন্যান্য দেশীরাগ আহরণে প্রবৃত্ত হলেন।

কিন্তু সাত স্বরের জন্মরহস্য, শ্রুতির সৃষ্টিরহস্য, এবং নয়টি স্বরের আবির্ভাব-রহস্য অজ্ঞাত অবস্থায় লুপ্ত হল, যদিও তিনটি গ্রামের প্রচলন তখনও স্বাভাবিক ভাবে প্রয়োগসিদ্ধ হয়ে বেঁচে রইল— অবশ্য খুব বেশীকাল নয়, মুনি ভরতের সময়ের আগেই গান্ধার গ্রাম লুপ্ত হল (শুধু নারদীয় সম্প্রদায়ে আরও কিছুদিন কোনোক্রমে টিকে রইল); নয়টি স্বরকে ভুলে যাবার জন্যই এটা ঘটল। আবার, এরই কাছাকাছি সময়ে সপ্তকের নূতন সংস্করণ হল, যাতে আরোহ গতির ফলে জন্মাল ভরতের সময়কার নয়টি স্বর— অন্তর ও কাকলীকে নিয়ে।

এই মুনি ভরত ও তাঁর শিষ্যরা গান্ধর্ব রীতিকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। লোকরঞ্জক করবার চেষ্টায় এঁরা লৌকিক অনেক-কিছুই গান্ধর্বে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তবু গান্ধর্ব বাঁচল না। অবশ্য, ব্রহ্মার অন্বেষিত বলে মৃত গান্ধর্ব নাট্যগীতি

বহুকাল 'মার্গ' নামে চলেছিল এবং তার কিছু কিছু চর্চাও যে এখানে ওখানে হয় নি এমন নয়। কিন্তু সেটুকু চর্চায় প্রাচীন বস্তুকে বাঁচানো যায় নি, যেমন যায় নি ইয়ুরোপীয় সেক্রেড ম্যুজিক্‌কে—অনেক প্রসিদ্ধ ও সৃজনক্ষম সঙ্গীতজ্ঞ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করলেও।

দুঃখের বিষয় এই যে, এতদিনের ইতিহাসে কে কোন্ দিক দিয়ে কতটুকু কাজ করেছেন তার কিছুই আমরা জানতে পারলাম না, শুধু আনুমানিক পরিবর্তনগুলির উল্লেখ ছাড়া।

ভরতের পরে এল লৌকিক সঙ্গীতের নিজস্ব যুগ, যে যুগে পূর্বকালীন মিশ্রিত গান্ধর্বকে লৌকিকের অঙ্গীভূত করবার চেষ্টা হল। যাস্ক, শার্দূল প্রভৃতি জ্ঞানীবর্গ এদিক দিয়ে অনেক সাহায্য করলেন, এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীরূপে এগিয়ে এলেন মতঙ্গ। তিনি আর লৌকিক নাম ব্যবহার না করে আঞ্জনেয়র অনুকরণে 'দেশী' নামটির প্রচলন করলেন, যার মধ্যে একটি গান্ধর্বমিশ্রিত মার্গী হয়ে রইল, অপরটি রইল বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র দেশী রূপে।

দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দ থেকে দশম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আর যাঁরা এলেন, তাঁদের নিজস্ব দান তেমন কিছু নেই, তাঁরা কেবলমাত্র টীকাকারের কাজটুকু করে গেলেন, অতএব আপাততঃ তাঁদের সম্বন্ধে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে গ্রীকদের, পারসিকদের, আরবীয়দের আক্রমণ শেষ হয়েছে, তাঁদের প্রভাবও পড়েছে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর, এমন সময়ে আসছেন সুলতান মামুদ।

কর্ণাটক স্বরসপ্তক তখন আর্যপ্রভাব স্বীকার করেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবকে উপেক্ষা করে নি। তাই বারোটি স্বরের স্বাভাবিক ব্যবহারকে সে মেনে নিয়েছে। কুড্ডুমিয়ামলাইতে গ্রামরাগের উল্লেখ থাকলেও স্বরনাম প্রকাশ করবার সময়ে বারোটি স্বরেরই প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। মহম্মদ বিন কাসিম অষ্টম খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে যে সব ইয়েমেনী মুসলমান ছিলেন তাঁদের অনেকে মুলতানে বসবাস করতে থাকেন; এঁদের মধ্যে আরবীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ছিলেন। সুলতান মামুদ প্রভৃতি একাদশ খৃষ্টাব্দের ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আফগানিস্থান ও মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তানের অধিবাসী। এঁদের মাধ্যমে তুর্কী গানরীতিও ভারতে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ মহারাজ ভোজ জীবিত ছিলেন। মতঙ্গ ও ভোজের মধ্যবর্তী সময়ে যাঁদের পাই তাঁরা বেশীর ভাগই

নাট্য-শাস্ত্রের ভাষ্যকার। নাম করবার মতো সঙ্গীতজ্ঞ বলতে এ সময়ে সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষ ও ভোজরাজকেই পাওয়া যায়, যেমন পৌরাণিকযুগে পাই উদয়ন, বাসবদত্তা প্রভৃতির নাম।

ভোজের পর দেখা পাওয়া গেল যে জ্ঞানীগুণীদের তাঁরা সাধারণতঃ গান্ধর্বকে অনুসরণ করারই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্গী অর্থাৎ মার্গদেশীকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নান্যদেব, জয়সিংহ, পরমর্দী, সোমেশ্বর, জগদেকমল্ল, হরিপাল, চতুর্থ সোমেশ্বর বা সোমরাজ প্রভৃতি এই যুগে মার্গদেশীর চর্চা করেছেন এবং এঁদের মধ্যে দু জন সোমেশ্বরই প্রধান ছিলেন যাঁরা রাগ ও প্রবন্ধের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। পরমর্দীর নামও এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

তার কিছুকাল পরেই মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন, এবং মুসলিম যুগ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের মাঝে এই সময়ে কোনো সঙ্গীতের কথা শোনা যায় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানও তখন নীরব। হিন্দুরা সন্ত্রস্ত, মুসলমানেরা জয়ের পৈশাচিক উল্লাসে আত্মহারা ; হিন্দুর যা-কিছু তখন নষ্ট হচ্ছে, সঙ্গীতগ্রন্থ আগুনে পুড়ছে। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে সঙ্গীত-শাস্ত্রকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন শার্ঙ্গদেব তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন পুস্তক থেকে সার অংশ সংকলন করে, নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ঐ সংকলনে মিশিয়ে 'সঙ্গীতরত্নাকর' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করে। আমাদের গ্রন্থ আরম্ভ হল সেই বরেণ্য শার্ঙ্গদেবকে নিয়ে। সমসাময়িককালে আর এক নমস্য ব্যক্তিও আপনাকে অজ্ঞাতপরিচয় রেখে ঐ সময়ে প্রচলিত বহু সাঙ্গীতিক তথ্য আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত সময়সার'এর মাধ্যমে, তিনি হলেন পার্শ্বদেব ; পথিকৃৎ জ্ঞানে তাঁর নামও গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

প্রথম অধ্যায়

শার্ঙ্গদেব

প্রাচীনকালে বংশের পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার রীতি ছিল না। সুতরাং কোনো ব্যক্তির নাম ভিন্ন আর কিছু জানবার থাকলে অপর কোনো শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির উক্তি বা বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়। সঙ্গীত-ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঐরূপ বিবরণ সংগ্রহ করাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। সান্ত্বনার বিষয় এই যে, মধ্যযুগে কয়েকজন লেখক নিজ নিজ পরিচয় তাঁদের গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে লিখে রেখে গিয়েছেন। তা থেকে ঐ ব্যক্তিরা কোন্ সময়ের অন্ততঃ সেইটুকু আমরা আন্দাজ করতে পারি।

শার্ঙ্গদেবের বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, যদি তিনি তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে নিজ বংশ সম্বন্ধে কিছু না বলে যেতেন। অবশ্য তাঁর বিদ্যার কৌলিন্য সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নির্বাক রয়েছেন, কাজেই তাঁর বংশে কেউ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কি না, বা তিনি কী ভাবে সঙ্গীতশিক্ষার প্রেরণা পেলেন, সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য জানা এখন আর সম্ভবপর নয়। তবে কাশ্মীরের যে বিবরণ 'রাজতরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, কাশ্মীর এককালে সঙ্গীতের পীঠস্থান ছিল এবং শার্ঙ্গদেব পরম্পরাগত ভাবেই সঙ্গীত বিষয়ে প্রেরণা পেয়ে এসেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে কোনো সংবাদই অবশ্য জানা যায় না। শার্ঙ্গদেবের পিতামহ ভাস্কর দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে কাশ্মীর পরিত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে এসে বসবাস করতে থাকেন। ইনি বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শার্ঙ্গদেবের পিতা সোঢল জৈবনগরে বাস করতেন এবং রাজা ভিল্লম ও মহাপ্রতাপী সিংহণের আশ্রিত মহাকরণিক ছিলেন। এই সিংহণ যাদববংশীয় রাজা ছিলেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়; ইনি ১২০৮ থেকে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। শার্ঙ্গদেব এঁরই রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন।

যাদবরাজ্য মহারাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত ছিল। এই রাজ্য যে সম্পদশালী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু সঙ্গীতের দিক দিয়ে এই স্থান কতটা উন্নত ছিল তার কোনো সংবাদ জানা যায় না। শার্ঙ্গদেব গুরু শব্দের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কে গুরু ছিলেন সে কথা জানান নি। তিনি নিজে যে

সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন এ সংবাদ অবশ্য স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন; তা ছাড়া তাঁকে চিনবার, তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ স্বরূপ রেখে গিয়েছেন 'সঙ্গীতরত্নাকর' নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থখানি।

এই গ্রন্থ কবে লেখা হয়েছিল তা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য, তবে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসরের আগে কোনো গ্রন্থ সম্পাদনা করতেন না, এবং দ্বিতীয়তঃ রাজ্যে কোনো অশান্তি ঘটবার আগেই এ গ্রন্থ শার্ঙ্গদেব রচনা করেছিলেন ও প্রচার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তা হলে সিংহণদেবের রাজত্বের শেষ দিকে অথবা তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সঙ্গীতরত্নাকরের প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত হয়েছিল ধরে নিতে হয়। সিংহণের রাজত্বের প্রথম দিকে যদি শার্ঙ্গদেবের জন্ম-সময় ধরে নেওয়া হয়, তা হলে গ্রন্থসংকলন ১২৪৮ থেকে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল মনে করতে হয়।

তারপর নূতন করে মুসলিমরা ভারতের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালায়, সঙ্গীতগ্রন্থাদি বিনষ্ট হতে থাকে, সদাশিব, শিব, ব্রহ্মাদির গ্রন্থ লোপ পায়; কিন্তু সঙ্গীতরত্নাকর পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির সংকলনরূপে বর্তমান থেকে ঐ লোপজনিত ক্ষতিকে অনেক পরিমাণে পূরণ করে দেয়।

তার পরবর্তীকালে মুসলিম-শাসনে সঙ্গীতের মূলসূত্রগুলি যখন পরিবর্তিত হতে থাকে, রীতি অন্য রূপ অনুকরণ করতে আরম্ভ করে তখন টীকাকার *সিংহভূপাল* (১৪শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ), *কল্লিনাথ* (১৫শ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ) প্রভৃতির অনুগ্রহে সুবোধ্য হয়ে সঙ্গীতরত্নাকর ভারতীয় সঙ্গীতের মূল-তত্ত্বকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

আজ এই গ্রন্থের কৃপায় আমরা হারিয়ে যাওয়া সাঙ্গীতিক তথ্য সম্বন্ধে নূতনভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছি, এবং সঙ্গীতের পরিবর্তন কোন্ দিকে ও কতটুকু হয়েছে তারও একটা খোঁজ পাচ্ছি। সঙ্গীতরত্নাকরের আগে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ আর একখানিও পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়ে স্বর, রাগ, প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ, বাদ্য, তাল ও নর্তন সম্বন্ধে এমন বিশদ আলোচনা আর কোথাও দেখা যায় না। গান্ধর্ব-গীতির বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ যেভাবে শার্ঙ্গদেব প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয়, তিনি ঐ রীতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থেই প্রাচীন স্বরলিপির একটি উন্নত রূপ লক্ষ্য করা গেল। তিনি যে নিজে একজন স্রষ্টা ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়

নিঃশঙ্কবীণার স্বজনে। রাগ অধ্যায়ে ভারতীয় সঙ্গীতের উপর মধ্য এশিয়ার প্রভাবের ইঙ্গিত দিলেন শার্ঙ্গদেব কয়েকটি রাগ-নামের উল্লেখ করে। প্রকীর্ণ অধ্যায়ে গায়ক সম্বন্ধে, গান-কৌশলাদি সম্বন্ধে এবং আলাপ-আলপ্তি সম্পর্কে গ্রন্থকর্তা বিশদ আলোচনা করেছেন বলেই আমরা আজ বুঝতে পারছি, আধুনিক কালের সঙ্গে কতটুকু মিল বা অমিল ঐ সময়ে ছিল এবং কী প্রকারে ঐ অমিলটুকু এসেছিল। প্রবন্ধ অধ্যায়ের সালগসূঢ় অংশ চোখে পড়াতেই আমরা জানতে পারলাম (১৯৫৩ খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম জানতে পারলাম) যে, এতদিন ধ্রুপদ ধমার ইত্যাদির জন্ম ইতিহাস বলে যা জানানো হচ্ছিল তা নিতান্তই কাল্পনিক; এবং মুসলমানী প্রভাবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের অতি বিচিত্র, অভারতীয় পরিবর্তন ঘটেছে বলে যা প্রচার করা হচ্ছিল তা যে কত ভ্রমাত্মক সে কথা বুঝতে পারা যায় প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ ও তাল অধ্যায় ক্রমান্বয়ে অধ্যয়ন করে। বাদ্য অধ্যায়ে বংশী সম্পর্কে যে ইঙ্গিত শার্ঙ্গদেব দিয়েছেন তাকে অবলম্বন করলে সামান্য পরিশ্রমে আমরা প্রাচীন যুগের দেশী স্বরসপ্তক আবিষ্কার করতে পারি এবং সে বংশী যে বহুপ্রাচীনকাল থেকে অনার্যদের মধ্যে এবং পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত ছিল তারও প্রমাণ মেলে।

বস্তুতঃ শার্ঙ্গদেব প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সম্পর্ক স্থাপনের পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন; আমাদের শুধু পথটুকু ধরে এগিয়ে যাওয়া বাকি আছে।

শার্ঙ্গদেব নিজের নাম রেখেছিলেন নিঃশঙ্ক— সার্থক সে নাম। তিনি নির্ভীকভাবে বলে গিয়েছেন যে, যা প্রয়োগক্ষেত্রে বর্তমানে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছে তাই প্রকৃত শাস্ত্র— শুষ্ক প্রয়োগকার্যে অবহেলিত শাস্ত্রের কোনো মূল্য নেই; স্বীকার করে গিয়েছেন যে, গান্ধর্ব বা মার্গ গীতি গ্রন্থের পাতায় আশ্রয় নিয়েছে, যা প্রচলনে আছে তা হল দেশী গীতি— যা অনড় নিয়মকে স্বীকার করে না, নির্দিষ্ট মাত্রিক ও কলানুগত তালবন্ধনে আপনাকে বাঁধে না।

শার্ঙ্গদেব কেবল একটি জায়গায় কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন, তিনি সংকলনের ব্যস্ততায় নিজের সময়ে প্রচলিত স্বরসপ্তকের কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। আপন বিবেচনা অনুসারে তাদের বিচার যে একেবারে অসম্ভব একথা না বললেও রাগের ব্যাপারে কোন্‌টা কোন্ সময়ের সংগ্রহ সেটা না জানলে সব ক্ষেত্রে স্থিরসিদ্ধান্ত হওয়া একরূপ অসাধ্য; এবং এই অসাধ্যতার জন্যই সর্বভারতীয় সাম্যতা ব্যাপারে জোর করে কিছু বলার উপায় থাকে না; দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় বলে যে দুটি পদ্ধতিকে আমরা এতকাল পৃথক বলে জানি,

প্রাচীনকালেও তারা এইভাবেই পৃথক্ ছিল কি না এ সংবাদ শার্ঙ্গদেবের নিকট পাওয়া যাওয়া না, যদিও গ্রন্থের এখানে ওখানে দুটি পদ্ধতির অসাম্য-প্রকাশক ইঙ্গিত যে নেই তা নয়। শার্ঙ্গদেব কবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন বা তাঁর কোনো বংশধর ছিলেন কি না, এ সংবাদ এখনও সংগৃহীত হয় নি। অবশ্য তাঁর মৃত্যুতারিখ জানতে না পারলেও ক্ষতি নেই, কারণ শার্ঙ্গদেব সর্বভারত-পূজ্য হয়ে আজও বেঁচে আছেন— বেঁচে আছেন তাঁর গ্রন্থের সারবত্তার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে— সত্যই কি তিনি সর্বভারতীয়? তাঁর গ্রন্থে কর্ণাটক বহু বিষয়ের আলোচনা আছে, সুতরাং কর্ণাটক পণ্ডিতদের মতে তিনি কর্ণাটক শাস্ত্র প্রণেতা। অপরদিকে সালগসূঢ় প্রবন্ধের ব্যাখ্যাতা তিনি, পঞ্চ ধাতুর সংযোজনার নিয়মাবলী সম্বন্ধে ইঙ্গিতকার তিনি। সুতরাং উত্তরী জ্ঞানীদের মতে শার্ঙ্গদেব হিন্দুস্থানী শাস্ত্রের উদ্গাতা। তাঁর গ্রন্থের স্বরসপ্তক উদ্ধার করতে পারলে তবেই এই বিরোধসূচক প্রশ্নের মীমাংসা হয়। আমরা যতদূর সমাধান কার্যে অগ্রসর হতে পেরেছি তাতে মনে হয় গ্রন্থকার উত্তরভারতীয় শাস্ত্রের চর্চাই বেশী করেছিলেন, যেহেতু যাদবরাজ্যে আর্য সংস্কৃতির প্রয়োগই স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত। তবে তিনি সর্বভারতীয় বিদ্যাই অধিগত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কাজেই কর্ণাটক পদ্ধতির বিশদ আলোচনা সঙ্গীতরত্নাকরে পাওয়া নিতান্তই সঙ্গত বা স্বাভাবিক।

পার্শ্বদেব

শার্ঙ্গদেব সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি সে জানা অসম্পূর্ণ হলেও তার কিছু মূল্য আছে, কিন্তু পার্শ্বদেবের নাম ছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না। একখানি গ্রন্থ তাঁর রচিত বলে জানা যায়, সেখানির নাম হল 'সঙ্গীতসময়সার'। দুর্ভাগ্য-ক্রমে গ্রন্থখানিও খণ্ডিত, কাজেই গ্রন্থখানিতে কটি অধ্যায় ছিল এবং সে অধ্যায়-গুলির বিস্তৃতি কতটা ছিল তা আমরা বুঝতে পারি না।

পার্শ্বদেব নামটির জন্য অনেকে অনুমান করেছেন যে, লেখক জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই অনুমানের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার কোনো সার্থকতা নেই, কারণ সঙ্গীতের দিক দিয়ে সে আলোচনা নিরর্থক। ভারতীয় কোনো ধর্মের সঙ্গেই সঙ্গীতের বিরোধ নেই। তা ছাড়া ধর্মটুকু জেনে নিলেই ব্যক্তিটিকে জানা হবে না, অথচ ঐ ব্যক্তিকে জানাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন। সিংহভূপাল 'সঙ্গীত-রত্নাকরে'র টীকা লিখতে বসে বহুবার 'সঙ্গীতসময়সার' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অথচ

কোথাও পার্শ্বদেবের সম্বন্ধে কিছু জানান নি। কল্লিনাথ তো পার্শ্বদেব সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক রয়ে গিয়েছেন। পরবর্তীকালের কোনো গ্রন্থকার পার্শ্বদেব সম্বন্ধে সামান্য সংবাদও রাখতেন বলে মনে হয় না, যেজন্য 'সঙ্গীতসময়সার' নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছিল বলেই ধারণা জন্মায়। এমন অবস্থায় পার্শ্বদেবের নিজের একটি মন্তব্য তাঁর সময়-নির্ণয়ে সহায়ক হয়। সঙ্গীতসময়সারের একস্থানে ভোজ ও সোমেশ্বরের নাম আছে; অন্য স্থানে তিনি পরমর্দীর নাম উল্লেখ করে বলছেন যে, আভোগ যে অন্তিম ভাগ এটা পরমর্দীই ঠিক করে দিয়ে গিয়েছেন। পরমর্দী দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের সঙ্গীতজ্ঞ রাজা, সুতরাং পার্শ্বদেব যে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন এ তথ্য স্বীকার করার পক্ষে কোনো বাধা থাকে না, যেহেতু সিংহভূপালও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকের ব্যক্তি। সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় যে, পার্শ্বদেব ১২২০-২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১২৬০ থেকে ১২৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সঙ্গীতসময়সার গ্রন্থখানি লিখেছিলেন। সম্ভবতঃ দক্ষিণেরই কোনো স্থানে তিনি বাস করতেন, কারণ তাঁর গ্রন্থের প্রচার ও অনুসরণ আমরা কর্ণাটক প্রভৃতি স্থানেই দেখতে পাই। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে সব কিছুই অজ্ঞাত, সুতরাং তিনি গায়ক ছিলেন কি না এ সংবাদ জানা কোনো উপায়েই সম্ভব নয়— পার্শ্বদেবের গ্রন্থও এ বিষয়ে সহায়ক হয় না।

শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, গ্রন্থকার দেশীসঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং পরমর্দী, জগদেকমল্ল প্রভৃতিব অনুসরণ করলেও তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও বিচার ছিল। আলপ্তির বহুপ্রকার রূপ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা পার্শ্বদেব করেছেন, দেশী গানের যে চমৎকার বিবরণ ও ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন তা অন্য কোথাও এখনও পাওয়া যায় নি। আলপ্তির কথা বলতে গিয়ে পার্শ্বদেব বলেছেন যে, প্রবন্ধ গাইবার পূর্বে আলপ্তি শেষ করবে— যে কাজ আমরা আজও করি; আর ঐ আলপ্তি গান ভাষাযুক্ত বা অক্ষরবিহীন হতে পারে, তালযুক্ত বা তালবিহীন হতে পারে। দেশী গান বলতে আজও আমরা কেবলমাত্র লোকসঙ্গীত ইত্যাদি বুঝি, কিন্তু পার্শ্বদেব বলেছেন যে, জনচিত্তরঞ্জনকারী যে কথা ও সুর তাকে দেশী গানের একটি বিশেষ রীতি বলা যায়, যা দেশী রাগে সৃষ্ট এবং দেশী তালে বদ্ধ গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু; তবু এই রঞ্জনকারী গানের মধ্যেও আচার্য, পণ্ডিত, যোগী ও ভক্তজনের মনোরঞ্জক উচ্চশ্রেণীর কথা ও সুরও আছে। দেশী বলতে কী বোঝায় তা আমরা জগদেকমল্লের গ্রন্থের শ্লোক থেকে জানতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন, "দেশেষু দেশেষু নরেশ্বরাণাং কুর্য্যাজ্জনানাং বর্ত্তনংবা"। দেশী গানগুলির উল্লেখ

করতে গিয়ে পার্শ্বদেব তাঁর সময়ে প্রচলিত আর কয়েকটি গানের প্রকার সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন। যথা, বিবাহাদির মঙ্গল গান, উৎসাহব্যঞ্জক গান, হাসির গান ইত্যাদি; জানিয়েছেন যে, ভক্তিমূলক গানকে তখন রম্যগান বলত, আর চর্যাজাতীয় গানকে বলত অধ্যাত্মগান।

প্রবন্ধাধ্যায়ে সালগসূড়ান্তর্গত ধ্রুব প্রভৃতি প্রবন্ধের বিচারে পার্শ্বদেব নূতনত্ব দেখালেও আমাদের কিছুটা সংশয়ে ফেলেছেন; ধ্রুব প্রবন্ধের একাদশটি প্রকারের এমন সব নাম দিয়েছেন যার সঙ্গে 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র নামগুলির কোনো মিল নেই, এবং সিংহভূপাল ঐ নামগুলি সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নি। সঙ্গীত-রত্নাকরের ধ্রুবপ্রকারগুলি যে ছিল এবং তাদের নানাপ্রকার পরিবর্তন যে ঘটেছিল তার প্রমাণ দিয়েছেন কল্লিনাথ এবং এই পরিবর্তনের ফলেই যে পরবর্তীকালে ধ্রুবপদের উদ্ভব হয়েছিল, এটাও প্রমাণ করা যায়। কাজেই সঙ্গীতরত্নাকরকে অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তা হলে পার্শ্বদেবের নামগুলি নিয়ে কী করা যায়? এখনকার মতো এইটুকুই ভেবে নিতে হবে যে, নবম-দশম শতকে প্রচলিত, আধুনিক কালে অপ্রাপ্ত কোনো গ্রন্থে হয়তো ঐ নামগুলি ছিল বা উদ্ভাবিত হয়েছিল।

যে সময়ে শার্ঙ্গদেব এবং পার্শ্বদেব শাস্ত্রজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন সেই সময়ে গীতজ্ঞরূপে আমরা দু জন স্বনামধন্য ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। একজন হলেন গোপাল নায়ক, অপরজন অমীর খুসরো। গোপাল নায়ক হিন্দু, অমীর খুসরো মুসলমান। দুই ব্যক্তিই একই সময়ে দুই ভাবে ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছেন, দু জনের শিক্ষা-সংস্কারও ছিল বিভিন্ন; এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতে ঐ সময়ে দুই ধারার সঙ্গীতই প্রচলিত ছিল, যদিও তাদের প্রয়োগক্ষেত্র ছিল পৃথক্। যতদিন মুসলিম রাজত্ব আরম্ভ না হয়েছে, ততদিন মুসলিম পদ্ধতি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আরবীয় ও তুর্কী উপনিবেশগুলিতে প্রচলিত ছিল; তাই ঐ পদ্ধতির কোনো সংবাদই আমরা পাই না। তাই অমীর খুসরোর সাঙ্গীতিক দানকে আমরা খোলা মনে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হই। গোপাল নায়ক সম্বন্ধে বিস্তারিত না জানলেও তিনিই যে ঐ সময়ের সঙ্গীতধারার মূল, এ তথ্য দৃঢ়তার সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

গোপাল নায়ক

গোপাল নায়কের উল্লেখ পাই মাত্র তিনটি স্থানে; কল্লিনাথের টীকায়, ব্যংকটমখীর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা'য় এবং ফকিরুল্লার 'রাগদর্পণে'। সঙ্গীতরত্নাকরের

বিভিন্ন তালের ব্যাখ্যাকালে কল্লিনাথ গোপাল নায়কের উদাহরণ দিয়েছেন; গোপাল কী ভাবে কুডুক্ক তালটি ব্যবহার করতেন তার পরিচয় দিয়ে টীকাকার নামভেদ থাকলেও বিভিন্ন তালের অর্থভেদ বা স্বরূপভেদ না থাকলে পুনরুক্তি দোষ কেন হবে না তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণকালে গোপাল নায়কের নাম উল্লেখ করে কল্লিনাথ অপর যে কোনো সঙ্গীতজ্ঞের তুলনায় গোপালকে উচ্চাসন দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে ভাবে গোপাল নায়কের মাত্রা দেওয়ার পদ্ধতিকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে মনে হয় কল্লিনাথ গোপালের গান শুনেছেন, অথবা গোপাল তাঁর কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রুতিবীণার আলোচনা করতে গিয়ে ব্যংকটমখী গোপাল নায়কের শ্রুতিবিচক্ষণতার উল্লেখ কবেছেন। তাঁর এই উল্লেখের মধ্যে গোপাল নায়কের কোনো লুপ্ত গ্রন্থের যেন আভাস পাওয়া যায়। পুনরায় প্রবন্ধ প্রকরণে গীত ও প্রবন্ধের প্রভেদ সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে চতুর্দণ্ডীকার গোপাল নায়কের নাম করেছেন, যিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ বিরাট দক্ষিণী পণ্ডিত ছিলেন, যিনি গীত এবং প্রবন্ধের যে সামান্য প্রভেদ তা বুঝিয়ে দিতে পারতেন অতি সরলভাবে। এমন যে পণ্ডিত তাঁর সম্বন্ধে প্রথম এক অদ্ভুত উক্তি করলেন কাশ্মীরের সুবেদার ফকিরুল্লা, তাঁর 'রাগদর্পণ' গ্রন্থে; বললেন যে, অলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে গোপাল নায়ক দিল্লী এসেছিলেন এবং অমীর খুসরোর ছলনায় ভুলে গীত-প্রতিযোগিতায পরাজিত হয়েছিলেন। এই গল্প আর কোথাও শোনা যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে এর থেকে নানা বিকৃত কাহিনীর উদ্ভব ঘটেছিল।

পর পর গোপাল নায়ক সম্বন্ধে এই তিনটি গ্রন্থের আলোচনা থেকে আমরা গোপালের জীবনী সম্বন্ধে একটা অনুমান করতে পারি। তার সঙ্গে যদি নায়ক উপাধি নিয়ে একটু গবেষণা করা হয়, তা হলে বোধ হয় জীবনী আর একটু বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে।

নায়ক বংশক্রমিক উপাধিও হয়, গুণবাচক উপাধিও হয়। গোপালকে যে সময়ের ব্যক্তি বলে আমরা মনে করি, সে সময়ে গুণ স্বীকার করা হত, উপাধিও যে দেওয়া হত না তা নয়, কিন্তু পরের দেওয়া উপাধি বয়ে বেড়ানোর প্রচলন ছিল না। সুতরাং গোপালের নায়ক উপাধিটি ছিল বংশগত; তাই কল্লিনাথ বা ব্যংকটমখী কোথাও নায়ক গোপাল বলেন নি, বলেছেন গোপাল নায়ক। আমরা নিশ্চিন্তমনে ধরে নিতে পারি যে, নায়ক গোপাল বলে কোনো নাম থাকলে তা হবে অন্য কোনো গোপালের, এবং পরবর্তীকালের লেখক হকীম মহম্মদ

করম ইমাম তাঁর 'মআদ্‌হুল মৌসিকী' গ্রন্থে দু জন গোপালের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

এই নায়ক উপাধি দক্ষিণদেশীয় উপাধি, উড়িষ্যার উপাধিও বটে; কিন্তু কল্লিনাথ প্রভৃতির উল্লেখ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, গোপাল কল্লিনাথের বাসস্থান থেকে খুব বেশী দূরে থাকতেন না। কল্লিনাথ বিজয়নগরবাসী, সুতরাং গোপাল ঐ স্থানে কিংবা কিছু দক্ষিণে কোথাও বাস করতেন ধরে নেওয়া যায়।

অমীর খুসরোর সমসাময়িক হলে গোপালের বিজয়নগর-বাস অসম্ভব হয়, কারণ তখনও বিজয়নগরের সৃষ্টি হয় নি। ঐ সময়ে দেবগিরিতে বা পাণ্ড্যনগরে বাস সম্ভব; কিন্তু গোপাল কোন্ ভাষাভাষী ছিলেন তা না জানলে মীমাংসাসূচক কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। ফকিরুল্লার গল্পকে সার্থক করার জন্যই দেবগিরি ইত্যাদির নাম সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এদিকে যে দুই জ্ঞানী ব্যক্তি গোপালের নাম উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, গোপাল যে সময়ে বর্তমান ছিলেন সে সময়ে দেশীগীত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সালগসূঢ ক্রমে প্রধান হয়ে উঠছে এবং তাল গতির বিভিন্নতাহেতু বিভিন্ন নাম গ্রহণে উপযুক্ত হচ্ছে, তাঁদের গোপাল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধার কথা ভাবলে অনুমান না করে পারা যায় না যে, গোপাল বিজয়নগরেরই লোক ছিলেন, কারণ এঁরা ছাড়া আর কেউ গোপাল নায়কের নাম কোনো ভাবেই ব্যবহার করেন নি। এদিকে বিজয়নগরে বাস করতে হলে গোপালকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান থাকতে হয়; তা হলে আবার ফকিরুল্লার কাহিনী নিতান্ত অসার হয়ে পড়ে।

কিন্তু তা না হয়েই বা উপায় কি? অমীর খুসরো নিজে কোথাও তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার উল্লেখ করেন নি, গোপালকে পরাজিত করার কথা বলেন নি, এমন কি গোপালের নাম উল্লেখের চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। অন্যদিকে গোপাল ছিলেন দক্ষিণ-দেশীয়। তাঁর উত্তরী ভাষার উপর কতটা অধিকার ছিল তা না জানা থাকলে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা করাই সম্ভব নয়। তখনকার দিনে সংস্কৃত গানই অভিজাত দেশীতে প্রচলিত ছিল, খুসরোর তা বোঝার উপায় ছিল না। যদি বলা হয় রাগ নকল করা তো সহজ ব্যাপার ছিল তা হলে তার উত্তর হবে এই যে, ঐ সময়ে কল্যাণ একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাগ ছিল যা গোপালের মতো গুণীর পক্ষে গাওয়া লজ্জাজনক আর সেই রাগও তীব্র-মধ্যম মেলের জন্য রাগ বলে তখন গণ্য হত না; বেলাবলীও তখন অন্য প্রকৃতির ছিল। সুতরাং খুসরো গোপালের রাগ অনুকরণ করে তরানা গেয়েছিলেন বলে যে কিংবদন্তী তাও মনগড়া।

গোপাল নায়ক অমীর খুসরোর পরবর্তীকালের জ্ঞানীগুণী। হয়তো তাঁকে হিন্দুরা অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছিলেন খুসরোকে খর্ব করার জন্য। ফকিরুল্লার কাহিনীর উদ্ভব সেই প্রচার রোধের উদ্দেশ্যে— আমাদের ধারণা তাই। কিন্তু এই প্রচার রোধ করার প্রচেষ্টার ফলে আমরা একদিকে চতুর্দশ শতাব্দীর গোপালকে বিশুদ্ধ বৃজভাষায় ধ্রুপদ গান লিখতে দেখলাম, অন্যদিকে খুসরোর শিষ্য হয়ে উর্দ ভাষা ব্যবহার করতে লক্ষ্য করলাম; ভুলে গেলাম যে, সাহিত্যিক বৃজভাষার উদ্ভাবন করেছিলেন অমীব খুসরো, আর ধ্রুপদকে ধ্রুব ইত্যাদি সালগসূঢ় থেকে গড়ে উঠতে পঞ্চদশ শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল।

যাঁরা বলেন যে, গোপাল খুসরোর সমসাময়িক ছিলেন এইবার তাঁদের মতটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। একদল বলছেন যে, গোপাল দেবগিরি রাজ্যে থাকতেন, সেখান থেকে তিনি দিল্লীতে আসেন। প্রশ্ন ওঠে— কবে আসেন? ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে— অলাউদ্দীন খলজী তখনও সেনাপতি। এই সময়ে খলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন এবং রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। এই সময়ে তিনি সুলতান নন; তা ছাড়া তখন তিনি সুলতান হওয়ার জন্য জঘন্য রীতি অবলম্বন করবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করছেন। সুতরাং এ সময়ে গোপাল নায়ককে নিয়ে আসা বা গোপালের স্বয়ং উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তী কালেও রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য থেকে ভারতবিজয়ের স্পর্ধা নিয়ে গোপালের দিল্লী পৌঁছানো একটু অস্বাভাবিক, অন্ততঃ অলাউদ্দীনের দরবারে, যে অলাউদ্দীন রামচন্দ্রের সঙ্গে অতি জঘন্য ব্যবহার করেছিলেন, এবং হিন্দুদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করতেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে তিনিই মালেক কাফুরকে পাঠিয়েছিলেন রাজা রামচন্দ্রকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনবার জন্য। এই একমাত্র সময় যখন গোপালকে দিল্লীতে নিয়ে আসা সম্ভব; কিন্তু ধরে-নিয়ে-আসা হিন্দুর সঙ্গে অমীর খুসরোর মতো মানী-মুসলমানের প্রতিযোগিতা অলাউদ্দীনের দরবারে কি সম্ভব?

দ্বিতীয় দল বলেছেন যে, গোপাল পাণ্ড্যরাজ্যের মাদুরায় ছিলেন; সেখান থেকে কাফুরের সঙ্গে ১৩১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আসেন। এখানেও সেই একই কথা। কাফুর মাদুরা অধিকার করেছিলেন, সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন এবং একজন মুসলিমকে শাসকরূপে পাণ্ড্যরাজ্যে স্থাপিত করে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সংগ্রহ করা কাফুরের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল। তবুও যদি তা সম্ভব হয়, অলাউদ্দীনের দরবারে গোপালের প্রতি বিজাতীয় আচরণই প্রত্যাশা করা

যায়। উপরন্তু এই গুণীর প্রতি পূর্বোক্তরূপ শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই কল্লিনাথ ও ব্যংকটমখীর নিকট আশা করা যায় না।

প্রকৃত কথা এই যে, গোপাল নায়কের প্রবন্ধগীত ও দেশী তাল ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান-প্রগাঢ়তা হেতু যে যশ ছিল, সেই যশ খুসরোর কীর্তিকে ম্লান করেছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানরা খুসরোর এই গ্লানি দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন।

আমাদের দিক থেকে গোপাল নায়ক সম্বন্ধে আর কিছু বলা কোনো ভাবেই সম্ভব হচ্ছে না, শুধু এইটুকু মাত্র জানানো ছাড়া যে, গোপাল নায়ক গ্রন্থের নায়ক, একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং স্রষ্টা গীতজ্ঞ। খুব সম্ভব তিনি চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিজয়নগরে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। যদিও আমাদের এই মতের সঙ্গে অন্য কোনো মতেরই মিল হবে না, তবু যতক্ষণ দৃঢ় প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ আমাদের মতটিকেই অধিক যুক্তিসহ বলে মনে হয়।

অবশ্য ফকিরুল্লা বলেছেন যে, অমীর খুসরো নাকি গোপালকে অনুকরণের কথা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু অমীর খুসরোর নিজস্ব গ্রন্থের মধ্যে এই স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত ফকিরুল্লার কিংবদন্তী মানবার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। যে রাগকদম্ব গানে গোপালের বিশেষত্ব, সেই বত্রিশটি রাগযুক্ত, বিভিন্ন তালে গ্রথিত নির্যুক্ত, গদ্যময় মহাপ্রবন্ধ আয়ত্ত করা দু-একদিনে সম্ভব নয়, এমন কি খুসরোর মতো গুণীর পক্ষেও।

অমীর খুসরো

অমীর খুসরো এমন একটি প্রতিভা যা ভারতের সনাতন পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিল, মুসলিম কৃষ্টিকে ভারতীয় কৃষ্টির অংশ করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল এবং ভারতীয় সাহিত্যের নূতনতরো উন্মেষের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিল।

অমীর খুসরোর প্রকৃত নাম ছিল আবুল হসন্। এর পিতা অমীর সৈফুদ্দীন তুর্কী জাতীয় ছিলেন এবং খোরাসানে সম্ভ্রান্তবংশীয় ভূম্যধিকারী ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের কারণে সৈফুদ্দীন ভারতে চলে আসেন এবং সুলতান ইলতুৎমিসের দরবারে সরদার নিযুক্ত হন। এখানেই তিনি এমাদুল মুল্কের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে খুসরোর জন্ম হয়। প্রথমে পিতার আশ্রয়ে ও ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর মাতামহের নিকট খুসরো বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অল্প বয়সেই তুর্কী, ফার্সী, আরবী,

বৃজভাষা, হিন্দীভাষাতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। বারো বছর বয়সে তিনি সুন্দর কবিতা লিখতে শেখেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে একদিকে যেমন সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জন্মায়, অন্যদিকে তেমনি রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়নের সুযোগ আসে। এই সময়ে তিনি সুফি নিজাম উদ্দীন অউলিয়ার সংস্পর্শে আসেন এবং সুফী মতবাদ গ্রহণ করেন। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খুসরো দিল্লীতে ছিলেন এবং গিয়াসুদ্দীন বলবনের সভায় অমীর খুসরো বা সম্ভ্রান্ত রাজবংশীয় বলে পরিচিত হন। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বলবনের পুত্রের সঙ্গে খুসরো মুলতানে বসবাস করতে থাকেন এবং দুজনেই কাব্যরসিক হওয়ায় কাব্যরচনা দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে মহম্মদ মারা যান আর খুসরো বন্দী হন। দু বছর পবে মুক্তিলাভ করে জন্মস্থান এটা জেলার পটিয়ালী গ্রামে তিনি ফিরে যান, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার বলবনের দরবারে উপস্থিত হন। বলবনের মৃত্যুর পরে কয়কুবাদ, জলালউদ্দীন খলজী ও তারপবে অলাউদ্দীন খলজী সুলতান হন। খুসরো এঁদের প্রত্যেকেরই দরবারে ছিলেন, তবে অলাউদ্দীন খলজীর সময়ে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন বেশী। কারণ সে সময়ে রাজনীতি পরিত্যাগ করে শুধু কবি সাহিত্যিক ও ইতিহাসকার-রূপেই তিনি কর্তব্য করে যাচ্ছিলেন। অলাউদ্দীনের রাজত্বকালে অমীর খুসরো উর্দুভাষার প্রচলনে ও উন্নতিসাধনে সহায়তা করেন। অলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীন মুবারক এবং ১৩২১ খৃষ্টাব্দে গিযাসুদ্দীন তুঘলক দিল্লীর সুলতান হন। খুসরো এঁদের দরবারে প্রতিপত্তির সহিত সমাসীন ছিলেন এবং কবি ও ইতিহাসকার-রূপে বহু সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তুঘলকের সঙ্গীরূপে বাংলায় আসেন এবং ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে নিজামুদ্দীন অউলিয়ার মৃত্যু সংবাদ শুনে দিল্লী ফিরে যান এবং সেই বৎসরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। খুসরোর তিন পুত্র ছিল বলে শোনা যায়।

জীবনের এই যে তথ্য, এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন মুসলমান ইতিহাসকারেরা। এঁদের কৃপাতেই আমরা জানতে পারি যে, খুসরো নিরানব্বইখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার মধ্যে বাইশখানি আজও পাওয়া যায়। এর মধ্যে একখানি হল 'নু সিপীর', আর একখানি হল 'তুঘলক্‌নামা', যাতে অলাউদ্দীন খলজী থেকে গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের রাজত্ব কালের অনেক ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এ-সব সহায়তা পেয়েই আমরা বলতে পারি যে, খুসরো প্রচলিত বৃজভাষাকে সাহিত্যের শুদ্ধভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

এই ভাষা যেমন তাঁর খ্যালের কবিতার বাহন হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালের গুণীদের ধ্রুপদ, খ্যালের উপযোগী ভাবসম্পদ জুগিয়েছিল। আজও আমরা গান গাইতে গেলে সেই খুসরোকে অনুসরণ করি, যিনি লিখেছিলেন—

"মোরা জোবনা নবেলরা
ভয়ো হৈ গুলাল
কৈসে গর দীনী বকস্ মোরী মাল।"

অথবা

"হজরত নিজামুদীন চিশ্‌তী
জরজরী বকষ পীর।
জোঈ জোঈ ধ্যাবৈ তেঈ তেঈ
ফল পাবৈ
মেরে মন কী মুরাদ ভর দীজৈ
আমীর॥"

বৃজভাষা ব্যতীত খড়ী হিন্দীতেও তিনি কবিতা লিখেছেন এবং সে কবিতাও গীত হবার উপযুক্ত। বিচিত্র বিষয় নিয়ে খুসরো পহেলী, মুকরী লিখেছেন, গ্রাম্য গীত লিখেছেন, যা আজও লোকে শেখে এবং গায়। এই সব কবিতার জন্য তিনি নূতন ছন্দেরও প্রবর্তন করেছেন।

পারস্যের ভাষার প্রতি খুসরোর যথেষ্ট টান ছিল, তাই তিনি পারস্যের শব্দ এবং ছন্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতেন, কিন্তু যখনই কোনো তর্ক উঠ্‌ত তখনই তিনি বলতেন, "আমি ভারতীয়, এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সঙ্গীতকে আমি উপরে স্থান দিই।"

তাঁর সময়ে কী কী সঙ্গীতযন্ত্র ভারতে ও পারস্যে পাওয়া যেত তার একটি তালিকা খুসরো প্রস্তুত করেছিলেন ; এই তালিকায় রবাব আছে, তনবুর আছে, কিন্তু সেতার বা তবলার নাম নেই।

স্বভাবতই মনে হবে যে, খুসরোর সময়ে ঐ দুটি যন্ত্রের প্রচলন ছিল না, সুতরাং প্রশ্ন জাগবে, সেতার বা তবলার ব্যবহার কবে থেকে, কার প্রভাবে আরম্ভ হল? প্রশ্নটি অনেকেই তুলেছেন এবং নানাভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সেতার ভারতেরই যন্ত্র আর তবলা সৃষ্ট হয়েছে সদারঙ্গের সময়ে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, খুসরো তাঁর কবিতায় সিতারের নাম করেছেন। এই সিতার বলতে তিন তারের বীণাও বোঝা যেতে পারে— যেমন আবুল ফজল

বুঝেছিলেন ; অথবা জিথারের উচ্চারণভেদও হতে পারে, যার অর্থ, যে-কোনো বীণা। তেমনি তবলা এসেছে তবল্ কথা থেকে, যার অর্থ, বাদ্য। শব্দ দুটি বিদেশী। অমীর খুসরো এদের আকৃতির ও বাদন-পদ্ধতির হযতো কিছু পরিবর্তন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে ঠাট এবং নূতন প্রকৃতির তালের গঠনে সহায়ক হয়েছিল। খুসবো ভিন্ন যত বড বড গুণী ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই হিন্দু এবং তাঁবা কেউ ভারতীয় নাম ব্যবহার না করে ফার্সী নাম রাখবেন কোনো যন্ত্রের বা গান-রীতির, এ কথা কল্পনা করা একটু শক্ত। অতএব খুসবোর শিষ্যদের দ্বারাই যে সিতার ও তবলা নাম দুটি ভারতীয় সঙ্গীতে প্রবর্তিত হযেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই সিতারের তাব-বাঁধার ও পর্দা-বাঁধার পদ্ধতিকে খুসরো বা তাঁর সহকারীরা পরিবর্তিত করেছিলেন বলেই ঠাটের জন্ম সম্ভব হয়েছিল ; আর তবলার শব্দ ও বাদন-পদ্ধতি কিছু বদলাবার জন্যই খ্যালের তাল ও ঠেকার প্রকৃতি অন্যরকম হয়ে পডেছে। সবারী, ফরোদস্ত, পোস্তো ইত্যাদি তাল প্রাচীন লঘু গুরুর হিসাব মানতে চায় না, কারণ মুসলমানী হিসাবনিকাশে এদের উৎপত্তি হয়েছে। খুসরো এই দিক দিয়ে কিছুটা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়েছেন, মুসলিম কৃষ্টিকে যে ভাবেই হোক স্থান করে দিয়েছেন। তুর্কী, ফার্সী নাম যেখানে সুযোগ পেয়েছেন ব্যবহার করেছেন, ভারতীয নাম থাকা সত্ত্বেও।

তবুও খুসরোর কাছে ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। গানের মধ্যে তরানা, তিরবটের নাম পাই ; কৌল, গুলনকৃশের পরিচয় পাই ; এমন, এমনী, ফরগনা-র স্বরবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এরা কোনো কালেই ইরান বা মধ্যপ্রাচ্যের বস্তু ছিল না, এবং এখনও নেই। খুসরোই এদের উদ্ভাবন করেছিলেন, হয়তো-বা স্থানীয় গায়কদের, পণ্ডিতদের তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন, হয়তো-বা ভারতীয় পদ্ধতির তিনি অনুসরণ করেছিলেন, হয়তো-বা ইয়েমিনী কব্বালদের, তুর্কী কব্বালদের বৈশিষ্ট্য তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি ছাড়া আর কেউ যে এ বস্তুগুলির প্রচার করেন নি, এ অনুমানে ভুল নেই। কারণ এই উদ্ভাবিত বস্তুগুলির ব্যবহার আমরা আকবরের রাজত্বকালের মধ্যে দেখতে পাই ; অথচ এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো প্রতিভাধর উদ্ভাবককে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অমীর খুসরোর কৌল ইত্যাদি গান যাঁরা গাইতেন তাঁরা 'কব্বাল' নামে পরিচিত ছিলেন, আর কব্বাল মানে গায়ক। এই কব্বালদের গীতরীতি এবং তালকে আমরা কব্বালী বলি, যা মহম্মদগুণকীর্তনকারী কব্বাল ও কব্বালী থেকে

সম্পূর্ণ পৃথক্। এই কব্বালী-রীতিই খুসরোর শিষ্যবংশে খ্যাল বা খয়াল-এ রূপান্তরিত হয়, যে খয়ালের অর্থ হল সম্ভ্রান্ত, অভিজাত। এই খ্যাল যে আকবরের যুগে প্রচলিত ছিল তার মস্ত বড় প্রমাণ বিলাস খাঁর একখানি গানে পাওয়া যায়, যার এক জায়গায় আছে—"খ্যাল তিলানা কোতবাল" (অবশ্য বিলাস খাঁর নাম নিয়ে অন্য কোনো লেখক এই শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকলে বলবার কিছু নেই)। আবুল ফজলের গ্রন্থেও আমরা ফার্সী গায়কী-মেশানো হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে সৃষ্ট, কমনীয় ও উচ্চশ্রেণীর কৌল বা কব্বল এবং তরানার পরিচয় পেয়েছি। এই কৌল দিল্লীর চারপাশে প্রচলিত ছিল, যেখানে খুসরো-শিষ্য কব্বালরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে বাস করতেন, এবং যেখান থেকে খ্যালের দিল্লীঘরানার সৃষ্টি হয় বহু পরবর্তী কালে। কৌলপ্রসঙ্গে আবুল ফজল অমীর খুসরোরই নাম করেছেন, সুতরাং ফিকরাবন্দী মিশ্রিত কব্বালী খ্যাল যে খুসরোর প্রভাবে সৃষ্ট হয়েছিল এ বিষয়ে মতভেদ থাকার কথা নয়। ফকিরুল্লার গ্রন্থে তো পরিষ্কারভাবে অমীর খুসরোর খ্যাল-রীতির উল্লেখ আছে। ঠিক এমনি ভাবে আবুল ফজলের সিতার বা তিন-তারযুক্ত বীণার উল্লেখ থেকে এই যন্ত্রের উপর খুসরোর প্রভাবের ইঙ্গিত অনুমান করা যায়। অন্যদিকে ভারতীয় মূর্ছনার পরিবর্তন ঘটালেন খুসরো— সাতটি স্বরের মূর্ছনার মাঝে তিনি শুদ্ধ ও বিকৃত রূপের এক সঙ্গে প্রয়োগ করে স্বরের সংখ্যা বর্ধিত করলেন— যা পশ্চিম এশিয়ার স্বাভাবিক রীতি। তার ফলে উত্তর ভারতে বারোটি-স্বর-যুক্ত সপ্তক সৃষ্ট হল, ঠাটের উদ্ভব হল এবং সিতার বা বীণায় ঠাট কথাটির প্রয়োগ হতে থাকল। খুসরোর সমস্ত রাগেই আমরা এই মিশ্র-স্বর প্রয়োগ দেখতে পাই, যে সমস্ত রাগকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় শাস্ত্রীরা স্বাভাবিক মূর্ছনার অন্তর্গত করে আপন আপন ভাণ্ডার অধিকতর পূর্ণ করেছেন। তবু একসঙ্গে আট, নয়, দশ স্বরের ব্যবহার লোপ পায় নি এবং এই ভাবে মুসলিম-দেশীয় বৈশিষ্ট্য আমাদের সঙ্গীতকে প্রভাবান্বিত করেছে।

সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, অমীর খুসরো ভারতীয় সঙ্গীতকে দ্বাদশ স্বরসপ্তক, ঠাট, খ্যাল এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, কিছু নূতন রাগ ও তাল এবং সিতার ও তবলার পূর্বতন সংস্করণ উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন; তার উপর দিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের গায়কী। যন্ত্রের তারের পারম্পর্য ও তালের গুরুলঘু মাত্রা স্থাপনের পরিবর্তনও ঘটিয়েছিলেন তিনি, আর প্রবন্ধধাতুর প্রকৃতির বিবর্তনও আরম্ভ হয়েছিল তাঁর প্রভাবে। গজলের প্রচারের ব্যাপারে খুসরো ছিলেন অগ্রণী, যদিও গজলরীতির গান হয়তো তিনি অন্য কোথাও শিখেছিলেন। খুসরোর স্বকীয়তা

হয়তো খুব বেশী ছিল না, অনুকরণ হয়তো ছিল অনেকখানি, তবু তাঁর এমন সরপর্দা, সাজগিরি কাফি গারা, তাঁর সবারী ফরোদস্ত পস্তো, তাঁর খ্যাল তরানা তিরবট, তাঁর ঠাট স্বর-সংমিশ্রণ এবং বৃজভাষাকে সঙ্গীতের ভাষারূপে গঠন করার তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। বস্তুতঃ আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতের জনক বললে খুসরোর নামই করতে হয়।

তথাপি খুসরো মুসলমান বলে তাঁকে অস্বীকার করবার একটা প্রবল চেষ্টা দেখা গিয়েছিল চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে। ভারতীয় শাস্ত্রকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্য তখন নানা জ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্রের নির্দেশ প্রচার করতে থাকেন। পূর্বকালীন যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাঁদের গ্রন্থ থেকে নানাভাবে সংকলন চলতে লাগল, আর অন্য দিকে শাস্ত্রের নূতন নির্দেশ সৃষ্ট হতে থাকল। কিন্তু এর ফলে দুটি দলের জন্ম হল। একদল রাগ-রাগিণী বিভাগ করতে আরম্ভ করলেন, আর একদল প্রাচীন জনক-জন্যকে অন্যভাবে প্রচার করতে লাগলেন। পরিণামে একটা বিশৃঙ্খলা এল, উত্তরী ও দক্ষিণী বলে দুটি বিশিষ্ট বিভাগ দেখা দিল, যে বিভাগকে আদানপ্রদান কারণে চোখেই পড়ত না, যেমন পড়ত না আন্ধ্রী ও কর্ণাটক পদ্ধতির প্রভেদটুকু, যার উল্লেখ পাই আমরা দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকেই। অমীর খুসরোর সময়ের আগে যাঁরা এসেছিলেন, যেমন ভোজ, জয়সিংহ, সোমেশ্বর, পরমর্দী, জগদেকমল্ল, সোমরাজদেব, হরিপাল প্রভৃতি এবং সমসময়ে যাঁরা এসেছিলেন যেমন জয়সেনাপতি, হামীর প্রভৃতি, এঁদের গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয়গুলি সংকলন করে শাস্ত্র সৃষ্টি করাই ছিল পরবর্তী পণ্ডিতদের কাজ।

ভোজ ছিলেন ধার-এর রাজা। ১০১০ থেকে ১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। ১০৬০ খৃষ্টাব্দে গুজরাট ও চেদীর মিলিত আক্রমণে ভোজ পরাজিত হন। ইনি পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং গুণী-জ্ঞানী ও সংস্কৃতশাস্ত্রে নিপুণ ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ করতেন। 'শৃঙ্গীর প্রকাশ', 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ইত্যাদি অলংকারশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন।

জয়সিংহ সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না, এবং তাঁর লিখিত কোনো গ্রন্থেরও সন্ধান মেলে না। তবে তিনি যে সঙ্গীতজগতে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ আমরা হামীরের গ্রন্থে পাই। কোনো কোনো ব্যক্তি এঁকে প্রথম সোমেশ্বরের পিতা বলেন, অপরে এঁকে বিক্রমাঙ্কদেবের সঙ্গে এক করে থাকেন। বিক্রমাঙ্ক চালুক্য বংশীয় রাজা, কল্যাণীতে রাজত্ব করতেন। এঁর রাজ্যকাল ১০৭৬ থেকে ১১২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সভাকবি বিহ্লন 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে'

রাজার গুণাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ইনি কলাকুশলী ছিলেন, কিন্তু এঁর রচিত কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। 'সঙ্গীতরত্নাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে এঁর নাম নেই। কিন্তু রাণা হামির বিক্রমের উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব ভূবল্লভ বলে যে কাকে বুঝিয়েছেন তা বোঝা যায় না; কোনো মতে ত্রিভুবনমল্লকেই ঐ সম্বোধন করা হয়েছে, এবং বিক্রম এবং ত্রিভুবনমল্ল একই ব্যক্তি। আমরা মনে করি ভূবল্লভ ভোজকেই বোঝাচ্ছে। তৃতীয় সোমেশ্বর কল্যাণীর চালুক্য-বংশীয় রাজা ছিলেন এবং ১১২৭ থেকে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কোনও মতে এঁর অপর নাম ভূমল্ল, ত্রিভুবন মল্লের পুত্র ইনি। সাহিত্য ও সঙ্গীতে সোমেশ্বর অতুলনীয় ছিলেন এবং 'অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থে রাজনীতি ইত্যাদির আলোচনা আছে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। পাণ্ডিত্যের জন্য সাঙ্গীতিক মতের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে। যদিও রাগরাগিণী বিভাগ তিনি নিজে কখনও করেন নি। তাঁর অন্য গ্রন্থের নাম 'বিক্রমাঙ্কাভ্যুদয়'।

পরমর্দী ছিলেন চন্দেলবংশীয় রাজা। তিনি ঝিঝোটী শাসন করেছিলেন ১১৮০ থেকে ১২০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। যে পরমর্দীর নাম জগদেক, শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন তিনি অন্য কোনো রাজা ছিলেন এই আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। কোনো মতে সেই রাজা ত্রিভুবনমল্ল। পরমর্দীর কোনো গ্রন্থ না পাওয়ায় নানা অনুমানের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ অনুমান পূর্বোক্ত প্রতিটি ব্যক্তির অভ্যুদয় কাল বিচারে প্রয়োগ করতে হয়েছে।

জগদেকমল্ল সোমেশ্বরের পুত্র, চালুক্যবংশীয় রাজা। ইনি কল্যাণীতে ১১৩৮ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। তিনি নিজেকে কবিচক্রবর্তী বলতেন এবং 'সঙ্গীতচূড়ামণি' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ভৈরব ও ভৈরবীর পরিচয় আমরা পাই। রাগরাগিণীর সরগম বিস্তার পাই, মেঘরঞ্জী ইত্যাদি কর্ণাটক রাগের নাম পাই। প্রাচীন দেশী তাল ও প্রবন্ধের বিবরণও তিনি দিয়েছেন। পার্শ্বদেব প্রভৃতি লেখক জগদেকমল্লের গ্রন্থকে বহুল ভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। জগদেক-এর 'নাট্যটিপ্পনী' নামক আর একখানি গ্রন্থও আছে।

হরিপালও চালুক্যবংশীয়। তিনি সৌরাষ্ট্রের শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকাল হচ্ছে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে। 'সঙ্গীত সুধাকর' নামক গ্রন্থ হরিপালের রচিত। এই গ্রন্থে নাট্যবিষয়ক বিবরণ বেশী। দেশীসঙ্গীতের

বগাকরণের ব্যাপারে রাগাঙ্গ, ক্রিযাঙ্গ ইত্যাদি বিভাগকেই স্বীকার করা হয়েছে, যদিও তার সঙ্গে শুদ্ধ ছায়ালগ বিভাগেরও আলোচনা আছে।

সোমরাজ বা চতুর্থ সোমেশ্বর জগৎদেবের পুত্র ছিলেন এবং দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। আপনাকে তিনি চালুক্যনৃপতির প্রতিহার-প্রধান বলেছেন, কিন্তু সেই নৃপতির কোনো পরিচয় আমরা জানি না। ইনি নাট্য-বেদ-বিরিঞ্চি বলে নিজেকে অভিহিত করেছেন। 'সঙ্গীতরত্নাবলী'তে নূতন প্রবন্ধ রচনার প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু নযটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে নাট্যের আলোচনা নেই। দেশী রাগ সম্বন্ধে বিবেচনাই এ গ্রন্থে মুখ্য, কিন্তু রাগের সংখ্যা, কেন জানি না, খুব কম। মনে হয় কর্ণাটক পদ্ধতি অনুসারী যে কযটি রাগ তিনি পেয়েছিলেন সেই কয়টিকেই গ্রহণ করেছিলেন; অথবা যে কয়টি রাগ তখন নূতনভাবে অভিজাত শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের নামই শুধু সোমরাজ আপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জ্যায়ন বা জয়সেনাপতি মহারাজ গণপতিব সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন। গণপতি তেলিঙ্গানার শাসক ছিলেন। ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গণপতির রাজত্বকাল ছিল। জয়সেনাপতির গ্রন্থগুলির নাম হল 'গীতরত্নাবলী', 'বাদ্য-রত্নাবলী' ও 'নৃত্যরত্নাবলী', কিন্তু শুধু 'নৃত্যরত্নাবলী' গ্রন্থখানিই পাওয়া যায এবং 'সঙ্গীতশিরোমণি' গ্রন্থে কেবল 'নৃত্যরত্নাবলী'র নামই করা হযেছে। এই গ্রন্থে মার্গ ও দেশী নৃত্যপদ্ধতি ও প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। জয়সেনাপতির অপর নাম বোধ হয় জয়সিংহ ছিল, কারণ রাণা হামীর তাঁর গ্রন্থে গণপতি ও জয়সিংহর নাম করেছেন কিন্তু জয়সেনাপতির উল্লেখ করেন নি। গণপতির কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি, তবুও তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তার প্রমাণ আমরা হামীরের উল্লেখ থেকে পেলাম। আর জয়সিংহ বলে অন্য কোনো জ্ঞানীর সংবাদ আমরা যখন আর কোথাও পাচ্ছি না, তখন উচ্চারণ-সমতা দেখে (জয়সেন, জয়সিং) আমরা ধরে নিতে পারি যে জয়সিংহ ও জয়সেনাপতি একই ব্যক্তির নাম। হম্মীর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিছু অস্পষ্ট। একই সময়ে রণথম্ভোরের হামীর ও চিতোরের হম্মীরকে ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়ার জন্যই এই অস্পষ্টতা হয়েছে। অবশ্য, প্রথম জন ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে অলাউদ্দীন খলজীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান, আর দ্বিতীয় জনকে রাণা কুম্ভ তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থে আপন পূর্বপুরুষ বলে পরিচয় দিয়ে সঙ্গীতগ্রন্থের লেখক বলেছেন। এই হম্মীর ১৩২০ খৃষ্টাব্দে চিতোর উদ্ধার করে রাণা হন। রাণা হম্মীর 'শৃঙ্গীর হার' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে ভাষা রাগ ও পনেরোটি জনক রাগের বিবরণ আছে; দেশী রাগ আছে

তিপান্নটি ; অর্থাৎ হম্মীরও সোমরাজের পন্থা অনুসরণ করেছেন। এই পন্থাই শেষ পর্যন্ত কর্ণাটক পদ্ধতির প্রবর্তনে সাহায্য করেছিল, এই ধারণা করাই বোধ হয় সঙ্গত। হম্মীরের গ্রন্থে ব্রহ্মমতব্যাখ্যাকারী 'গান্ধর্বামৃতসাগর' নামক অপ্রাপ্য গ্রন্থের আলোচনা আছে, এবং নাট্যমুদ্রাগুলির ব্যাখ্যা আছে।

অমীর খুসরোর সমসময়ে সুফীমত ভারতে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সুফীদের বেশীর ভাগই সঙ্গীতের মাধ্যমে আরাধনা করতেন। এঁদের একজন ছিলেন বহাউদ্দীন জকারিয়া। ইনি ১২২৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। সুরাবর্দ্দীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এই সুফী সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন এবং শোনা যায় তিনি কয়েকটি নূতন রাগেরও সৃষ্টি করেন। যথা মুলতানী, মুলতানী ধনাশ্রী ও গোজরিয়া, যা পরবর্তীকালে বোধ হয় বহালগুজরীতে পরিণত হয়। বহাউদ্দীন সম্বন্ধে এই বিবরণ আমরা প্রমাণ করতে অপারগ, জনশ্রুতিই এ ক্ষেত্রে প্রবল।

অমীর খুসরোর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বিজয়নগর রাজ্য গড়ে উঠল। এই রাজ্যের মহামন্ত্রী মাধব বিদ্যারণ্য সঙ্গীতে নূতন পথ দেখালেন।

বিদ্যারণ্য

বিদ্যারণ্যের প্রকৃত নাম মাধবাচার্য। শোনা যায় ইনি পম্পা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বংশপরিচয় বা শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সায়নাচার্য নামক প্রসিদ্ধ বেদের ভাষ্যকার মাধবের ভ্রাতা ছিলেন। দুইজনেই সঙ্গীতে পারদর্শী এবং সেই সময়ের উৎকৃষ্ট সামগ ছিলেন। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে মাধব বিদ্যারণ্যের জন্মকাল বলে ধরা যায়। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্যারণ্য রাজ্যের মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং দেশ-বিদেশের গুণীজনকে রাজসভায় আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যারণ্য 'পঞ্চদশী' 'দৃগদৃশ্যবিবেক' ও 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও তিনি পণ্ডিত ছিলেন, এবং 'পরাশর-মাধব' নামে 'পরাশর-সংহিতা'র একখানি ভাষ্যও পরবর্তীকালে লিখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে ঐ সময়ে মুসলিম সঙ্গীতের প্রভাব একটু একটু অনুভূত হচ্ছিল ; তাদের দ্বাদশ স্বরের ব্যবহারের সঙ্গে দক্ষিণী স্বর-ব্যবহারে কিছুটা মিল পাওয়া যায়, কিন্তু মূর্ছনার দিক দিয়ে প্রকাণ্ড পার্থক্য রয়েছে। বিদ্যারণ্য দক্ষিণী পদ্ধতিকে অবলম্বন করলেও মুসলিম প্রভাবকে মেনে নিয়ে মধ্যপথ ধরলেন ; সপ্তস্বারিক মূর্ছনাকেও তিনি রাখলেন, আবার দ্বাদশ

স্বরের সপ্তকটিকেও দক্ষিণের উপযোগী করে ব্যবহার করলেন এবং তখনকার দিনে অল্পপ্রাচীন গ্রন্থে যে যে রাগ পেয়েছিলেন তার থেকে বেছে নিয়ে দক্ষিণে প্রচলিত রাগগুলিকে যোগ করে মেল-পদ্ধতির সৃষ্টি করলেন। 'সঙ্গীতসার' নামক গ্রন্থে এই পদ্ধতির তিনি সবিস্তার আলোচনা করেছিলেন তার প্রমাণ পাই রঘুনাথ ভূপের 'সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থে, কিন্তু আর কোন্ কোন্ বিষয়ে মাধব আলোচনা করেছিলেন তার কোনো সন্ধান আমরা পাই না। যে পঞ্চদশটি মেল মাধবাচার্য প্রচলিত করে-ছিলেন তাদের নাম হল—

১	নট্টা	২	গুর্জরী	৩	বরাটী
৪	শ্রী	৫	ভৈরবী	৬	শঙ্করাভরণ
৭	আহীরী	৮	বসন্তভৈরবী	৯	সামন্ত
১০	কাম্বোজী	১১	মুখারী	১২	শুদ্ধরামক্রিয়া
১৩	কেদারগৌড়	১৪	হিজুজ্জী	১৫	দেশাক্ষী

মাধবাচার্যের এই মেল-প্রচলন পরবর্তীকালে কর্ণাটক সঙ্গীতকে নূতন পথের সন্ধান দেয়।

মাধবাচার্য বিদ্যারণ্য উপাধি কী ভাবে পেলেন আমরা জানি না, তবে বিদ্যারণ্য নামেই সর্বত্র তাঁর প্রসিদ্ধি। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিদ্যারণ্যের মৃত্যু হয়— কোনো মতে ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে।

বিদ্যারণ্য ব্যতীত দক্ষিণদেশীয় আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ নূতন কিছু করেন নি। শম্ভুরাজ, মদনপাল, বেমভূপাল এবং অন্যদিকে সিংহভূপাল ও কল্লিনাথ প্রভৃতি কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুসরণ বা ভাষ্য লিখেই আপন আপন কর্তব্য শেষ করেছেন।

শম্ভুরাজ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঞ্চীতে রাজত্ব করতেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'শম্ভুরাজীয়'। 'সঙ্গীতশিরোমণি' গ্রন্থে শম্ভুরাজীয় সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

মদনপাল আন্ধ্রজাতীয় রাজপুত্র কিন্তু তাঁর অন্য কোনো পরিচয় জানা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন এবং বিশ্বেশ্বর নামক এক পণ্ডিতের সহায়তায় ধর্মশাস্ত্রে বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং 'আনন্দসঞ্জীবন' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে একশ ত্রিশটি তালের বিবরণ এবং রাগের বিস্তার দেওয়া আছে। কুম্ভের গ্রন্থে ও 'সঙ্গীতশিরোমণি'তে এই গ্রন্থের চর্চা আছে।

বেমভূপাল কোণ্ডপাডীর রাজা ছিলেন। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি বর্তমান ছিলেন, এবং 'সঙ্গীতচিন্তামণি' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানিতে বাদ্য ও নৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে, কিন্তু গীত অংশটি নেই।

সিংহভূপাল রাজশৈলে রাজত্ব করতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর জন্ম হয। তাঁব প্রপিতামহ ছিলেন অন্ধ্রের রেচর্লবংশোদ্ভূত রাজা দচন, দচনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সিংহপ্রভু ; এই সিংহপ্রভুর প্রথম পুত্র অনন্ত বা অনপোত ছিলেন সিংহভূপাল বা সিংহভূপতির পিতা আর মাতা ছিলেন অন্নাম্বা। সিংহভূপাল শূদ্রজাতীয় ছিলেন, কিন্তু শিক্ষায় জ্ঞানে ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর লিখিত গ্রন্থ হল ১ 'সঙ্গীতসুধাকব' নামক সঙ্গীতরত্নাকর টীকা, ২ 'রসার্ণবসুধাকর' নামক অলংকার গ্রন্থ, ৩ 'কুবলযাবলী' বা 'রত্নপাঞ্চালিকা' নামক একখানি নাটক, ৪ 'কন্দর্পসম্ভব' নামে কাব্য। সিংহভূপাল সঙ্গীতরত্নাকরের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছেন।

কল্লিনাথ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম লক্ষ্মীধর, মাতার নাম নারায়ণী। জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিম্বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বল্লভদেব ছিলেন এঁর পিতামহ। বিজয়নগরে ইম্মডি দেবরাযের অধীনে ইনি কাজ করতেন এবং তাঁর আজ্ঞাতেই 'কলানিধি' নামে সঙ্গীতরত্নাকরের একখানি টীকাগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে দ্বিতীয় দেবরায় ১৪২৩ থেকে ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং ইম্মডি দেবরায় শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন ১৪৪৬ থেকে ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

কল্লিনাথ তাঁর টীকায় একদিকে জনক-জন্য সম্পর্কের কথাটি আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিযেছেন। অন্যদিকে প্রবন্ধ, তাল ইত্যাদির বিবর্তনের কাহিনীও আমাদের কর্ণগোচর করেছেন। ফলে আমরা বুঝতে পেরেছি দেশীসঙ্গীত কালক্রমে লক্ষ্যের দিকে কী ভাবে পরিবর্তিত হয়। কল্লিনাথ হিন্দোলের রেধা বর্জিত রূপ কী ভাবে রেপা বর্জিত রূপ পেল, তার কাহিনী বলেছেন, আঞ্জনেয় দেশী ও মার্গের কী প্রভেদ করেছেন তা জানিয়েছেন এবং উমাপতি তাঁর গ্রন্থে নিজেকে কত সহজে শিবের সঙ্গে এক করে নিয়েছেন তার প্রমাণ দেখিয়েছেন। তা ছাড়া, বিদ্যারণ্যের মেলকে তিনি যে চোখেই দেখুন তার প্রভাবের কথাটা কল্লিনাথ স্বীকার করেছেন, যেখানে বলেছেন "কাপি জন্যজনকয়োর্মেলনভেদো রসাদি-বিনিয়োগানিয়মশ্চেতি লক্ষ্য লক্ষণয়োর্বহুধাবিয়োধাঃ"। এই মেলন শব্দটি মেলেরই সমার্থক।

দক্ষিণ ভারতে যখন এই অবস্থা তখন উত্তর ভারতে শিব, ব্রহ্মা, ভরত প্রভৃতির নামের সংশ্লিষ্টতায় রাগ-রাগিণী পদ্ধতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময়ের আগে থেকেই আমরা জনক ও জন্য পদ্ধতির একটা আভাস পেয়েছি। মতঙ্গের কালে এসে জন্মাল গীতি-আশ্রিত শুদ্ধরাগ, ভিন্নরাগ ইত্যাদি, আর অন্য দিকে গ্রামরাগ, ভাষা রাগ, প্রভৃতি। মতঙ্গ ও শার্ঙ্গদেবের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ ইত্যাদি দেশীরাগের বিভাগ লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু এদের সংখ্যা রইল একশ'রও কম; অথচ মতঙ্গ বলেছেন যে, রাগের শেষ নেই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে মতঙ্গ প্রভৃতি নিরঙ্কুশ দেশীকে গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না, তাই যেগুলিকে জাতে তোলা গিয়েছিল সেই ক'টিকেই গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে শিব-প্রবর্তিত মত অনুসারে যাঁরা শুধু দেশী রাগের আলোচনা করতেন, তাঁরা পরবর্তীকালে শুদ্ধ রাগ, ছায়ালগ রাগ, সংকীর্ণ রাগ ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিব-শক্তির অনুকরণে রাগ-রাগিণী বর্গীকরণে এসে পৌঁছলেন, যেখানে প্রবর্তক রাগ ক'টিই রাগ-রাগিণী নাম গ্রহণ করল। অবশ্য এই রাগ ক'টি কী ভাবে সংগৃহীত হল তার কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না, শুধু মনে হয় যে, গ্রামরাগ, জাতিরাগ ইত্যাদির জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রবর্তক রাগ-গুলির ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

যাই হোক, কল্লিনাথের টীকা, দামোদরের উক্তি, সঙ্গীতশিরোমণিকার-দিগের স্বীকৃতি ইত্যাদি প্রমাণ থেকে এ ধারণা আমরা করে নিতে পারি যে, রাগ-রাগিণী বিভাগ দশম-একাদশ খৃষ্টাব্দ থেকেই কিছুটা প্রচার লাভ করেছিল, হয়তো বা উত্তম, মধ্যম, অধম কিংবা পুং, স্ত্রী, নপুংসক ইত্যাদি নামকরণের মাধ্যমে, কিন্তু অভিজাত সঙ্গীতের প্রভাবে এই প্রচার বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

খুসরোর আবির্ভাবে যখন অভিজাত সঙ্গীতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে থাকল, সেই সময়ে কালোপযোগী দেশীসঙ্গীত প্রকাশিত হবার সুযোগ লাভ করল; এবং এই দেশীর সহায়তায়ই খুসরোর মুসলিম সঙ্গীতের প্রসার রোধ করার চেষ্টা হল। এই চেষ্টায় অভিজাত ও সাধারণ দেশী মতের ধারকগণ একই সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের রাগ-রাগিণীর শ্রেণীবিভাগে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী দুই দলকেই খুঁজে পাওয়া যায়। বিদ্যারণ্যের পূর্ববর্তী বা সমকালীন বলে আমরা যাঁদের বিবেচনা করি, তাঁদের মধ্যে আছেন হনুমান, 'রাগার্ণব'-প্রণেতা, শিবমত প্রচারক অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি ও নারদ। উমাপতি প্রাচীনপন্থী শৈবমতাবলম্বী; মনে হয়, তিনি শার্ঙ্গদেবের সমসাময়িক।

হনুমান বা হনূমন্ত আঞ্জনেয় নামক প্রাচীন গুণী হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। মনে হয় একাদশ-দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের লেখক ইনি। হনূমন্তের কোনো গ্রন্থ আজও পাওয়া যায় নি, কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞদের গ্রন্থে হনূমন্ত মতের উল্লেখ আছে। অবশ্য, এ কথা স্বীকার্য যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো আঞ্জনেয় ও হনুমানকে এক করে ফেলা হয়েছে। আঞ্জনেয় যে সময়ের গুণী ছিলেন সে সময়ে রাগ-রাগিণী বিভাগের অন্তর্গত অধিকাংশ রাগের স্থষ্টিই হয় নি। অথচ হনূমানের সময়ে আমরা ছত্রিশটি শুদ্ধ রাগকে খুঁজে পাই যাদের রাগ এবং বাগিণী পর্যায়ে ফেলতে অস্থবিধা হয় না, আর তা ছাড়া বহু ছায়ালগ বা সংকীর্ণ রাগকে খুঁজে বার করতেও বিলম্ব হয় না। রাগতরঙ্গিণী ঐ প্রকৃতির বহু রাগের উদাহরণ দিয়েছেন। হনুমানের নাম করেছেন অহোবল, বঘুনাথ, দামোদব প্রভৃতি গ্রন্থকার। এঁর যে বিশিষ্ট মত ছিল তা অহোবলের গ্রন্থ পাঠেই অনুধাবন করা যায়। লোচনও হনূমানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ কবেছেন। হনুমন্তের রাগ-রাগিণী বর্গীকবণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে ছয়টি রাগ এবং প্রত্যেকের পাঁচটি করে রাগিণী অর্থাৎ সর্বসমেত ছত্রিশটি রাগ, যা উমাপতিও স্বীকার কবেছেন। এই রাগ ক'টি হল ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ।

'রাগার্ণব'-প্রণেতাও যে বিদ্যারণ্য অপেক্ষা প্রাচীন তা বোঝা যায় 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি' (?) 'সঙ্গীত শিরোমণি', 'সঙ্গীত দর্পণ', 'রাগ-বিবোধ' ইত্যাদি গ্রন্থে রাগার্ণব মতের উল্লেখ থেকে। আশ্চর্যের কথা এই যে, উপরোক্ত কোনো গ্রন্থেই লেখকের নাম নেই, অতএব গ্রন্থকার আমাদের জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি কি না তা বোঝা যায় না। রাগার্ণবে প্রাচীন পদ্ধতিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উমাপতির মতো রাগার্ণব-প্রণেতাও ছত্রিশটি প্রবর্তক রাগকে স্বীকার করেছেন ; তবে তাদের ভাগ করেছেন ছয়টি প্রধান ও ত্রিশটি আশ্রিত রাগ হিসাবে— রাগিণী শব্দটি তিনি ব্যবহার করতে চান নি। 'রাগার্ণব' গ্রন্থটি অনাবিষ্কৃত থাকায় এর অন্যান্য প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবার কোনো সুযোগ আমরা পাই নি, কাজেই রাগিণী শব্দটি এ পুস্তকে অন্য কোনো আলোচনায় প্রযুক্ত কখনও হয়েছিল কি না তা বলতে আমরা অপারগ। প্রধান ছয়টি রাগের নামও আমরা অন্য মত থেকে পৃথক দেখতে পাই ; গৌডমালব নামে একটি রাগ এখানে দেখি যাকে অন্য কোনো মতে আমরা খুঁজে পাই না। এমন কি 'সঙ্গীতরত্নাকর' ইত্যাদি গ্রন্থেও উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ এই গৌড়মালব মালবগৌড় নাম নিয়ে পরবর্তী কালে দক্ষিণ ভারতে অতি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। যাই হোক রাগার্ণবের

প্রধান রাগগুলির নাম হল ভৈরব, পঞ্চম, নাট, মল্‌হার, গৌড়মালব ও দেশাখ্য।

পঞ্চম, নাট নাম দুটিও হনুমন্ত মতে পাই না। কিন্তু শিবমত প্রচারকের উদ্ধৃতিতে এদের খুঁজে পাই পঞ্চম ও নটনারায়ণ রূপে। শিবমতে বিয়াল্লিশটি রাগ, যাকে ভাগ করা হয়েছে ছটি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণীতে। 'সঙ্গীতদর্পণ' এবং 'রাগ-বিবোধে' ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ পাই। 'সঙ্গীতদর্পণে' শিবমত বলেই এই রাগ-রাগিণী বিভাগটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কিছু পরেই সোমেশ্বর শব্দটি এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা দেখলে মনে হয় যে, শিব ও সোমেশ্বর প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি। বস্তুতঃ সোমরাজদেব বা চতুর্থ সোমেশ্বর (?) তাঁর গ্রন্থে বিয়াল্লিশটি রাগের উল্লেখ করেছেন এটা জানা যায়, এবং তা থেকে সোমেশ্বর-মত বা শিবমত সৃষ্ট হওয়া কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। অবশ্য সোমরাজকে এই মতের নায়ক মনে করলে, রাগি-রাগিণী বর্গীকরণকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে পিছিয়ে দিতে হয়, কারণ সোমরাজের জীবিতকাল ঐ সময়েই। এই মতে ছয়টি রাগ হল ভৈরব, শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ ও নটনারায়ণ।

নারদমতে আবার আমরা ছত্রিশটি প্রবর্তক রাগের হিসাব পাই, কিন্তু ছয়টি রাগের নামে হনুমান ও সোমেশ্বরের মিশ্রিত অবস্থা লক্ষিত হয়। কাজেই সন্দেহ জাগছে এই যে, খুব সম্ভব নারদ এঁদের কিছু পরবর্তীকালের ব্যক্তি। এই মতের ছয়টি রাগ হল ভৈরব, মেঘমল্লার, দীপক, মালকোশ, শ্রী ও হিন্দোল। এই নারদমত সম্বন্ধে উল্লেখ কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না, অথচ বিভিন্ন নারদকে আবিষ্কার করা যায় 'নারদীয় শিক্ষা', 'পঞ্চমসারসংহিতা', 'সঙ্গীতমকরন্দ', 'নারদসংহিতা', 'চত্বারিংশচ্ছত রাগনিরূপণম্' ইত্যাদি গ্রন্থের সহায়তায়। এই মতের রাগিণীগুলিও অদ্ভুত; যেন নারদমতের গান্ধার গ্রাম ইত্যাদির মূর্ছনা নামগুলির বিচিত্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এই অপরূপ নামকরণের প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

ভৈরবের রাগিণীর নাম রাখা হয়েছে পিঙ্গলা, শঙ্খী, আগরী ইত্যাদি, দীপকের রাগিণীর নাম রয়েছে কঞ্চুকী, শাবরী প্রভৃতি। এই ধরণের নাম চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায় না।

নারদীয় শিক্ষায় রাগ-রাগিণীর কোনো নির্দেশ নেই।

'পঞ্চমসারসংহিতা'য় রাগ ছয়টি এবং রাগিণী ছত্রিশটি। রাগ কয়টির নাম হল মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি নূতন নাম আছে, যেমন— বৈরাগী, কৌমারী, পূর্বী, দীপিকা ইত্যাদি।

'সঙ্গীতমকরন্দ' গ্রন্থখানি সংকলনগ্রন্থ। তাতে রাগ-বর্গীকরণের দুটি পদ্ধতি দেখা যায়—

১ পুং ও স্ত্রী বিভাগ। যাতে পুংলিঙ্গ রাগ আটটি এবং স্ত্রীলিঙ্গ রাগ বা রাগিণী চব্বিশটি; এই রাগ কটির নাম ভূপাল, ভৈরব, শ্রী, ফডমঞ্জরী, বসন্ত, মালবী, নাট ও বঙ্গাল। অথবা ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী।

২ পুং, স্ত্রী ও নপুংসক বিভাগ।

এমনি করে রাগ-রাগিণী পদ্ধতি যখন উত্তর ভাবতে স্থায়ীভাবে প্রচলিত হল, তখন দক্ষিণ ভারতেও একজন তেলেগু গ্রন্থকার রাগ-রাগিণী পদ্ধতিকে প্রবর্তন করবার চেষ্টা কবেছেন। এই লেখকের নাম শৃঙ্গাবশেখর। ররঙ্গল নিবাসী এক ব্যক্তি চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে 'অভিনযভূষণ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেও প্রবর্তকরাগ ত্রিশটি; প্রভেদের মধ্যে রাগের সংখ্যা এই গ্রন্থে আটটি এবং রাগিণীর সংখ্যা বাইশটি; অন্য প্রভেদ হল রাগনাম গ্রহণে ও রাগিণী সংখ্যা বণ্টনে।

এই সময় থেকে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের আরম্ভের মধ্যে রাগ-রাগিণী পদ্ধতি গ্রহণকারী কোনো লেখকের নাম না পাওয়া গেলেও কয়েকজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতগ্রন্থ রচয়িতার সন্ধান আমরা পাই— যদিও তাঁদের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। রচয়িতাদের মধ্যে আছেন শম্ভুরাজ, মদনপাল, দেবেন্দ্রভট্ট, বিপ্রদাস, বেমভূপাল, ভুবনানন্দ প্রভৃতি। পূর্বেই এঁদের কয়েকজন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

দেবেন্দ্রভট্ট গ্বালিয়রের অধিবাসী ছিলেন। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের এই পণ্ডিত 'সঙ্গীতমুক্তাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'সঙ্গীতশিরোমণি' গ্রন্থে সঙ্গীত-মুক্তাবলীর উল্লেখ আছে।

বিপ্রদাস চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'সঙ্গীতচন্দ্র'।

ভুবনানন্দ বাংলার অধিবাসী। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইনি বর্তমান ছিলেন এবং 'বিশ্বপ্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার একটি অংশের আলোচ্য বিষয় ছিল সঙ্গীত।

এঁরা ছাড়া শার্ঙ্গধর নামক এক পণ্ডিতের উল্লেখও এই সময়ে পাওয়া যায়, যিনি 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' নামক একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যাতে সঙ্গীতসম্পর্কিত আলোচনা আছে।

চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আর একজন পণ্ডিতের নাম পাই যিনি পঞ্চদশ

শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন এবং 'সঙ্গীতদীপিকা' ও 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ইনি হলেন বারাণসী নিবাসী ভট্টমাধব। তিনি তাঁর গ্রন্থে রাগ-রাগিণী-পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সঙ্গীতশিরোমণির তালিকা থেকে এটুকুও আমরা ধারণা করতে পারি যে, এই সময়ে 'সঙ্গীতদর্পণ' নামক একখানি গ্রন্থের লেখকও বর্তমান ছিলেন, কিন্তু তিনি যে কে তা বুঝতে পারা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে, রাগ-রাগিণী-পদ্ধতি মুসলিম মোকাম পদ্ধতির অনুকরণ। কিন্তু জনক, জন্য বা ভাষা, বিভাষা ইত্যাদির সৃষ্টি অনুসরণ করলে এ অনুমান মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয। অপর পক্ষে অমীর খুসরো মোকাম পদ্ধতির সৃষ্টি করেছিলেন রাগ-রাগিণীর শ্রেণীবিভাগকে অনুকরণ করে, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁদের বলাটাও খুব যুক্তিসহ মনে হয় না যখন দেখা যায় যে, চার পাঁচ শ' বছর আগে থেকেই আরবে মুকাম, শোভা ইত্যাদির প্রচলন ছিল, যার অনুকরণ করা খুসরোর পক্ষে বেশী স্বাভাবিক। আরব প্রাচীনকালে সঙ্গীত বিষয়ে ভারতের কাছে কী পবিমাণ ঋণী ছিল এ আলোচনা এখানে তোলা অবান্তর, কারণ সেই ঋণের সঙ্গে খুসরোর সময়ের ভারতের কোনো যোগাযোগ নেই।

এই প্রসঙ্গে মোকাম বা মুকামের সঙ্গে মেল-পদ্ধতির সম্পর্কের বিষয়টুকুও আলোচনা করে নেওয়া ভালো। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, মেল-পদ্ধতি মুকাম-পদ্ধতিরই সংস্করণ, এবং মুকামের ঘোষা ও মেলের রাগগুলি একই পদ্ধতিতে সৃষ্ট। আমরা এই অনুমানকে যুক্তিসঙ্গত মনে করি না, কারণ জনক-জন্য ব্যবস্থা আমরা 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেও দেখতে পাই, এমন-কি তার আগেও পাই। তবে জনক ও জন্য একই ঠাটান্তর্গত বা জনক বারোটি স্বরের যে কোনো সাতটিকে সহায় করে উৎপন্ন, এই বিষয়ে অভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, এমন-কি খুসরোর ঠাটসৃষ্টির উপাদানগুলিও এ স্থলে প্রেরণা জুগিযে থাকতে পারে।

যাই হোক, যে সময়ে এইভাবে রাগ-রাগিণীর প্রচলনের চেষ্টা চলছিল সেই সময়ে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হচ্ছে এবং সূফী মতবাদও প্রসারিত হচ্ছে। বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গস্বরূপ কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচার তখন প্রধান হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে স্বকীয়া, পরকীয়া প্রেমরীতির নানা জাতীয় প্রকাশ তখন গানের মধ্যে দেখা দিয়েছে। নায়ক তখন পর্যন্ত প্রধান থাকলেও নায়িকার বিভিন্ন রূপ ও অবস্থা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বর্ণিত হচ্ছে। এমনই এক সময়ে জন্মালেন বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতির জন্মকাল সম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা তার মূলে রয়েছে বিদ্যাপতির রচনাগুলির ইঙ্গিত। ঐ বচনাগুলি 'পুরুষ-প্রতিভা', 'কীর্তিলতা', 'কীর্তিপতাকা' ইত্যাদি এবং পদাবলী। এই সকল গ্রন্থ থেকে আমরা কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ সম্বন্ধে উল্লেখ পাই। রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে গিয়াসুদ্দীন সুলতানের নাম জানা যায়। অবশ্য এই গিয়াসুদ্দীনের প্রকৃত পরিচয় লেখা না থাকায আমরা আন্দাজ করে নিতে পারি যে ইনি বাংলার গিয়াসুদ্দীন (১৩৮৯-১৪০৯) যিনি ন্যায়বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক অবশ্য হরিসিংহ দেবকে পরাজিত করে ত্রিহুত অধিকার করেছিলেন, কিন্তু সে হল ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের কথা। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শা'ও ঐ সময়ের; আর গিয়াসুদ্দীন মহম্মদ শা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের সুলতান, যাঁব কথা এই বিদ্যাপতি লিখতেই পারেন না। সুতরাং বিদ্যাপতি ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি ছিলেন বলেই বোধ হয়। তবে ঐ সময়ে একজন বাঙালী বিদ্যাপতিকে যে আবিষ্কার না কবা যায় তা নয়, যিনি বাঙালীর ভাষায় শিবসিংহের স্তুতি গেয়েছেন এবং মৈথিলীতে গিয়াসুদ্দীনের নাম করেছেন। ত্রিহুত বহুকাল বাংলার অন্তর্গত ছিল, সুতরাং কবির আদানপ্রদান অসম্ভব নয়।

"জনমদাতা মোর গণপতিঠাকুর
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ।"

পদটির মধ্যে কোথায় যেন বাঙালী বিদ্যাপতির মিথিলা গমনের ইঙ্গিত রয়েছে, যেমন বাঙালীপনার ছাপ রয়েছে নীচের কবিতাটিতে—

"কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়।"

এর শেষ চরণ দুটি হল—

"বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান (?)
রাজা শিবসিংহ লছিমা রমান।"

গিয়াসুদ্দীন সুলতানের নামে যে পদটি সেটি কোন্ বিদ্যাপতির তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে; বাংলার সুলতান সম্পর্কে লেখা বাঙালী বিদ্যাপতিরই শোভা পায়,

মৈথিলী বিদ্যাপতি বাংলায় এসেছিলেন বলে শোনা যায় না। পদটির শেষ দুটি চরণ হল—

"বেকত ও চোরি গুপুত কর কতিখন
বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম জুগপতি চিরঞ্জীবে জীবথু
গ্যাসদীন সুরতান।"

কোনো কোনো লেখকের মতে এই গ্যাসদীন হলেন গিযাসুদ্দীন মহম্মদ শা (১৫৩৩-৩৮); কিন্তু এই সময়ে শুধু বিদ্যাপতি নামযুক্ত কাউকে পাওয়া যায় না, সুতরাং এই মতটিকে মেনে নেওয়া যায় না।

যাই হোক, বিদ্যাপতি ঠাকুর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবেই অবহঠ্‌ট মিথিলায় প্রচারিত হবার সুযোগ পেযেছিল। কবির জন্মের কিছুকাল পূর্বে ত্রিহুতের রাজা ছিলেন কর্ণাটক, সুতরাং বৈষ্ণব প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, এবং তার পরেই আবার শৈবধর্মের প্রসার হওয়ায় শাক্তসাহিত্য গড়ে উঠবার সুযোগ পায়। তাই আমরা যেমন বিদ্যাপতির কৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর সন্ধান পাই, তেমনি পাই শৈবসর্বস্বহার, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী। বিদ্যাপতি বেশীর ভাগ গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখেছেন, যথা— 'পুরুষপরীক্ষা,' 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'শৈবসর্বস্বহার', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ইত্যাদি, অবহঠ্‌টে লিখেছেন 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা', আর মিশ্র মৈথিলীতে লিখেছেন পদাবলী— যার থেকে ব্রজবুলী অতি স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছে।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দের বাংলা ছিল বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত, সুতরাং বিদ্যাপতির এই পদাবলী তাকে আকৃষ্ট করেছে গভীরভাবে, আর এই পদাবলীর সঙ্গে বাঙালী বিদ্যাপতির পদগুলি মিশ্রিত হয়ে তাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। চৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণবধর্ম নূতনভাবে প্রচার করলেন তখন কীর্তনের মাধ্যমে কবির পদাবলী বিশেষভাবে প্রচারিত হবার সুযোগ পেল। বিদ্যাপতির পদগুলি নূতনভাবে সাজানো হল। দেখা গেল, ঐগুলিকে পালারূপে বিন্যস্ত করা সম্ভবপর এবং বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, মান ইত্যাদি লীলাকীর্তনে প্রযোজ্য বিভাগে বিভক্ত করা যায়। পদগুলি এখন আমরা যে সুরে শুনতে পাই, পূর্বে সেই রকম সুরে ছিল কি না তা অবশ্য বলা যায় না। তবে 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থ দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির বহু গান নানা দেশী সুরে গ্রথিত হয়ে গীত হত। মনে হয়, মিথিলায় ও বাংলায় নূতন রাগের ও তালের

উদ্ভাবনে বিদ্যাপতির কিছু দান ছিল; অন্ততঃ রাগতরঙ্গিণীতে কবির গানে আমরা মাধবী, ভাটিয়ালী, প্রীতিকরী, দেবকামোদ, ভোগিনী, আসাবরী, সম্ভোগিনী ইত্যাদি নূতন রাগের আবিষ্কার করতে পারি।

এই রাগতরঙ্গিণীতেই আমরা এমন কতকগুলি ভণিতার সন্ধান পাই যা থেকে আমরা বিদ্যাপতিকে অন্যান্য কবি থেকে পৃথক্ করতে পারি। অনেকে বলেছেন যে, বিদ্যাপতির কবিশেখর, কণ্ঠহার ইত্যাদি উপাধি ছিল। আমরা জানি কবিশেখর নসরৎ শাহের সময়ে বর্তমান ছিলেন—

"কবিশেখর ভন অপরূব রূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি।"

জসোধর নামে আর এক কবিশেখরকে পাই হুসেন শাহের দরবারে—

"ভনঈ জসোধর নব কবিশেখর
পুহবী তেসর কাঁহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক তাঁহাঁ॥"

বরঞ্চ কণ্ঠহার বিদ্যাপতির উপাধি বলে ধারণা করলে কোনো হাঙ্গামা দেখা দেয় না, কারণ আমরা একটি পদের শেষ চরণে পাই—

"রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
সুকবি ভনসি কণ্ঠহারে।'

বিদ্যাপতি শিবসিংহকে রূপনারায়ণ বলে সম্বোধন করতেন; এমন পদও আছে যেখানে তিনি শুধু রূপনারায়ণ লিখেছেন, যেমন—

"ভনঈ বিদ্যাপতির রাএ
মুকুটমণি
জিবও রূপনারায়ণ নৃপতি ঘরণি।"

ইতিহাসে পাওয়া যায়, পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকে শিবসিংহের বংশে রূপনারায়ণ নামে এক রাজকুমার ছিলেন। আমরা এই রূপনারায়ণের নামও কোনো কোনো পদে পাই, কিন্তু সেখানে ভণিতা বিদ্যাপতির নয়, অন্য কোনো কবির, এবং ঐ নামের সঙ্গে রাজকুমারী মধাদেবীর নামও যুক্ত দেখি—

"দানকলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপ হিন্দু সুলতানে

মেঘা দেঈপতি রূপনরায়ণ
প্রণবি জীবনাথ ভানে।"

বিদ্যাপতি নিজেকে কবিরাজ বলে পরিচয় দিতেন কি না, এ প্রশ্নও কখনো কখনো ওঠে। একজন সমালোচক বলেছেন যে, কবিরাজ বিদ্যাপতি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন এবং 'বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি' লিখেছিলেন। আমরা রাগতরঙ্গিণীতে এক কবিরাজের দর্শন পাই, যিনি লিখেছেন—

"শ্যামা সুলোচনি সুরতিবতি
অপুরুব ভূষণ ভার,
বিদ্যাপতি কবিরাজ কহ সুফলে
করথু অভিসার।"

ভাষাটুকু দেখলে বিদ্যাপতির কথাই মনে পড়ে।

অবশ্য বিদ্যাপতির তিরোধানের পর হয়তো অনেকে উপাধি হিসাবে বিদ্যাপতি নাম গ্রহণ করেছিলেন যা অন্ততঃ চম্পতির ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে জানা যায় তাঁর রচনা থেকে, যেখানে তিনি লিখেছেন—

"বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান
রাই না হেরব তোহারি বযান।"

এই ভাবে নাম গ্রহণ ত্রিহুতের বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার ইঙ্গিতই বহন করে, তাঁর পূর্ববর্তী তিন-চারজন বিদ্যাপতির গুণপনা সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্য জাগায় না।

বিদ্যাপতির নাম করলেই আপনা থেকে আর একটি নামের কথা মনে এসে যায়, সে নামটি চণ্ডীদাসের। বৈষ্ণবজনমাত্রেই স্বীকার করেন যে, চৈতন্যদেব জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ বা পালা শুনতে ভালোবাসতেন। চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড, দানখণ্ডের উল্লেখ 'বৈষ্ণবতোষিণী' নামক টীকা-গ্রন্থে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে একজন কবি বলেছেন— "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা।" চণ্ডীদাস সম্পর্কে অনুসন্ধানকালে আমাদের মনে রাখতে হবে এই তরল শব্দটি, দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ এবং 'পদকল্পতরু'তে দানলীলা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের উদ্ধৃতি।

চণ্ডীদাস

আমাদের সঙ্গীতে দেখতে পাই ভৈরব রাগ আগে ছিল বলে আদি ভৈরব, অপর ভৈরব ইত্যাদি নাম পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছে। কবাল মহম্মদ খাঁর পর

হদ্দু খাঁর পুত্র মহম্মদ খাঁ গানে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠায় পূর্বোক্ত গুণীকে বড়ে মহম্মদ খাঁ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আজও পঞ্জাবে একই সময়ে দু জন গুলাম অলী গানে পারদর্শী হয়ে ওঠায় একজনকে বড়ে গুলাম অলী এবং অপরজনকে ছোটে গুলাম অলী বলা হয়। এর থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব-শব্দ-যুক্ত কোনো নাম তখনই সৃষ্টি হয়, যখন ১) কয়েকটি একই প্রকৃতির বা অভিন্ন নাম একই সময়ে ব্যবহারে আসে ; ২) পূর্বে ঐ নাম কোথাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; অথবা ৩) ঐ নামের কোনো উপনাম থাকে।

চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব যে, চণ্ডীদাস নামে একজন কোনো প্রাচীন গুণী না থাকলে আদি, বড়ু, দ্বিজ, দীন ইত্যাদি পূর্বশব্দযুক্ত চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। কিন্তু ঐ চণ্ডীদাস কোন্ সময়ের বা তাঁর পদ কোন্ ভাষায় লেখা হয়েছিল এ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারছি না। কোনো কোনো গ্রন্থকার বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্বে অন্ততপক্ষে তিনজন চণ্ডীদাস ছিলেন, তাঁরা সংস্কৃতকে বাহন করে কাব্য লিখেছিলেন এবং সেই কাব্যগুলির কোনো একখানিতে হয়ত দান-খণ্ড, নৌকাখণ্ড পদগুলি ছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে, কাব্যগ্রন্থগুলি অপ্রাপ্য হওয়ায় পূর্বোক্ত অনুমানকে যাচাই করা সম্ভবপর নয় ; উপরন্তু, বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে কোনো উদ্ধৃতি কোথাও দেখা যায় না। এ অবস্থায় চৈতন্যদেব প্রমুখ বৈষ্ণব-কথিত চণ্ডীদাস বলতে পূর্বোক্ত চণ্ডীদাসের কোনো জনকেই বোঝায় না বলেই আমাদের ধারণা। অবশ্য 'ভাবচন্দ্রিকা' নামক রাগানুগাদি ভাবের স্বরূপ বর্ণনকারী গ্রন্থরচয়িতা যে চণ্ডীদাস তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের কিছু ইঙ্গিত দিয়ে থাকতে পারেন ; কিন্তু এই অনুমানটুকু সমস্যা সমাধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক নয়। বরং যদি অনুমান করা যায় যে, চণ্ডীদাস বাংলা ভাষাতেই কৃষ্ণলীলা প্রকাশ করেছিলেন তা হলে চণ্ডীদাসকে আবিষ্কার করা সহজ। 'বৈষ্ণবতোষিণী'তে চণ্ডীদাসাদি রচিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ইত্যাদির উল্লেখ আছে বলে চণ্ডীদাসের কাব্যও যে সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। চৈতন্যদেব যদি বিদ্যাপতির মিশ্র মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলী আস্বাদন করে আনন্দিত হতে পারেন, তা হলে চণ্ডীদাসের বাংলা ভাষায় লেখা দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড পাঠ করেও নিশ্চয়ই তাঁর তৃপ্ত হওয়া সম্ভব। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, চণ্ডীদাসের রীতি অনুসরণ করে চৈতন্যদেব রাধাবিরহ-পালা অভিনয়

করেছিলেন। চণ্ডীদাসের বাংলা গ্রন্থে রাধাবিরহ খণ্ড আছে, সুতরাং এ থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, এই বাংলা গ্রন্থ থেকেই বৈষ্ণবরা লীলা-বিষয়ক প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই— এই গ্রন্থের লেখক বলতে আমরা কি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসকেই বুঝব। যতক্ষণ পর্যন্ত আসল চণ্ডীদাসের কোনো গ্রন্থ আমাদের হাতে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয। তবু আমাদের বিশ্বাস, একজন প্রাচীন চণ্ডীদাস ছিলেন যাঁর গ্রন্থ আজ হারিয়ে গিয়েছে এবং তাঁর গ্রন্থকে অনুসরণ করেই গ্রাম্যরীতিতে বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলানাট্য রচনা করেছিলেন— যা অনন্ত গ্রাম্য পরিবেশে অভিনয় করেছিলেন। প্রকৃত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এর বেশী বলবার উপায় নেই। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রচারিত গ্রন্থখানি দেখলে তাঁর দান সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয। চণ্ডীদাস পুরাণ, লুপ্ত হরিবংশ ও গীতগোবিন্দ থেকে তাঁর গ্রন্থের উপাদান গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিষয়বস্তুকে তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন এবং পরবর্তীকালের কীর্তন-রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছেন। পালা বা খণ্ড হিসাবে সমস্ত নাটকটিকে বিভক্ত করা এই প্রথম। জয়দেব শুধু নাযিকা-ভেদের ধূয়াটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পালা সাজানো দূরের কথা, নাযিকা-ভেদ বলতে কী বোঝায় তাও স্পষ্ট করে জানান নি, কারণ অভিনয়কে তিনি গৌণ করে রেখেছিলেন। চণ্ডীদাস অভিনয়কে করেছিলেন মুখ্য কিন্তু তাকে প্রকাশ করেছিলেন গানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ আধুনিক গীতিনাট্যের তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণব মতানুসারী পালা বা লীলাকীর্তনের নিয়মাবলীর মূল সূত্রগুলি চণ্ডীদাস গেঁথে দিযে গিয়েছিলেন, তাঁর নাট্যকাব্যের তেরোটি খণ্ডের আদর্শে। তৃতীয়ত, গানের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন কতকগুলি লৌকিক বা দেশীয় প্রবন্ধের সঙ্গে যার উদ্ভব হয়েছিল বাংলার আশে-পাশে। অবশ্য প্রকীর্ণক, দণ্ডক, লগ্নক, চিত্র, বিচিত্র প্রভৃতি নাম সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, তবু এদের বেশীর ভাগই দেশীয় ভাবই প্রকাশ করে, কৌলিন্য দেখায় না।

দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ডে চণ্ডীদাস যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। 'বৈষ্ণবতোষিণী' গ্রন্থে দানখণ্ড ইত্যাদির উল্লেখকালে চণ্ডীদাসের নামই সর্বাগ্রে করা হয়েছে। 'হরিবংশবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থে দানলীলা বর্ণিত আছে সত্য, বিদ্যাপতির পদেও রাধাবিরহের আভাস আছে, হয়তো অন্য এমন গ্রন্থ পাওয়া যাবে যাতে নৌকাবিলাসের বর্ণনা আছে, তবু চণ্ডীদাসের বর্ণনায় আমরা

এক নবীনতর কল্পনার ইঙ্গিত পাই যার অনেকখানি হয়তো বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্যতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এই চণ্ডীদাস খুব সম্ভব বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন। সিকন্দর শা'র সঙ্গে পাণ্ডুয়ায় সাক্ষাৎকারকে যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চণ্ডীদাস ১৩৫০ থেকে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। বিদ্যাপতির পদগুলির কিছু কিছু অনুকরণ চণ্ডীদাসের পদেও যে পাওয়া না যায় তা নয়, তবে সেগুলি আসল চণ্ডীদাসের লিখিত কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। উভয়েই জয়দেবের নিকট ঋণী এটুকু বোঝা যায়। বিদ্যাপতির পদগুলি থেকে যেমন ঐ সময়ের দেশী রাগগুলির নাম জানা যায়, তেমনি চণ্ডীদাসের পদ থেকে তখনকার দিনে বেশী প্রচলিত রাগগুলির সন্ধান মেলে। যথা, কোড়া ধানুষী বরাডী গুর্জরী পাহাড়ী আহের-রামগিরী দেশাগ বেলাবলী মালব দেশবরাড়ী ভাঠিয়ালী কেদার মল্লার কহু ললিত মালবশ্রী গৌরী বসন্ত কোড়াদেশাগ মাহারঠা কহুগুর্জরী বিভাষ ভৈরবী শ্রী বঙ্গাল বঙ্গালবরাডী বিভাষকহু পঠমঞ্জরী সিন্ধোড়া কোডাদেশ। এই রাগগুলির প্রচারে কর্ণাট-প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমভারতীয় সংযোগের চিহ্নও কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। সিন্ধোড়া পঞ্জাবী উচ্চারণ, যে ভাবেই হোক অন্ধ্রে এসে পড়েছিল; সেখান থেকে বাংলায়। ভৈরবকে কোথাও দেখা যায় না, তার পরিবর্তে রয়েছে মালব যা পূর্বদেশীয়। কোডা বা কুড়াই-এর জন্মবৃত্তান্তও চণ্ডীদাসের রাগবিবরণে আছে— এটি ১৪শ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাংলার আশেপাশেই জন্মেছিল।

তালের মধ্যে পাওয়া যায় যতি ক্রীড়া একতালী লঘুশেখর রূপক কুড়ুক আঠতালা; অর্থাৎ জয়দেবের কালে যা প্রচলিত ছিল সেগুলিই। বাংলাদেশ প্রথম থেকেই প্রাচীন শাস্ত্রকে মেনে চলেছিল এবং তাকে সম্মুখে রেখেই নূতন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হয়েছিল। কীর্তন এই অনুসৃত রীতিরই পরিণতি।

শ্রীচৈতন্যের সামান্য কিছু পূর্ববর্তী যে চণ্ডীদাস, খুব সম্ভব তিনিই "দ্বিজ চণ্ডীদাস।" এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধেই বোধ হয়, নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন, "রাধা-গোবিন্দ কেলি, বিলাস বর্ণনাকারী।" প্রেমদাস বলেছেন, "পিরীতির পণ্ডিত।" পিরীতির পণ্ডিত এই চণ্ডীদাস কখনো চণ্ডীদাস কখনো-বা দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে আপন পরিচয় দিয়েছেন। যে চণ্ডীদাস বলেছেন—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি!"

সেই চণ্ডীদাসই দ্বিজ ভণিতায় গাইছেন—

> "দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও থাকিলে পিরীতি আশ,
> পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।"

দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোনো পরিচয় আমরা পাই না, তবে তাঁর ভাষা দেখে মনে হয় তিনি নদীয়ার কোথাও জন্মেছিলেন।

দ্বিজ চণ্ডীদাস রাধার প্রেমকে উপজীব্য করে যে আত্মসমর্পণের চিত্র এঁকেছেন তা অভিনব। প্রথম চণ্ডীদাসের অদর্শনজনিত বিরহের গান আমরা শুনেছি, কিন্তু প্রিয়কে বুকে পেয়েও না-পাওয়ার বেদনার কথা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কেউ বলেন নি—

> "দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
> তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

দ্বিজ চণ্ডীদাস গীতিনাট্য রচনা করেন নি, রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার পূর্ণ চিত্রও আঁকবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু মানবিক প্রেমকে রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতার মাধ্যমে অলৌকিকত্বের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস নামের আড়ালে আরও কয়েকজন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের। বীরভূমে কীর্ণাহারের নান্নুরে একজন চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায় যাঁকে দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে অভিহিত করা হয়; এঁর এক ধোবিনী সাধন-সঙ্গিনী ছিলেন। এই দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত ছিল, যা ছড়িয়ে পড়েছিল বাঁকুড়ায়, যেখানে ছাত্‌নায় আর এক চণ্ডীদাসের নামেব সঙ্গে সাধন-সঙ্গিনী ধোবিনীর নাম উপরোক্ত-ভাবেই যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। এই চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসও হতে পারেন, যাঁর নাম পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। অপর এক চণ্ডীদাস ছিলেন নরোত্তম দাসের শিষ্য; ইনিই বোধ হয় "আজু কে গো মুরলী বাজায়, এ ত কভু নহে শ্যামরায়" গানের লেখক— এইসকল চণ্ডীদাস সপ্তদশ শতাব্দের কবি বলেই মনে হয়।

বীরভূম-বাঁকুড়ার কবিদের গানে ঐ-ঐ দেশীয় ভাষার ব্যবহার স্বাভাবিক। তার ফলে 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত বহু পদে মিশ্র ভাষা লক্ষ্য করা যায় এবং চেষ্টা করলে ঐ ভাষার সাহায্যে বিভিন্ন চণ্ডীদাসকে খুঁজে বার করাও একেবারে অসম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির পত্র-ব্যবহার ও বটতলায় মিলনের যে কাহিনী প্রচলিত তা অমূলক বলবার কোনো প্রয়োজন নেই; নসরৎ শা'র সভাকবি কবিরঞ্জনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের

সমসাময়িক দ্বিজ চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। যা অদ্ভুত তা হল চণ্ডীদাস-তারা, বিদ্যাপতি-লছিমা, চণ্ডীদাস-নবাবপত্নী ইত্যাদি কাহিনীর প্রচার; এই কাহিনীগুলি লীলাশুক কাহিনীর অনুকরণ বা সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রচারকার্য হতে পারে কিংবা পরবর্তী চণ্ডীদাস প্রভৃতির জীবনের কল্পনামিশ্রিত ঘটনা হতে পারে। এ কথা সত্য যে, চৈতন্যদেব প্রভৃতি বৈষ্ণব-প্রধানেরাও যখন সাধন-সঙ্গিনী-পদ্ধতি পালন করতেন তখন ঐ সময়ে চণ্ডীদাস-রামীর কাহিনী নিতান্তই সম্ভব, কিন্তু অবাস্তবতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সেখানে রানী বা রাজনন্দিনী লছিমা প্রবেশ করছে, বেগম প্রাণত্যাগ করছে এবং ধোবিনী কখনো তারা, কখনো রামতারা, কখনো বা রামী নাম গ্রহণ করছে; অন্যদিকে চণ্ডীদাসের ভাই কখনো হচ্ছে নকুল, কখনো-বা দেবীদাস।

যাই হোক, সতেরো শ' খৃষ্টাব্দে আরো দুজন চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ মেলে, যাঁদের একজন বড়ু বা অনন্ত বড়ু, অপরজন দীন চণ্ডীদাস।

একজন বড়ু চণ্ডীদাসের কথা আমরা একটু আগেই বলেছি; এঁর পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। এখন আর-একজনকে পেয়ে নানা অনুমান করতে হয়। প্রধান অনুমানটি এই যে, যিনি প্রথম চণ্ডীদাসের অনুকরণ করেছিলেন তিনি বড়ু চণ্ডীদাস; এই বড়ু চণ্ডীদাস পালা গান ছাড়াও অন্যান্য পদ লিখেছিলেন, যা পদকল্পতরুতে পাওযা যায়। পালা গানটি কালক্রমে অনন্ত বড়ু প্রভৃতি বাঁকুড়ার নাট্যকারদের হস্তগত হয এবং তার আকৃতি ও প্রকৃতির নানা পরিবর্তন ঘটে: এই পরিবর্তিত গ্রন্থখানিই হল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মৌলিক গ্রন্থ নয়, এবং তার প্রকাশভঙ্গী দৃষ্টে মনে হয়, গ্রন্থখানি সংগ্রহপুস্তক, এবং গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী ও প্রথম চণ্ডীদাস প্রভৃতির নাট্য বা পালা হল ঐ পুস্তকের আধার।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসের পালার মধ্যে স্থানীয় লোককাহিনী মিশিয়ে বড়াই, চন্দ্রাবলী, মাতুলানী সম্পর্ক ইত্যাদির আমদানী করেছিলেন বলে সন্দেহ হয়। গ্রাম্যতাদোষও এই গ্রন্থে প্রচুর। এসব সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, এই গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে বলেই আজ আমরা বলতে পারছি যে, চণ্ডীদাস দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড রচনা করেছিলেন, এবং চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের রাধা-বিরহখণ্ড অনুসরণ করে রাধা-বিরহ পালা অভিনয় করেছিলেন।

অনেকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অশ্লীল। তাঁরা ভুলে যান যে চৈতন্যযুগের অশ্লীলতার মাপকাঠি এখনকার মতো ছিল না। তা যদি থাকত, তা হলে গীত-

গোবিন্দও পড়া যেত না, বিদ্যাপতির বহু পদও গাওয়া চলত না। তা ছাড়া, ঐ গ্রন্থ যে বহু তরল নাট্যরসিকের হাতের স্পর্শ পায় নি এমন কথা বলা শক্ত।

এই গ্রন্থ প্রমাণ করে যে, চণ্ডীদাস পালাগানের প্রথম স্রষ্টা, লীলাকীর্তনের পথপ্রদর্শক, রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীন নাট্যপ্রকাশের অর্বাচীন পরিচয় প্রদানকারী। প্রথম চণ্ডীদাসের গ্রন্থে কটি খণ্ড ছিল তা অবশ্য জানা সম্ভব নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা তেরোটি খণ্ড পাই, যথা— জন্মখণ্ড তাম্বুলখণ্ড দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ভারখণ্ড ছত্রখণ্ড বৃন্দাবনখণ্ড কালিয়দমনখণ্ড যমুনাখণ্ড হারখণ্ড বাণখণ্ড বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড।

দীন চণ্ডীদাস ১৮শ শতাব্দের কবি। ইনি নানা প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন করে সুবৃহৎ কৃষ্ণলীলাপদাবলী রচনা করেছেন। তিনি বাঁকুড়ার অধিবাসী ছিলেন বলে ধারণা জন্মায় এবং তাঁর কাব্যে সহজিয়া-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দীন চণ্ডীদাস তাঁর পদ-রচনায় উচ্চ শ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কাব্যে রসাপ্লুত করবার মতো ভাব-মাধুর্যেরও অভাব আছে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কৃষ্ণ-চরিত্রের কতকগুলি দিক কথকতার পদ্ধতিতে পর পর বর্ণনা করেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন এবং ঐ বর্ণনায় তিনি পৌরাণিক অপৌরাণিক সকল বিবরণেরই সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর পদে অবশ্য রাগের উল্লেখ আছে।

চতুর্দশ শতকের শেষভাগ থেকে যখন এই ভাবে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বিকশিত হতে হতে বল্লভাচার্য ও চৈতন্যদেব -প্রবর্তিত সম্প্রদায়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে, এবং তার পরে নানা শাখায় বিস্তৃতি লাভ করছে, তখনকার রাগসঙ্গীতের অবস্থা জানতে গেলে কয়েকখানি সঙ্গীতগ্রন্থ ও কিছু কিংবদন্তী ব্যতীত অন্য কিছুর সহায়তা পাওয়া যায় না। এই সঙ্গীতগ্রন্থগুলির প্রণয়ন কার্যে সহায়তা করেছিলেন জৌনপুরের সুলতানরা এবং চিতোরের রাণা কুম্ভ।

মহম্মদ জুনা'র স্মৃতিরক্ষার্থে বাদশাহ ফিরোজ তুঘলক জুনাপুর বা জৌনপুর সহর নির্মাণ করেছিলেন। এই জৌনপুরের শাসনকর্তা খ্বাজাজাহান আপন ক্ষমতা-বলে রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়ে বাদশাহের কাছ থেকে মালেক উস্‌শর্ক্ উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই অবধি জৌনপুরের সুলতানরা শর্কী নামেই নিজ নিজ পরিচয় দিয়েছেন। ইব্রাহিম শা শর্কীর রাজত্বকালে (১৪০০-১৪৪০) কড়ার শাসনকর্তা ছিলেন মালেক সুলতান। তাঁর পুত্র মালেক বাহাদুর সঙ্গীতরসিক ছিলেন। ইনি ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তায় নানা গ্রন্থের উপাদান গ্রহণ করে 'সঙ্গীতশিরোমণি' নামক একখানি গ্রন্থের সম্পাদনা কার্য শেষ করেন। এই গ্রন্থের অনেকগুলি খণ্ড

ছিল, কিন্তু এখন মাত্র দুটি খণ্ড পাওয়া যায়। 'সঙ্গীতশিরোমণি'তে বহু প্রাচীনতর গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সঙ্গে যদি গ্রন্থকারদের নাম যুক্ত থাকত, তা হলে আধুনিকদের অনেক উপকার হত। আমরা জানতে পারতাম, 'রাগার্ণব' বা 'তালার্ণবে'র লেখক কে ছিলেন, আমরা স্থিরনিশ্চয় হতে পারতাম 'সঙ্গীতদর্পণে'র রচয়িতার পরিচয় ও সময় সম্বন্ধে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধ-অধ্যায়ে পরমর্দী, অর্জুন, সোমেশ্বর, জগদেকমল্লের নাম পাওয়া যায়, যদিও অর্জুন যে কোন্ ব্যক্তি ছিলেন তা বোঝা যায় না।

জৌনপুরের এই সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত ছিল অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধরে এবং সুলতানগণ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে শাস্ত্রানুসারী রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা আরও একজন করেছেন, তিনি হলেন রাণা কুম্ভ।

কুম্ভ

চিতোরের রাণা কুম্ভ বংশসূত্রে সঙ্গীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ লাভ করেছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর ক্রিয়াত্মক জ্ঞান কতটা ছিল এবং কোন্ সূত্রে সেই জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন, তা জানবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তাঁর অধ্যয়ন যে বহুমুখী ছিল এবং পাণ্ডিত্য যে গভীর ছিল তার প্রমাণ তাঁর 'গীতগোবিন্দটীকা' ও 'সঙ্গীতরূপ' গ্রন্থ দু'খানি। গীতগোবিন্দটীকা বা রসিক-প্রিয়ায় তিনি বহুস্থানে নিজস্ব মতামত জানিয়েছেন এবং গীতগোবিন্দের রাগ-তালাদির পরিবর্তন সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাণা 'সঙ্গীতরাজ' গ্রন্থে দেশীসঙ্গীতের বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া রাগের ধ্যানমূর্তি আমরা সঙ্গীতরূপে অভিব্যক্ত দেখতে পাই। রাণা কুম্ভ ১৪৩৩ থেকে ১৪৬৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কুম্ভ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং বোধ হয় চিতোরের কৃষ্ণমন্দির তিনিই স্থাপনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁরই বংশের বধূ মীরাবাঈ কৃষ্ণের আরাধনায় বাধা পেয়েছিলেন— এই কাহিনী কতদূর সত্য বলা শক্ত। রাণা কুম্ভের রাজত্বের শেষদিকে জৌনপুরের সিংহাসনে বসেন হুসেন শা শর্কী।

হুসেন শা শর্কী

সুলতান মামুদ শা'র মৃত্যুর পর ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে হুসেন শা জৌনপুরের সুলতান হন। মাঝে মাঝে তিনি বহলোল লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেও ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান হুসেন একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীতের সেবা করবার অবসর

পেয়েছেন। তারপর অবশ্য লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি গ্বালিয়রের রাজা মানতোমরের রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন; কিন্তু সে রাজ্যও লোদী-কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সুলতান হুসেন বিহারের শাসনকর্তার নিকট আশ্রয় নেন এবং সিকন্দর লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পরাজিত হয়ে সুলতান হুসেন শর্কী বাংলার নবাব হুসেন শা'র রাজ্যে বসবাস করতে থাকেন এবং ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুসেন শা শর্কীর সাঙ্গীতিক প্রতিভা বা দান সম্বন্ধে যা শোনা যায় তার প্রায় সবটুকুই কিংবদন্তী। তাঁর সভায় পণ্ডিতরা থাকতেন বা যাতায়াত করতেন; কিন্তু তিনি কোনো গান রচনা করেছিলেন কি না, কিংবা খ্যালের নূতন রূপ দিয়েছিলেন কি না সে সম্বন্ধে কোনো সত্য তথ্যই পাওয়া যায় না। সুলতান হুসেনের গান বলে যা প্রচার করবার চেষ্টা করা হয় তাতে লেখকের নাম না থাকাতে সবই আন্দাজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই সুযোগে নানা মত আত্মপ্রকাশ করেছে।

আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে জৌনপুরের নাম করেছেন এবং সেখানে চুট্‌কল নামক একপ্রকার গান যে প্রচলিত ছিল এইটুকু মাত্র বলেছেন। এই চুট্‌কলের উৎপত্তি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও যদি আবুল ফজল কিছু বলতেন, তা হলেও না হয় সুলতান হুসেনের সঙ্গে সে-সম্পর্কে একটা-কিছু জানা যেত; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দিক দিয়ে কোনো সুবিধাই আমরা পাই না। আর পাই না বলেই চুট্‌কলের সঙ্গে খ্যালের একটা সম্বন্ধ গড়ে তুলে সুলতানকে তার নায়ক প্রমাণ করতে পারি না। অথচ সকলেই বলছেন যে, খ্যালের বিকাশে হুসেন শর্কীর অবদান আছে। অবশ্য, পরবর্তীকালের গ্রন্থে আমরা চুট্‌কল ও খ্যাল সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য পাই। 'সঙ্গীতদামোদরে' রাসক প্রবন্ধের আলোচনাকালে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, রাসক "ছটিকৈল" নামে প্রসিদ্ধ। নরহরি চক্রবর্তীর সঙ্গীতসার সংগ্রহে কিন্তু রাসকের সঙ্গে ছটিকিলের কোনো যোগ দেখানো হয় নি, যদিও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে 'সঙ্গীতদামোদর' এবং 'সঙ্গীতসারে'র মতামতকে গ্রাহ্য করেই 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ'কার আপন বক্তব্য নিবেদন করেছেন। সঙ্গীতসারের যে অনুলিপিখানি আমরা পাই তাতে ছুটিকিলের নাম নেই; অথচ নরহরি চক্রবর্তী ঐ গ্রন্থ থেকেই ছুটিকিলের বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্য, চক্রবর্তী মহাশয়ের অপর গ্রন্থ 'গীতচন্দ্রোদয়ে' ছুটিকিল শব্দ নেই; সেখানে অপর এক গ্রন্থের অনুকরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি 'ভক্তিরত্নাকর'। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরেই বা নরহরি চক্রবর্তী ঐ শ্লোকগুলি কোন্ গ্রন্থের অনুকরণ করে লিখলেন? সে যাই হোক,

সঙ্গীতসারসংগ্রহের ক্ষুদ্রগীত-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, নরহরি চক্রবর্তী বলছেন যে, ক্ষুদ্রগীত সংকীর্ণ প্রবন্ধ। এতে ধাতু ও অঙ্গ আছে, কিন্তু সালগ ধ্রুব প্রভৃতির লক্ষণ সামান্যই পাওয়া যায়; ভাষা, ধাতু ও তাল এখানে লক্ষ্য, তার মধ্যে ভাষাই হল প্রধান। এই ক্ষুদ্রগীতের একটি প্রকারের নাম "ধ্রুবপদা"। ধ্রুবপদাতে ধ্রুব ও আভোগ এই দুটি ধাতু থাকে অথবা উদ্‌গ্রাহ ধ্রুব ও আভোগ থাকে বা ধ্রুব অন্তর ও আভোগ এই তিনটি ধাতু থাকে। এই ধ্রুবপদাকে মুসলমানী ভাষায় "ছুটিকিলি" বলে এই কথা লিখেছেন নরহরি চক্রবর্তী। আমরাও জানি জৌনপুরের চুটকলে দুটি পদ আছে, কচিৎ বা তিনটি পদের মতো বিন্যাসও চোখে পড়ে, আর ধ্রুবপদার মতো দুটি পদের বা ধাতুর অক্ষর-সমাহার বা ছন্দবিভাগে সাম্যতা দেখা যায় না। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে, দেশী ধ্রুবপদার একটি স্থানীয় রূপ চুটকল জৌনপুরে খ্যালস্থষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছিল। যেমন ঐ ধ্রুবপদাই সালগ সূঢ়ের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে পরবর্তীকালে রাজা মানের প্রতিভায় স্থানীয় গাতিরূপ থেকে ধ্রুপদে পরিণত হয়েছিল।

অতঃপর, সুলতান হুসেন -কৃত বা পরিকল্পিত এই নূতন রূপের নাম যে খ্যাল তা আমরা পাই ফকীরুল্লার 'রাগদর্পণে', যেখানে তিনি স্পষ্টত বলছেন যে খ্যালের সৃষ্টিকর্তা সুলতান শর্কী। খুসরোর গানরীতির কথাও বলেছেন। কিন্তু শর্কীর গানরীতি যে অন্য প্রকার তা ফকীরুল্লা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, অমীর খুসরোর রীতি যে অন্যপ্রকার ছিল তা আমরা জানতে পারছি এবং শর্কীর প্রবর্তিত রূপ যে অনেকটা আধুনিক প্রকৃতির তাও বুঝছি। তা ছাড়া, সুলতানের নামে প্রচারিত জৌনপুরী, জৌনপুরী-চৌড়ী, জৌনপুরী-আসাবরী, জৌনপুরী-বসন্ত, ইত্যাদি রাগগুলি খ্যাল রীতিতেই গাওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং ধরে নিতে হয় যে, জৌনপুরে ঐ সময়ে খ্যালের প্রচলন ছিল। অবশ্য অনুমানই আমাদের সম্বল। কোনো সমালোচক যদি বলেন যে, ও রাগগুলি পরবর্তী কালের কোনো গুণীর সৃষ্ট, তা হলে ক্ষীণ প্রতিবাদ ব্যতীত আর কিছুই করা যায় না। প্রতিবাদটুকু এই যে, সুলতান হুসেন শার পর জৌনপুরে প্রতিভাধর আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি এই ভাবে বিভিন্ন জৌনপুরী ও দ্বাদশটি শ্যাম রাগ তৈরি করতে পারতেন। কব্বালরা করতে পারেন; কিন্তু পাঞ্জাব, দিল্লীর নাম ছেড়ে তাঁরা জৌনপুরের নাম নেবেন কেন? অথচ আমরা জানি, তাঁরা নিজেদের অমীর খুসরোর শিষ্যবংশ বলে পরিচয় দিয়েও জৌনপুরীকে

নিজেদের ঘরের রাগ বলতে চান এবং সেই রাগ সুলতানের সৃষ্ট বলে স্বীকার করতে চান।

আমরা মনে করি, যে কোনো কারণেই হোক সুলতান হুসেনের সঙ্গে কৌল গায়ক কৱালদের সাঙ্গীতিক ব্যাপারে যোগ ছিল, যার ফলে সুলতান শর্কী একদিকে যেমন শাস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, অন্যদিকে তেমন কৌল ইত্যাদি গীতরীতির ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন। এই আগ্রহশীলতাই হয়তো তাঁকে খ্যালসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে, যে সৃষ্টিতে সহাযতা করেন তাঁরই দরবারের কৌল গায়করা, এবং হযতো এই ভাবেই খুসরোর কৌল বা কৱালীখ্যাল থেকে জন্ম নেয় অভিজাত খ্যাল। দ্রুত সতারখানীর কৱালো পরিবর্তিত হয় মধ্য একতালী, ত্রিতালীর খ্যালে। হয়তো এই খ্যালের উপযোগী করেই সুলতান সৃষ্টি করেন জৌনপুবী, জৌনপুরী চৌড়ী, জৌনপুরী-আসাবরী, জৌনপুরী-বসন্ত, রামাটোডী ইত্যাদি সংকীর্ণ রাগ যারা সামান্য বিস্তার ও ফিক্‌রাবন্দীর মাঝখান দিযে চমক আর বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে পারে। পেরেছেও, তবু সুলতান হুসেন শর্কীর সাঙ্গীতিক জীবনের সমস্ত সত্য শুধু কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

অবশ্য তা ছাডা কোনো গত্যন্তর ছিল না। সুলতানের রাগ ও খ্যাল কৱালদের মধ্যে ছড়িয়ে পডেছিল বটে, কিন্তু কৱালরা স্থান পায় নি রাজদরবারে। যে ব্যক্তিত্ব থাকলে মানুষ সম্মুখে এগিয়ে যেতে পারে, সেই ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেছিল এদের মধ্যে; কিংবা হিন্দুসঙ্গীতজ্ঞদিগের শিক্ষাদীক্ষা এবং হিন্দুসঙ্গীতের আকর্ষণীশক্তির সামনে এরা মাথা তুলতে পারে নি তখনও।

ঐ সময়ে সঙ্গীতজ্ঞ যে বহুজন ছিলেন তার আভাস আমরা পাই, কিন্তু নাম পাই না, অথবা নাম পাই তো পরিচয় পাই না। যাঁদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট কিছু জানতে পারি, তাঁরা হলেন রাজা মানসিংহ তোমর, হরিদাস স্বামী, বকসু, বৈজু, গোপাললাল প্রভৃতি।

রাজা মান

গ্বালিয়ারের শাসনকর্তা রাজা মানসিংহ তোমর ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরবৎসরই তাঁকে সুলতান হুসেন শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার ফলস্বরূপ বহলোল লোদীর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং পরাজিত হয়ে বহু লক্ষ টাকা কর দিতে বাধ্য হতে হয়। বহলোল লোদীর মৃত্যুর কয়েক

বৎসর পর থেকেই আবার তাঁকে সিকন্দর লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। রাজা মানসিংহের জীবনে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে একটানা শান্তি আর আসে নি। এমনি-ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই তাঁর বাকি জীবনটুকু কেটেছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা অবস্থাতেই রাজা মানের মৃত্যু হয়। আবুল ফজলের মতে রাজা মানসিংহ সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন এবং বক্সু, ভন্নু প্রভৃতির সহায়তায় তিনি গ্বালিয়রে প্রচলিত দেশী গীত ধ্রুবপদাকে অভিজাত পর্যায়ে উন্নীত করে এক নূতন সৃষ্টির পথ দেখান। ফকীরুল্লাও বলেছেন যে, মানসিংহ পণ্ডিত ছিলেন বলেই ধ্রুপদের মতো এমন একটি গীত-রীতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়েছেন। ধ্রুপদ-পদ্ধতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজা মান সঙ্গীতজ্ঞদের সহায়তায় 'মানকুতূহল' নামক শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের সব ক'টি খণ্ড এখনও পাওয়া যায় নি, তবে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানা যায় ফকীরউল্লা-কৃত 'রাগদর্পণ' গ্রন্থ থেকে, রাজা মান যে নিজেও ধ্রুবপদ-পদ্ধতির গান করতেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু যে উদাহরণগুলি সংগ্রহ করা গিয়েছে সেগুলি দেখলে ধ্রুবপদ সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটি গান আছে যার রাগ হল পরজ, আর তাল হল ঢিমা ত্রিতাল; গানটি হল—

সা জানিয়ারে উও দিন সাল ছে।
বদন মিলায়ে মিলাৰাছে বিদুনী
ইউ বিরহা জিয়া চাল ছে॥···

আমরা যে ধ্রুপদের সঙ্গে পরিচিত তার সঙ্গে এই গানের ভাষা বা ভঙ্গীর মিল যে খুবই সামান্য তা লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে। তা হলে একে আমরা ধ্রুপদ বলব কী হিসাবে? সেই হিসাব কষতে গিয়ে কতকগুলি অনিরূপিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যা হল, ধ্রুবপদ বা ধ্রুবপদা বলতে আবুল ফজল, কোন্ স্থানের গীত-রীতিকে বোঝাতে চেয়েছেন, মথুরা-বৃন্দাবনের বিষ্ণুপদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী এবং রাজা মান কী বৈশিষ্ট্য এতে যোগ করেছিলেন, যার জন্য ধ্রুবপদকে নূতন পদ্ধতি ব'লে সকলে স্বীকার করে নিলেন?

স্থানীয় গীত-রীতি বলে আবুল ফজল যে ক'টির উল্লেখ করেছেন, আমরা তাদের মধ্যে পেয়েছি কৌলকে, চুটকলকে আর এখন পাচ্ছি ধ্রুবপদা ও বিষ্ণুপদকে। কৌল মুসলিমদের প্রবন্ধজাতীয় গান, যার বিষয় ছিল বিচিত্র এবং যার সুরে ছিল চঞ্চলতা, ছিল একটা অলঙ্কার-বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালের সঙ্গীতগ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে, চুটকল ছিল রাসক প্রবন্ধের লৌকিক বা স্থানীয় রূপ; আর রাসকে ব্যবহৃত

রাস তালটি চার মাত্রার তাল অর্থাৎ দ্রুত তিনতালের মতো। কিন্তু ধ্রুবপদা বা ধুর্‌পদের এই ধরণের লৌকিক পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। আবুল ফজল অবশ্য বলেছেন যে, বীরত্ব বা প্রশংসাসূচক গানে এই ধুর্‌পদ-রীতি গ্বালিয়রে ও আগ্রা অঞ্চলে ব্যবহৃত হত, কিন্তু আর কোনো সহায়ক তথ্যই তিনি পরিবেশন করেন নি। পরবর্তীকালের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ধ্রুবপদা কাব্যগীত ছিল, কিন্তু কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে সে সালগ-সূঢের অন্তর্গত 'ধ্রুব' প্রবন্ধের সমধর্মী ছিল। আমাদের মনে হয়, রাজা মান ধ্রুব প্রবন্ধকেই তাঁর সভাস্থ গায়কদের সহাযতায় প্রচার করেছিলেন, কিন্তু সে প্রবন্ধে গ্বালিয়রী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, এবং কল্পনাত্মক, বর্ণনামষ বা প্রণয়মূলক ভাবকে প্রকাশেব বিষয় হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

আবুল ফজলের গ্রন্থে পাওয়া যায় যে- বাজা মানের সভায় তিনজন গায়ক ছিলেন— 'বক্‌সু', 'মচ্ছু' ও 'ভন্নু'। ফকিরুল্লা ঐ সময়ের গায়ক হিসাবে নাম করেছেন 'মামুদ' ও 'কর্ণ' নামক আরও দু জন ব্যক্তির; 'পাণ্ড্যেয়'কে ইনি আন্ত্রী গায়ক বলেছেন। এঁদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি যে রাজা মানকে ধ্রুপদ-রচনায় সাহায্য কবেছিলেন তা ঠিক বোঝা যায় না। কাজেই ধরে নিতে হয় যে, পাণ্ড্যেয় ছাড়া আর সকলেই রাজা মানের সহায়ক ছিলেন। পাণ্ড্যেয় সম্ভবত সহায়তা করেছিলেন মানকুতূহল রচনায় ও রাগরূপ-নির্ণয়ে। এই সকল রচনা বা রাগরূপ নির্ণয় যে কবে হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে মনে হয় ১৪৯৫ থেকে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই কাজগুলি সম্পাদিত হয়েছিল; কারণ তার পর থেকে রাজা মানসিংহকে যুদ্ধের কারণে বেশীর ভাগ সময়েই বিব্রত থাকতে হত।

রাজা মানের সাঙ্গীতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কতকগুলি জনশ্রুতিমূলক কাহিনী বা সংবাদ আমরা আজও প্রচারিত হতে দেখি। এর একটি হল রাণী মৃগনয়নী সম্পর্কে, অপরটি হল গুর্জরী ইত্যাদি রাগের প্রচার সম্পর্কে, ও তৃতীয়টি হল সঙ্গীতবিদ্যালয় সম্পর্কে।

রাজা মানের বিবাহ কোন্ সময়ে হয়েছিল তা জানা যায় না, তবে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের পরে যে হয় নি এ অনুমান খুব সম্ভব ভুল নয়। মৃগনয়নী হয়তো গুর্জর দেশের কন্যা ছিলেন, কিন্তু যে সময়ের কথা হচ্ছে সে সময়ে গুজরাটের অধিপতি ছিলেন মুসলমান সুলতান মামুদ বিগারহা; সুতরাং গুর্জররাজকন্যা হওয়া মৃগনয়নীর পক্ষে অসম্ভব। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে বিবাহের অনুমান করবার কারণ এই যে, ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে যখন বিক্রমাজিৎ রাজা হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়ঃক্রম ২৪ বৎসরের কম ছিল বলে

মনে হয় না। তা ছাড়া, এই সময়ের কিছুকাল এদিক-ওদিক পর্যন্ত রাজা মান যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরাম পেয়েছিলেন। অবশ্য রাজকুমার থাকাকালীন যে তিনি বিবাহ না করতে পারেন তা নয়, বরঞ্চ তাই সম্ভব বেশী— তা হলে জনশ্রুতির রানী মৃগনয়নী রাজা মানের মৃত্যুর সময়ে বৃদ্ধা হয়ে পড়েন, এটা মনে রাখতে হবে।

রাজা মানের সঙ্গীতবিত্যালয় সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না, সকলেই তানসেনকে রাজা মানের সঙ্গে সম্বন্ধিত করবার চেষ্টায়, সঙ্গীতবিত্যালয় ছিল বলে অনুমান করে নিয়েছেন।

জনশ্রুতি আছে যে, রাজা মান 'গুর্জরী', 'মঙ্গলগুর্জরী', 'বহুলগুর্জরী' ও 'মালবগুর্জরী' নামক চারটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন অথবা সভাস্থ সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা প্রণয়ন করিয়েছিলেন।

গুর্জরী রাগ প্রাচীন সুতরাং এ রাগ রাজা মানের সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্য সংকীর্ণ রাগ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমরা অল্পপরবর্তী গ্রন্থে পাই না। 'রাগতরঙ্গিণী'কার শুধু বহুলগুর্জরী ও মালবগুর্জরী রাগের নামটুকু লিখেছেন; কিন্তু তার থেকে রাগগুলির সৃষ্টিকাল বা সৃষ্টিকর্তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বহুলগুর্জরী রাগটির দু রকম উচ্চারণ আছে, বহুলীগুর্জরী ও বাহালগুর্জরী। বাহাল শব্দটি যদি ভাওআলএর উচ্চারণ-ভেদ হয় তা হলে ধরে নিতে হয় যে, রাগটি ছিল ভাওআল-কী-গৌজরী শেখ ভাওআলউদ্দীনের সৃষ্ট রাগ। এই সব কাহিনীর পিছনে সত্য কতটা আছে আমরা জানি না।

রাজা মানসিংহের সমসাময়িক যে সকল গুণীজ্ঞানী ছিলেন, তাঁদের নাম আমরা সাধারণভাবে গ্রন্থে উল্লিখিত দেখি, কিন্তু তাঁদের কোনো পরিচয় পাই না।

'বক্সু' ছিলেন রাজা মানের প্রধান গায়ক। তিনি ঢাড়ী বংশীয় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ গায়কের ব্যবসায় গ্রহণ করেছিলেন, সেইজন্য হিন্দু হয়েও ম্লেচ্ছ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঢাড়ীরা আদিম সমাজের লোক ছিলেন, সুতরাং এমনিতেই তাঁদের পরিচয় ছিল শূদ্র বলে। পরবর্তী কালে অনাদর পেয়ে তাঁদের বেশীর ভাগই মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গানই এঁদের অর্থোপার্জনের উপায়স্বরূপ ছিল। বক্সু গানে প্রসিদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের জন্য নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন।

বক্সু সম্বন্ধে আর এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তিনি রাজা মানের ধ্রুপদ-পদ্ধতির প্রচারে সহায়তা করেছিলেন এবং কিছু-সংখ্যক ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মানের মৃত্যুর পর তিনি গ্বালিয়র-ত্যাগ

করেন। আবুল ফজল প্রভৃতির মতে বক্‌সু গ্বালিয়র থেকে কলীগঞ্জ রাজদরবারে আশ্রয় নেন; পরে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাট-শাসক বাহাদুর শা'র দরবারভুক্ত হন। এইখানে তিনি নাকি বাহাদুরী টোডী নামে একটি রাগের উদ্ভাবন করেন এবং বহু ধ্রুপদ রচনা করে ধ্রুপদকে সর্বজনপ্রিয় করে তোলেন। রাজা মানের সভায় বক্‌সু যে গান রচনা করতেন, সেগুলি দুই বা তিন তুকের ধ্রুপদ ছিল, কিন্তু পরে চার তুকের ধ্রুপদ সৃষ্টির দিকেই তাঁর মন যায় এবং ভগবৎ-প্রার্থনা ইত্যাদিই বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচিত হয়। বক্‌সু হোরি বা ধমার গান লিখে-ছিলেন বলেও অনুমান করা হয়, অন্তত তাঁর নামে দু-একখানি ধমার প্রচলিত আছে। 'রাগ-এ-হিন্দ্' নামক একখানি গ্রন্থে বক্‌সুব সমস্ত ধ্রুপদ ধমার সংকলিত হয়েছিল বলে জানা যায়; কিন্তু গ্রন্থখানি অপ্রাপ্য হওয়ায় রাগ বা গান সংখ্যায় কত এবং কোন্ কোন্ প্রকৃতির ছিল তা জানা যায় না।

বক্‌সু কবে জন্মেছিলেন, কোথায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কবে তাঁর মৃত্যু হয় তা এখনও অজ্ঞাত। বাদশা হুমায়ুন যখন গুজরাট অধিকার করেন তখন তিনি বহু লোকহত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। আবুল ফজল বলেন যে, সে সময়ে বচ্ছু নামক এক সঙ্গীতজ্ঞ হুমায়ুনকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ ও শান্ত করেন। এই বচ্ছু কারো মতে বক্‌সু, কারো মতে বৈজু। আমাদের ধারণা এই গুণী বক্‌সুই, হিন্দুস্থানী উচ্চারণে বক্‌সু, বচ্‌ছু হয়ে গিয়েছেন। জনশ্রুতি, বক্‌সু হুমায়ুনের দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।

'ভন্নু বা ভানু' রাজা মানের দ্বিতীয় সঙ্গীতনায়ক। দুঃখের বিষয় এঁর বংশ-পরিচয়, শিক্ষা-সংস্কার, এবং সাঙ্গীতিক দান সম্বন্ধে কোথাও কিছু লেখা নেই। শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে, রাজা মানের মৃত্যুর পর ভন্নুর বংশ পঞ্চাব বা কাশ্মীরের দিকে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এই বংশেই গুণসেন নামে এক নায়ক-সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বংশ বোধ হয় পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিলেন। ভন্নুর নামাঙ্কিত গান না পাওয়া গেলেও গুণসেন-রচিত গান পাওয়া যায়। কিন্তু সেই গুণসেন যে কে তা বুঝবার উপায় নেই।

'মচ্ছু, মজ্‌ঝু বা মঝ্‌রু' নামে আর এক নায়ককে রাজা মানের দরবারে দেখা যায়, কিন্তু তাঁরও অন্য কোনো পরিচয় মেলে না। এমনকি তাঁর নামের বানান ও উচ্চারণ নিয়েও মতান্তর আছে। মজ্‌ঝুও রাজা মানের মৃত্যুর পর নায়ক বক্‌সুর সঙ্গে নাকি গুজরাটে বসবাস করতে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে এই মজ্‌ঝুই বোধ হয় বৈজুবাওরা। আমরা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি।

মজ্ঝুর আর কোনো সংবাদই যখন পাওয়া যাচ্ছে না, দু-একখানি গ্রন্থেও যখন বৈজুকে বক্‌সুর সঙ্গে থাকতে দেখা যাচ্ছে, হুমায়ুনের গান শোনার জনশ্রুতিও যখন প্রবল, তখন মজ্ঝুকে যে বৈজুতে পরিবর্তিত না করা যায় তা নয়; তা হলে মজ্ঝুর একটা ইতিহাসও পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ-আতিথ্যই সব গোলমাল করে দেয়।

'পাণ্ড্যেয় বা পাণ্ডবীয়' ছিলেন বিজয়নগরের জ্ঞানীগুণী। রাজা মানের মানকুতূহল প্রণয়নকালে তিনি গ্বালিয়র গমন করেন এবং শাস্ত্রমীমাংসায় সহায়তা করেন। তারপর তিনি কোথায় ছিলেন তার কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে প্রচলিত ধারণা এই যে, পাণ্ড্যেয় রাজা মানের সভাতেই রয়ে যান। এর পরে এক অদ্ভুত সংবাদ দেন মহম্মদ করম ইমাম্ তাঁর মাদ্নুল মৌসিকী গ্রন্থে; তিনি বলেন যে, পাণ্ড্যেয় পরবর্তীকালে 'বৈজুবাওরা' নাম গ্রহণ করেন এবং ঐ নামে বহু গান রচনা করেন। এই সংবাদ বিচিত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল; বৈজুর নাম রয়েছে, গান রয়েছে অথচ কোথাও পরিচয় নেই, এই বিচিত্র অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই বোধ হয় এই অনুমানের প্রয়োজন ঘটেছিল। কিন্তু এই অনুমান সত্য হতে গেলে যে পরিমাণ বক্রদৃষ্টির প্রয়োজন ততটা স্বাভাবিক বিচারে অনুমোদন করা শক্ত। যদি পাণ্ড্যেয় নাম হয়, সে নাম বদল করে বৈজু বা বেজু নাম ঐ পণ্ডিত ব্যক্তি কেন গ্রহণ করলেন তা বোঝা যায় না, বিশেষতঃ তিনি যখন কারো অনুগ্রহ নিতে অনিচ্ছুক। কেউ নিজে কখনো নিজেকে বাওরা বা পাগল বলে না যতক্ষণ পর্যন্ত অপরে সেই নামে সম্বোধন না করে। তৃতীয়ত, বৈজু শব্দটি দক্ষিণদেশীয় হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই পাণ্ড্যেয়র পুরা নাম যে বৈজু পাণ্ড্যেয় বলব তারও উপায় দেখছি না। অবশ্য পাণ্ড্যেয় বা পাণ্ডবীয় শব্দটির উদ্ভব নিয়েও যে নানা বিতর্ক উঠতে পারে না তা নয়।

'মামুদ' বা 'মামুদ লোহং' সম্বন্ধে যেমন, তেমনি 'নায়ক ভগবান' এবং 'দল্লু বা ভালু'র সম্বন্ধেও কিছুই জানা যায় না। এঁরা সকলেই রাজা মানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, এইটুকু শুধু জানা যায়।

'ধোঁধু বা ধোঁড়ু' সম্বন্ধে তাও জানা যায় না। মহম্মদ করম ইমাম্ যা বলেছেন তা থেকে এ সন্দেহও জাগে যে, ধোঁড়ু এবং ধোঁধী দু জন পৃথক ব্যক্তি; একজন রাজা মানের সময়ের বা কিছু আগের অর্থাৎ সুলতান হুসেন শর্কীর সমসাময়িক গুণী, এবং অপরজন হুমায়ুনের সময়ের নায়ক ছিলেন, যদিও নামের উচ্চারণ এবং নায়ক পদবী দেখে উভয়কে একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। ধোণ্ড়ীয়া মল্লার নামে একটি রাগ আছে, যার অপর উচ্চারণ হল ধুড়ীয়া-মল্লার। ধোঁড়ুর

সৃষ্ট রাগ হলে এটিকে বলা উচিত ছিল ধোঁড়ু-কী-মল্লার, কারণ ধোডীয়া শব্দটি আসে ধোডী বা ধোঁডী থেকে, যার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ ধোঁধীর। এ থেকে অনুমান হয, ধোঁধু ধোঁধীর নামান্তর। অবশ্য ধোঁধু কোনো রাগ সৃষ্টি করেন নি। এমনও হতে পারে, শুধু সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেই তিনি হযত নায়ক হযেছিলেন। তবে একটা কথা আছে। যেমন ধোডীযা-মল্লার পাওয়া যায়, তেমন ধুন্ধী-কী-মল্লারও দেখতে পাই— যাদেব রূপগত সামান্য প্রভেদও স্বীকার করা হয। আমরা যদি ধোঁডী নামটিকে ধোডী বলে ধরে নিই তা হলে ধোডী এবং ধোন্ধী নামে দু জন গুণীকে পৃথক বলে কল্পনা করে নিতে পারি, যদিও সে কল্পনার মূল্য কতটা তা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়।

রাজা মানের সময়ে যে গ্বালিযরে যথেষ্ট সঙ্গীতচর্চা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবুল ফজলের গ্রন্থ থেকে। তাতে অকবরের দরবারের গাযকদের নাম ও বাসস্থান দেওয়া আছে। এতে দেখা যায় যে, গাযক-বাদকদের অর্ধেক গ্বালিয়র থেকে এসেছেন। তা থেকে বোঝা যায় গ্বালিয়রে গীত-বাদ্য শিক্ষার কোনো সুব্যবস্থা নিশ্চযই ছিল, কিন্তু সে-ব্যবস্থা রাজা মান করেছিলেন কি তাঁর আগে থেকেই ছিল এটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় গ্বালিয়রে এবং আগ্রায় অনেকদিন থেকেই ধ্রুবপদার চর্চা চলে আসছিল; সেই সঙ্গে যে উচ্চাঙ্গ প্রবন্ধগান সালগ-সূঢের চর্চাও ছিল না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তা ছাডা জৌনপুরের সঙ্গীতজ্ঞ সুলতানের সঙ্গেও গ্বালিয়রের যেন নাড়ীর যোগ দেখছি। সুতরাং অনুমান করে নেওযা যায় যে, গ্বালিয়র রাজা মানের সময়ের অনেক আগে থেকেই সঙ্গীতের পীঠস্থান ছিল, যেজন্য সেখানে বাইরে থেকেও বহু গুণী এবং পণ্ডিত সঙ্গীতালোচনার জন্য সমবেত হতেন (যেমন পাণ্ডেয় রাজা মানের সময়ে এসেছিলেন)। রাজা মান সেই ঐতিহ্যকে একটা নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তিনি নমস্য। তাঁর সময়েই যে আমরা সুরমণ্ডল-বাদক, বীণ-বাদক প্রভৃতিকে দেখতে পাই, তাঁরা তো নিশ্চয়ই রাজা মানের কাছে শেখেন নি। তা হলে ধরে নিতেই হয় যে, রাজা মানের আগে থেকেই গ্বালিয়র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পীঠস্থান ছিল।

গ্বালিয়রের গুণীজ্ঞানীদের কথা বলতে গেলেই আরও কয়েকজনের নাম এসে যায়, যাঁরা গ্বালিয়রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে আছেন বৈজু, গোপাললাল, ভাওআলউদ্দীন এবং ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সন্ত হরিদাস স্বামী প্রভৃতি কয়েকজন গুণী।

বৈজু

শোনা যায় যে বৈজু একজন প্রখ্যাত গুণী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বৈজু বাওরা এবং তিনি সন্ন্যাসীর মতো গানে বিভোর হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। বৈজু অলাউদ্দীন খলজীর সময়ের ব্যক্তি এবং প্রসিদ্ধ গোপাল নায়ক এঁর শিষ্য ছিলেন। বৈজু বাওরা ধ্রুপদ সৃষ্টি করেছিলেন, আর স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নামে তুক-বিভাগও ইনিই করেছিলেন। অন্যদিকে মহম্মদ করম ইমামের মত গ্রহণ করলে বলতে হয় যে, বৈজু দু জন ছিলেন, একজন বৈজুনায়ক— অলাউদ্দীনের সময়ের, অপরজন বৈজু বাওরা— মান রাজার সময়ের।

আসল কথাটি এই যে, বৈজু ও গোপালের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক কয়েকখানি গান নিয়েই জীবনীলেখকরা বড়ো বিব্রত হয়েছেন এবং নানাভাবে ঐ গানগুলির ইতিহাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু পূর্বে জানা ছিল যে, গোপাল নায়ক বলতে অলাউদ্দীন খলজীর সময়ের একজন ব্যক্তিকেই বোঝায়, সেহেতু ধারণা হল যে বৈজুও একজন এবং তিনি ঐ সময়েরই লোক। পরে করম ইমাম যখন দু জন বৈজুর কথা বললেন তখন অলাউদ্দীনের সমসাময়িক বৈজুকে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বলে সরিয়ে দেওয়া হল, আর বৈজু বাওরাকে ধ্রুপদের সৃষ্টিকর্তা গোপাল নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি বলা হল।

বৈজুকে চিনতে হলে তাঁর ভাষা, ভাব ইত্যাদির বিচার করতে হবে, কারণ অন্য কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। আবুল ফজল বা ফকীরুল্লা কোথাও এঁর নাম করেন নি, যদিও রাজা মান, ভন্নু প্রভৃতির নাম করতে ভুল হয় নি।

আমরা প্রচলিত গান থেকে চারটি নাম খুঁজে পাই— বৈজু, বৈজুনাথ, নায়ক বৈজু ও বৈজু বাওরা বা বৈজু বাবর। এই নামগুলি একই ব্যক্তির অথবা পৃথক ব্যক্তির, তার বিচার করতে গেলে রচিত গানগুলির প্রকৃতি লক্ষ্য করতে হবে। গানগুলি এক-এক করে দেখা যাক—

১) ধায়োরে সাজ দল রামচন্দ্র
বিজয় কর লংকানগর।•••
বৈজু প্রভু চলে জিত কনকপুরী
ধর ধর নিশান নৌবত বাজত
আয়োহৈ রঘুবংস ভূখন বর॥

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক নীচের গানগুলির—

২) এ আজ আযো আযো সুরজবংশ
ছত্রপতি রাজা রাম লংকানগরজীতি
মন ইন্‌ছা ফল পাযো ।
বৈজু বাবরেকে প্রভুকো নারদ তুম্বুরু
গুণী গন্ধর্ব হাহাহুহু গাযো ॥

৩) কাহেকো ভটকত ফিরত রে মন
লয়ে হরিনাম জাসোঁ কাম।…
কহে **বৈজুবাবর** সুনহো গুণিজন
সাচো সংসারমধ্য একহি হৈ রাম ॥

৪) দসহরা মুবারক হোয তুমকো
সন্ততি সম্পতি সহিত সমঝাউঁ। ‥
লংকাজীত রাম ঘর আযে সীতা
মিলনসুখী সোহেলা সুনাউঁ,
বৈজুকে প্রভু ঘর আজ বধাবা
ভক্তিদান বর পাউঁ ॥

গানগুলি পরীক্ষা করলে প্রমাণিত হবে যে 'বৈজু' ও 'বৈজুবাবর' একই ব্যক্তি এবং তিনি যে সময়ে ছিলেন সে সময়ে মুসলিম প্রভাব সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতে গভীরভাবে প্রবেশ করছে। বৈজু যে মুসলিম প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর অন্যান্য গানের ভাষার মধ্যে।

এইবার বৈজুনাথের গান দেখা যাক—

এহি নাদ আদ ব্রহ্মা উচ্চার নিরঞ্জন
নির্ভয় নির্গুণ গুণকে প্রতিপাল।
এহি নাদ জৈসে নিরঞ্জন নিরংকার
তেরী অবগত গত অবিনাশী পছান
এহি নাদ **সপ্ত ভাঁড়ী বাঁধ** আয়ো গোপাল ॥…
ঔর তান ভনত **বৈজুনাথ** নম নম
নম নম রীঝ দঈ গরে মৃগমাল

এই গানের সঙ্গে যদি নীচের গানটির তুলনা করি—

গুপ্ত সপ্ত প্রগট ছত্তীস ভাঁডী বাঁধ আযো গোপাল
বৈজুকে গায়েতেঁ সপ্ত স্থর ভুল গয়ে… ॥

কিংবা—

নাদ ব্রহ্ম অপরম্পার কিনহু ন পাযো পার
সিখত পণ্ডিত কহায়ো।…
সাত সপ্তক গুপ্ত প্রগট তীন সপ্তক গোপাল গায়ো…
তব হি **বৈজু** আযো পাহন পিঘলায়ো
ইত্যাদি।

তা হলে দেখা যায় সেখানে বৈজুনাথ ও বৈজু এক।

গোপালের সঙ্গে সঙ্গীত আলোচনাতে আবার দেখি বেশীর ভাগ ভনিতা বৈজু বাবরার হলেও রচনার ভঙ্গিমার জন্য অন্যান্য বৈজুও অভিন্ন হয়ে পড়ছে ; যেমন—

১) বিদ্যা তেরী রে নায়ক গোপাল।
গুণী ঔ মুনী তে হু জপত নাদ বেদ
ব্রহ্মা উচার করত, **নায়কবৈজু**
পিঘলাযে পাথর উমগায়ে তাল ॥

২) তেরে মন মে কেতো গুণ বে,
জেতো হোয় তেতো প্রকাশ কর রে।…
পাহন পিঘলাবে, হিরণ বুলাবে
জ্যো বরসেমেহা সরস্থতী বর রে।
কহৈ **বৈজু বাবরে** স্থনো হো গোপাললাল… ॥

৩) নাদ ব্রহ্ম অপরম্পার ইত্যাদি।

৪) গুপ্ত সপ্ত প্রগট ছত্তীস ইত্যাদি।

শেষোক্ত দুটি গানের অংশ আগেই দেওয়া হয়েছে। সবই এক ধরণের লেখা। অবশ্য এর মধ্যে এমন লেখাও আছে যা পরবর্তীকালের ব্যক্তিরা বৈজু-গোপালের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিম্বদন্তীকে জীইয়ে রাখবার জন্য রচনা করেছেন— সেগুলি একটু সচেতন হয়ে দেখলেই ধরা যায়। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, চারজন বৈজুই একই ব্যক্তি। কিন্তু কতকগুলি এমন রচনাও আছে যা আমাদের অনুমান সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। ঐ রচনাগুলির কয়েকটি যে তানসেন, বিলাস খাঁ প্রভৃতির রচনার বিকৃত রূপ বা ভনিতার পরিবর্তিত-সংস্করণ তা সহজেই ধরা যায়, তবু আরো

কতকগুলি থাকে যা বৈজু-রচিত বলে স্বীকার করতেই হয়। (রাগ-এ-হিন্দ্ গ্রন্থ আমরা যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ এ গান গুলি বক্‌সুর কি না তা বলার সম্ভাবনা নেই।) কয়েকটি গান দেখুন—

১) বারিরে কে সঙ্গ সাথ বাররী সী ভঈ মৈ
বাপ হু বিরাহ দীনী বাররো সোঁ জানকে।
জানীহু ন জাত কৌন গুরু কৌন নাথ
লীলাধরি লীনো ভেখ সর্প বিখ লিপটান কে।···

২) জাকে বৈজয়ন্তীমালা তাকে সোহে মৃগছালা
জাকে মুরলীঅধর ডমরু তাকে করবে।
জাকে জটাজূট গঙ্গ ত্রিসূল তাকে সংখ-চক্র-গদা-পদ্ম
জাকে রুণ্ড-মুণ্ড মালা তাকে পীতাম্বর পটরে॥···

৩) এজু নাদ দরিয়াব তাপৈতন-জাহাজ কীনে
উমড়ি ফির লাগেরী চোঁপ চরণ।
সুরকে বরদবান কীন্‌হে অচরা কে বৈন
তাপৈ গুণী লাগে তান তরন॥··

৪) কর পৈ গুলফ ধরে তিয় দূচিত
অনমনী, করকে সিংগার বিরহিন ভৈ বৈঠীরী।
পিয় পিয়রটলাগী মগ জোহতমোহতরঙ্গ
উমংগভরী আলস অঙ্গঅঙ্গ মরোরত হৈ ঐঁঠী রী॥···

এই ধরণের গানগুলির বেশীর ভাগ রচনা করেছেন বৈজু এবং দেখা গিয়েছে বৈজুর গানগুলি রচনা-বৈশিষ্ট্যে এবং ছন্দে বৈজু বাওরার গানের তুলনায় উন্নততর। মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, দ্বিতীয় কোনো বৈজু হয়তো বৈজু বাওরার পরবর্তীকালে বর্তমান ছিলেন। যিনি পূর্ববর্তী গুণীদের অভিজ্ঞতার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন; অথবা বৈজু-অনুরাগী কোনো পরবর্তী কবিত্বশক্তিসম্পন্ন গুণী তানসেন ইত্যাদির অনুকরণে এই গানগুলি লিখেছিলেন।

বৈজুর গানে আরো কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। এঁর গানগুলির বিষয়বস্তু রাজা মানের বিষয়বস্তু থেকে পৃথক; এঁর ভাষা শুদ্ধ বৃজভাষা; এঁর ছন্দ একটু ঢিলাঢালা হলেও বাঁধুনি দেবার চেষ্টা আছে; এবং কবিতার ছন্দ তালকে অনুসরণ করে চলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৈজুর গানে বিষ্ণুপদের প্রভাব অল্প আর ধ্রুবপদার প্রভাব বেশী। বিষ্ণু-ভক্তদের

প্রভাব বৈজুর উপর বেশী নেই, বরঞ্চ শিব, রাম, শক্তি এঁদের সম্বন্ধে বৈজু লিখেছেন অনেক কিছু। সব মিলিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে তাতে অনুমান করা যায় যে বৈজু উত্তরভারতেরই গুণী, যিনি বাব্বর নামক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিংবা বাল্যকালের মতিগতির জন্য বাব্বরা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর জন্মকাল ১৪৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে হওয়া সম্ভব।

বৈজু সালগ-সূঢ় প্রবন্ধের গান শিখেছিলেন এবং খুব সম্ভব গোপাললালের সহপাঠী ছিলেন। যদিও তাঁর গুরু কে ছিলেন জানার উপায় নেই, তবে সেই গুরু যে ব্রজধামের নিকটস্থ কোনো জায়গায় থাকতেন তাতে সন্দেহ নেই।

ধ্রুব-রাসক-একতালী-পদ্ধতির গানে যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল সেই পরিবর্তন অনুসারেই বৈজু গান গাইতেন, অতএব তাঁর গানে চারটি তুক্ পাওয়া যেত, তাল ছিল চৌতাল বা ধমার, বিষয় ছিল স্তুতিসূচক বা গুণজ্ঞাপক। তখনও ভাষাটি খুব ভালো ভাবে গড়ে ওঠে নি, তাই হোঁচট-খাওয়া-ভাব খানিকটা রয়ে গিয়েছে। বৈজু কয়েকটি রাগ ভালো গাইতেন, তাই তাঁর গানে সেই কটিকেই পাওয়া যায়। যথা, ভৈরব টোড়ী মূলতানী-ধনাশ্রী মালকোষ জয়শ্রী ভীমপলাসী পরজ ইত্যাদি। ভৈরব মূলতানী-ধনাশ্রী উত্তরভারতীয় রাগ এবং তাদের প্রচলন অল্পদিনের, বিশেষত মূলতানী-ধনাশ্রীর, যার উৎপত্তি হয়েছিল মুসলিম গুণীর সৃজনীশক্তির ফলে। তা হলে কি বৈজুর গুরু প্রথমদিকে কোনো মুসলমান গুণী ছিলেন? বেজু বেগ বাব্বর বলে যে কোনো কোনো ব্যক্তি বৈজুর মুসলমানী নামকরণ করেন তার মধ্যে কোনো সত্য নিহিত আছে?

যাই হোক, বৈজু যে গীত-রীতি শিক্ষা করেছিলেন সে গীত-রীতি পরবর্তী কালের ধ্রুপদ গঠনে সহায়তা করেছিল। তাঁর গানের মধ্যে দেবস্তুতি, নাগবর্ণনা এবং নায়িকা-ভেদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈজু কতদিন বেঁচেছিলেন জানা যায় না। তিনি নায়ক উপাধিই বা কার কাছ থেকে পেলেন তাও বোঝা যায় না।

বৈজুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোপাললালের নাম।

গোপাললাল

গোপাললাল নামটি উত্তরভারতের নাম। দক্ষিণভারতে 'লাল'যুক্ত নাম সাধারণত হয় না। অনুমান হয়, গোপাললাল নায়ক বৈজুর মতো বৃন্দাবনের নিকটে কোথাও জন্মেছিলেন। গোপাললালের রচনা দেখলেই সন্দেহ জাগে যে তিনি গায়ক হওয়া অপেক্ষা পণ্ডিত হওয়া পছন্দ করেছিলেন বেশী,

তাই কিছুকাল শিক্ষার পরই নানা স্থানে সাঙ্গীতিক বস্তুসংগ্রহ ব্যাপারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবুল ফজলের গ্রন্থে আমরা দেখেছি, তেলেঙ্গানার প্রেমগীতি বা তরল গানকে ধরু বলে, পঞ্জাবী দেশী গানকে ছন্দ বলে। অন্ধ্রের এই ধরুকে, ও পঞ্জাবের ছন্দকে গোপাললাল নূতন রূপ দিলেন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যবহার করলেন। দক্ষিণের গীত, প্রবন্ধের প্রচলন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কে করেছিলেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে মনে হয় ও কাজটিও গোপাললাল সম্পন্ন করেছিলেন। গোপাললালের গুরু কে ছিলেন না জানার ফলেই এমন দুর্বল অনুমানই করতে হয়। আগেই বলেছি যে, এই গুরুর কাছে পরবর্তীকালে বৈজু গান শিখেছিলেন, অতএব এঁদের দুজনের প্রকাশভঙ্গী একই রকম হওয়ার কথা; কিন্তু তা হয় নি, কারণ বৈজু ছিলেন সাধক, ক্রিয়াসিদ্ধও আর গোপাললাল পছন্দ করতেন নূতন নূতন রীতি ইত্যাদির সৃষ্টি। দুই সহপাঠী গানের মাধ্যমে নিজ নিজ বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তা থেকে দু জনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতাও অনুধাবন করা যায়। অবশ্য অনুধাবন করবার সময় মনে রাখতে হবে যে সেই প্রাচীন কালের গুণীরা নিজেদের সবসময়েই সংযতভাবে প্রকাশ করতেন। অতএব যেখানে এই সংযমের অভাব দেখা যাবে সেখানেই যে রচনাটি পরবর্তীকালের তা ভেবে নেওযাই সংগত হবে। তা হলে আর তাঁদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তা ভাবতে হবে না। একথাটা বলছি এই কারণে যে, অনেকের এই ধারণা গোপাললাল বৈজুর শিষ্য ছিলেন কিংবা হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন, এবং গোপাল ও বৈজুর মধ্যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়েছিল। প্রমাণ কী? না কযেকখানি গান। এ ধারণা সত্য নয়— কেন নয়, তা পরে বলছি। আপাতত গানগুলি পরীক্ষা করা যাক যাতে সকলেই বুঝতে পারবেন যে এর বেশীর ভাগ রচনা পরবর্তীকালের। পরবর্তী গোপাললালের গান দ্রষ্টব্য—

খরজ কহাঁসে রিখভ কহাঁসে
কহাঁসে উপজ্যো স্বর গন্ধার।…
কহে গোপাললাল সুনিয়ে বৈজুবাররে
নাদ অথাহ, জাকী গতি অগম অপার॥

এই বালকসুলভ প্রশ্নের উত্তর দেখুন—

মহকী সুর খরজ, রিখভ সুর ছাগরী
দাদুর সুর হৈ রী গন্ধার।…

কহে বৈজুবাবরা সুনিয়ে গোপাললাল
কেতে গুণী পিছড়ে কাহু ন পাযো
নাদ কো পার ॥

প্রশ্ন ও উত্তর যাই হোক, রচনা দেখলেই বোঝা যায়, গানের ছলে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

এর পর দেখুন, একই রাগের দুটি গান। বৈজু বলছেন—

রাগ অপরম্পার তাকো ভেদ বতাবে
ঔর সন্‌জম্ হোকে সমঝ করকে গাবে।
বাণী সুধ করো তাল মান সাচি ধরো
বহুবিধ তান দিখাবে।
সোনাকী দিয়ারা রুপাকী বত্তি
তাকো জোত জৈসে ঐসে সুর লগাবে ॥…

গোপাল সে জায়গায় বলছেন—

সুরজ নে এসে জনম জাকো রহি রাগ দীপক…
আদ ছহো রাগ ইয়ে বীচ দীপক রাগ
রাগিণী অনগিনতি সাচ গুরুখে লাযো…

গান দুটি পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় একজন প্রয়োগ সম্বন্ধে উৎসুক, অপরজন উপপত্তি সম্বন্ধে উৎসাহী।

লক্ষ্য করলেই দেখবেন, উত্তর-প্রত্যুত্তর বলে যে বস্তুটিকে বৈজু-গোপালের ক্ষেত্রে গুণী বা সমালোচকরা প্রমাণ করতে চান, সেটি আসলে শুধু এক তরফা এবং তা আবিষ্কৃত হয়েছে বৈজুকে গোপালের গুরু কিংবা গোপাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করবার জন্য। গানগুলিও কেমন যেন ছকে ফেলা, সেই হরিণকে মালা পরানো, সেই পাথর গলানো। এ ছাড়া কথা নেই। প্রতি গানে ভাষার প্রয়োগ এমন অদ্ভুত যে মনে হয় গান গাইবার আগেই পাথর-গলা শেষ হয়ে গিয়েছে, অথবা পাথর-গলার গল্প বৈজু সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, যা অত বড়ো একজন জ্ঞানীর পক্ষে অসম্ভব। অন্য গানগুলিতে আছে উপদেশ দেবার প্রচেষ্টা। যা প্রথম শিক্ষার্থীকে দিলে মানায়, কিন্তু একজন নায়ককে দিতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হয়। যেমন, একজন সংসার-বিরক্ত সাধু বলছেন—

দেস-দেস কে গুণী সকল সৃষ্টি
মহামুনী তে হু রচ-পচ গয়ে ভেদ নহী পায়ো।

তব হি বৈজু আয়ো পাহন পিঘলায়ো
জিনতে পায়ো তিনহি লুকায়ো, মৃগ
বোলায়ো, গরে কো হার গোপাল হি দিরায়ো ॥"

অথবা

গুপত সপ্ত প্রগট ছত্তিস
ভাঁতী বাঁধ আয়ো গোপাল,
বৈজুকে গায়েতে সপ্ত সুর ভুল গযে
পিঘলে পাখান মাঝ তাল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে কি এই গান কেউ গাইতে পারে? এ তো পরবর্তী কালে লোককে নিজের গুণপনা শোনাবার জন্য সৃষ্ট— বৈজু কখনোই যা করতে পাবেন না।

তবু বলবো, এই গানগুলি রচনা করে পরবর্তীকালের গুণীরা আমাদের উপকার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, পোপালের সমসাময়িক বলে যাঁকে ভাবা হত তাঁর নাম বৈজু বাবর; এবং তাঁবা স্বীকার করেছেন যে, গোপাললাল প্রকাণ্ড বিদ্বান ছিলেন আব বৈজু ছিলেন ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। যতগুলি গান প্রতিযোগিতামূলক বলে ধরা হয়েছে, আগেই বলেছি যে তাদের প্রায় সব গুলিতেই ভনিতা বৈজু বাবরের। নীচের গানগুলি দেখলে বোঝা যাবে যে, গোপাললাল উপপত্তি এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানেরই পক্ষপাতী ছিলেন বেশী—

১) বিদ্যা তেরীরে নায়ক গোপাল।
গুণী অব মুনী তেহু জপত নাদ বেদ
ব্রহ্মা উচার করত
নায়ক বৈজু পিঘলায়ে পাথর
উমগায়ে তাল।

২) বিদ্যা সোঈ ভলী জাতে পাইয় হৈ রী লাল।

বৈজুর গানের সঙ্গে পাথর-গলানো ব্যাপারটা বৈজু-ভক্তদের কাছে বাতিক হয়ে উঠেছিল। না হলে নীচের এই সুন্দর গানটি তাঁরা পাথর-গলা কথা যোগ করে নষ্ট করে দিতে পারতেন না—

জোবন গরব সখী জিন কীজে রহে ন
কাহু পৈ ঔর ন রহৈগো।...

মধুর রসনাতে হিয়সোঁ বোললে
জাসো আগে পাছে কোউ
কছুন কহৈগো ॥
বৈজু কে সাথ সপ্ত স্থর বাজে
পিঘলে পাখান মঝ তাল ঢহৈগো ॥

বৈজু-উপাখ্যান শেষ করে আমরা যখন গোপাললালের কথায় আবার আসব তখন দেখব যে তাঁর নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যা পরবর্তীকালের অনেকেই অনুকরণ করেছেন। ছন্দের শেষে "রে" যোগ করা কিংবা "ইয়া ইয়া" শব্দ যোগে গান সৃষ্টি করা এঁর বিশিষ্টতা এবং এগুলি তিনি ধারু বা ছন্দ-রীতিতে প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

অরি দলখলন রে…
ধারু গাবত নাযক গোপাল রে।

স্থর উমঙ্গ উঠত দেখো
তিয়া ইয়া ইয়া গাইয়া।…

গোপাললাল সংগ্রহকার ছিলেন এ কথা আগেই বলেছি; তাঁর গানেও তার প্রমাণ আছে। তিনি যে সুলতান শর্কীর নিকটেও ঋণী ছিলেন তাও এই গানে পাওয়া যায়। গানটি অতি প্রসিদ্ধ "গ্রাম শ্রুতি মুরছনাকো বেওর" ইত্যাদি, যার একটি তুকে আছে "গীত, ছন্দ, ধারু, ধুরপদ, ঝুমরা, প্রবন্ধকো বখান সমঝাবত জিয়ে"। তুকটি জানাচ্ছে যে ধুরপদ সে সময়ে ছিল, তবে তা মান রাজার ধ্রুবপদ নয়, গীত ও প্রবন্ধ ছিল, যা দক্ষিণ দেশীয়, আর ছিল ঝুমরা, যার একটু আভাস দিয়েছেন মহম্মদ করম্ ইমাম চুটকলের পরিচয় জানাতে গিয়ে। এই ঝুমরা ছিল ঝোম্বড নামক প্রবন্ধের স্থানীয় সংস্করণ যার সহায়তা নিয়েছিলেন সুলতান হুসেন শর্কী চুটকলার নবীনরূপ নির্মাণ করার সময়ে।

আর একটি গানে গোপাললাল তেলেনা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন এবং আশ্চর্যের কথা এই যে ঐ তেলানা নামটি বৈজুর গানেও এসে পড়েছে— যা যাঁরা বৈজুকে ধ্রুপদের জনক বলেন তাঁদের ভাবিয়ে তুলবে। গান দুটির অংশবিশেষ হল—

১) স্থর প্রথম সারিগম নাদরে…
চতুরংগ ত্রিবট তেলানা
সব্দ স্থরণ কো ভেদরে।
কহে নায়ক গোপাল… ॥

২) রাগ রঙ্গ সুধ মুদ্রা সুধ অচ্ছর
সুধ ছন্দ পৈখত হৈ
সাচে গুরুন সোঁ পাবে লেখ।
ধারু ধুরপদ প্রবন্ধ ছন্দ গীত **ধোৱামাঠা**
চতুরঙ্গ **ত্রিবট তেলানা** দেস বিদেসস্থ
ভাখা সংস্কৃত বিসেখ।
কহে বৈজু বাবর সুনো হো··· ॥

অমীর খুসরোর তরানার উল্লেখ করে গোপাললাল যে পরবর্তীকালের অনুগামী গুণী সে কথাটা স্বীকার করে নিলেন।

তিনি যে ঠিক কোন্ সময়ে ছিলেন তার কিছু নির্দেশ পাওয়া যায় গোপালের দু-একখানি গান থেকে, যদিও সেই নির্দেশের উপর পুরাপুরি নির্ভর করা যায় না। কোথায় যেন প্রক্ষেপের সুত্রকে লক্ষ্য করা যায়। গোপাললাল লিখেছেন—

১) দিল্লীপতি নরেন্দ্র সিকন্দরশাহ
জাকো ডরসে ধরতীপতাল হিলায়ো···

২) ধারু গাবত নায়ক গোপাল
ছত্রপতি সংগ্রাম ঝঝরোরে ··

এই দুটি গানের মধ্যে সিকন্দর শা ও সংগ্রাম সিংহের নাম পাওযা যাচ্ছে। যে সিকন্দর শা দিল্লীপতি ছিলেন তিনি হলেন লোদী বংশের; রাজত্বকাল ১৪৮৯ থেকে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ। এঁর সময়ে গোপাললাল থাকলে তাঁর বয়স তখন অন্তত চল্লিশ, কারণ তিনি তখন নায়ক উপাধি-প্রাপ্ত। ঝঝর মারবার রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্থানও বটে আবার পঞ্জারের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডও বটে, কিন্তু সংগ্রাম সিংহ সম্বন্ধে কোনো সন্ধান না পেলে এই বিবরণ আমাদের কোনো কাজে লাগে না। ঝঝর নামটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই স্থানের সঙ্গে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের নাম যুক্ত আছে, অথচ দুঃখের বিষয় এই স্থানের কোনো ইতিহাস আমরা জানতে পারি না।

গোপাললালকে অকবরের সমকালীন প্রমাণ করবার জন্য কেউ কেউ সিকন্দর শাহর স্থানে অকবর শাহ পাঠ গ্রহণ করেন, কিন্তু গানটিই এমন যাতে বোঝা যায় গোপাললালের সঙ্গে দরবারের সম্পর্কটা নিবিড় ছিল। অকবরের সঙ্গে এমন সম্পর্ক থাকলে কোথাও-না-কোথাও তার উল্লেখ থাকত। তানসেনের গান এদিক দিয়ে আমাদের সাহায্য করবে না। কারণ প্রক্ষেপযুক্ত সেই সব গানে

উল্‌টা-পাল্‌টা অনেক কথাই আছে। আমাদের বিবেচনা এই যে, যে ব্যক্তি দিল্লীপতির অত প্রশংসা করতে পারেন, ঝঝরে গিয়ে ধারু গান গেয়ে আসতে পারেন, সে ব্যক্তি আকবরের সভায় থাকবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না।

এই বিচার তাঁদের বিরুদ্ধেও খাঁটে যাঁরা গানের মধ্যে প্রক্ষেপ যোগ করে বা নূতন গান লিখে প্রমাণ করতে চান যে, গোপাললাল রাজা রাম বাঘেলার দরবারে ছিলেন। সেই রকম দুটি গান আছে। গান দেখলেই বোঝা যায় আসলটি অন্য ধরণের একটি গান ছিল, যাকে ভেঙে পদ বাড়িয়ে এই গান দুটি সৃষ্টি করা হয়েছে। গান দুটি হল—

১) ও তুঅ গত মমগে উমগে,
মেরে আইয়া মমগে উমগে উমগে।
বরচীর পবংগ তুঅ অঙ্গরে
আলী গোল সঙ্গ অমোলরে
মস্তক কুণ্ডল ডুল্‌ল রে ॥
ধারু গারত নায়ক গোপাল রে
রাজা রাম চতুর সুজন রে
তুঅ চঞ্চল অচল সু আন রে ॥
তিয়া ইয়া ইয়া তিয়া গাবৈ তান রে
আইয়া আইয়া ইয়া ইয়া
ইয়া তুঁ অমান রে ॥

২) অত গত মন্ত্র গম্‌ মম গম্‌ মম
মম গম মগ মমগ অত গত মন্ত্র গাইয়া।
ত্রৈলোকী ভূমে কমলরে হরি কোল রে
সন্তোল রে মকরন্দ আইয়া ॥
উদধি চন্দ্র ধরো মন মে
অত গত মন্ত্র গাইয়া ॥
তড়তক ঝুমণ জুগল রে, ততকাল নিরত
অপার রে অধার রে
ধারু গাবত নায়ক গোপাল রে
রাজা রাম চতুর ভয়ে অইয়া রে
অত গত মন্ত্র গাইয়া ॥

দুটি গানই ভীমপলাসী, ত্রিতাল। এইবার প্রকৃত রূপটি দেখা যাক—

৩) তুঅ চলন গজমত ধীর
চন্দ্রবদন দেখে জগত লোগ
মনমে উমঙ্গ পাইয়া।
বরচীর অঙ্গমে সোহত স্রবন কুণ্ডল ডোলত
বেণী বাঁধত ফণী ভ্রমত মন ঐসী
য়াদ আইয়া॥
চঞ্চল নৈন সোহে অঞ্জন
কৌন করত য়াকো ববণন
বিধিনে য়হী রূপ নিরজন বৈঠে
দেখো কৈসী বনইয়া॥
ধারু গাৰত নাযক গোপাল অব
স্রবণ স্থন লীজে গুণী সব
স্থর উম গ উঠত দেখো
তিয়া ইয়া ইয়া গাইযা॥

জগন্নাথ কবিরায়েব এক ধ্রুপদ থেকেও বোঝা যায় যে, গোপাললাল আকবরের বহু পূর্বের গুণী এবং এই সময় পর্যন্ত থাকতে হলে তাঁকে নব্বই-পঁচানব্বই বৎসরের বৃদ্ধ হতে হয়। গানটি হল—

সর্ব কলা সম্পূরণ মতি অপার বিস্তার
নাদ কো নায়ক 'বৈজু' 'গোপাল'।
তা পাছে 'বকযু' বিহঁসি বস কীন্হো
'মহমু' মহি মণ্ডল মে উদোত
চহু চক ভরো, ডিঢ় বিদ্যানিধান
সরস ধরু 'করন' ডিঢ তাল॥...

গানটির দু রকম অর্থ হয়, প্রথম অর্থে বৈজু ও গোপাললাল বকৃযু অপেক্ষা প্রাচীনতর; দ্বিতীয় অর্থে বৈজু ও গোপাল বকৃযু অপেক্ষা উন্নততর নায়ক। দ্বিতীয় অর্থ জগন্নাথ কবিরায়ের পক্ষে যে লেখা অসম্ভব তা নয়, কিন্তু প্রথম অর্থটিকেই বেশী যুক্তিসহ বলে মনে হয়।

তা হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, গোপাললাল হয়তো রাজা মানের সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই একজন সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর মত

ভিন্ন ছিল বলে রাজা মানের সভায় যোগদান করেন নি। গোপাল এবং বৈজুর অনুসৃত রীতি গ্রহণ করেছিলেন হরিদাস, রামদাস প্রভৃতি গুণীগণ এবং তানসেনও। তাঁর গানেই এঁদের বিদ্যা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে এবং সেই উল্লেখের সঙ্গে একটা সম্ভ্রম জড়িয়ে আছে। তিনি লিখেছেন—

অনেক সৃষ্টি রচি-পচি গয়ে ব্রহ্মা-
বিষ্ণু-রুদ্র মহামুনি প্রসন্ন ভয়ে
সারঙ্গ বৌরায়ো॥
স্বপ্ত গুপ্ত সপ্ত প্রগট নায়ক গোপাল
ধ্যায়ো তানসেন তাকো
বৈজু পাখান পিঘলায়ো॥

রচনার মধ্যে গোপাললাল ও বৈজু ব্যতীত আর কারো নাম নেই; কতটা সম্মান দিলে তবে তানসেনের কাছে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় সেটা ভাববার। এমন যে গোপাল তিনি কবে বা কার কাছ থেকে 'নায়ক' উপাধি পেলেন সেটা জানা গেল না। বৈজুর নাযক উপাধি প্রাপ্তি আরও রহস্যময়। গোপাললাল তবু তো নবাব বাদশার দরবারে ঢুকতেন, কিন্তু বৈজু তো সে রকম কিছুই করেন নি। তা হলে সেই সাধু নিজের নামের আগে 'নায়ক' উপাধি জুড়ে গান রচনা করলেন কেমন করে? এ সব দেখলে মনে হওয়া সম্ভব নয় কী যে নায়ক-যুক্ত গান পরবর্তী কালের লেখা অথবা অন্য কোনো বৈজুর রচনা? বৈজুর নায়কত্ব প্রমাণ করবার জন্য কোনো-এক ব্যক্তি একটি গান লিখে তারই সাহায্যে তাঁকে বাহাদুর শার দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে বক্সুর মতো বৈজুরও নায়ক উপাধি পাওয়া সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ইনি মজ্ঝু হলে বলবার কিছু নেই, বাবর তখন জাতিসূচক হলেই হল। গানটি হল—

দীনো করতার তুম্হে রাজ-সাজকী
সকল সোভা ঐসী নহী ঔর কোউ জানী।…
দেত হো দান ঘনমান দুখদারিদ্র বিড়ারণ
হমরে কারণ কিয়ো তুমহু কো অব সাহব ফিরা নিসানী॥

গানটিতে রাজার নাম নেই, শুধু বহাদুরী টোড়ী রাগের নাম আছে বলে পূর্বোক্ত ধারণা করে নেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, নায়ক গোপাললালের সম্বন্ধে আর-কিছু জানবার উপায় নেই। কারণ ইতিহাসের কোথাও এঁর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তাঁর রচনা

থেকেই আমাদের জেনে নিতে হয় যে, আধুনিক কালের গীতি-পদ্ধতির একজন পথনির্দেশক হলেন এই গোপাললাল, প্রাচীন প্রবন্ধ বিশেষত সালগস্থূঢ়ের নব নব রূপায়ণকারী হলেন এই নায়ক গোপাল, যিনি রাজা মানের প্রভাবকে অস্বীকার করেছিলেন। দক্ষিণের ধরুকে, উত্তরের ছন্দকে, পূর্বের ঝুমরাকে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর নীরস ভাষাকে অধ্যবসায়গুণে সরস ভাষায় পরিবর্তিত করেছিলেন। লিখেছিলেন—

ছন্দ মকরন্দ ফুল ফল পরিমল
স্থগন্ধ, দিব্য বদন তনু মদন পৈ জাল ॥

নায়ক গোপাললালের সমসাময়িক স্থলতান শর্কীর বিষয়ে আগেই বলেছি। আর-একজন মুস্‌লীম গুণীকেও এই সময়ে পাওয়া যায় বলে কবালগুণীরা বলে থাকেন, যাঁর নাম হল 'শেখ ভাওআলউদ্দীন জিকৃরিয়া বা জকারিয়া'।

কিন্তু শেখ ভাওআলউদ্দীনের জীবনী নিয়েই গণ্ডগোল। ইনিও মূলতান-বাসী, স্থরাবর্দীয়া বহাউদ্দীনও মূলতানবাসী। ইনিও মূলতানী ইত্যাদি রাগের স্রষ্টা, বহাউদ্দীনও তাই। কাজেই ভাওআলউদ্দীন বলে কেউ ছিলেন কি না এই নিয়েই সমস্যা। তবে কথা এই যে, স্থরাবর্দীয়া-সম্প্রদায় সঙ্গীতকে এমন ভালোবাসতেন না যে নূতন নূতন রাগসৃষ্টির প্রেরণা তাঁদের মধ্যে আসবে— এই একমাত্র কারণ বহাউদ্দীনের সঙ্গীতবিদগ্ধতার বিপক্ষে প্রযুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, ভাওআলউদ্দীন ১৫শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং মূলতানী-ধনাশ্রী ও গৌজরী রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। বৈজুর গানে মূলতানী-ধনাশ্রীর ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়, এবং এই মূলতানী-ধনাশ্রীই ভীমপলাসীর রূপ পরিবর্তনে সহায়তা করে। গৌজরী বোধ হয় বাহাল বা ভাওআল গুজরীতে রূপান্তরিত হয়, যা প্রাচীন গুর্জরীর পরিবর্তন ঘটায়। কবালমতে ইনি খুস্‌রোর শিষ্য-বংশীয়।

১৫শ খৃষ্টাব্দে আমরা যে গুণী-জ্ঞানীদের দেখলাম তাঁদের বেশীর ভাগই মুস্‌লীম। তাঁরা এক দিক দিয়ে আমাদের উপকার করলেও অন্য দিক দিয়ে তাঁদের প্রভাবে গীতি ও রাগ -পদ্ধতিতে শুদ্ধ রূপের স্থলে মিশ্র বা সংকীর্ণরূপ এল। শুধু গ্রন্থে প্রাচীন শাস্ত্রের অনুশাসন দিনের পর দিন প্রচারিত হয়ে চলল, কিন্তু সে প্রচার নবীন দলের কারো কানে পৌঁছল না। লোক-পদ্ধতি প্রাধান্য বিস্তার করল।

উত্তর ভারতের যখন এই অবস্থা তখন দক্ষিণ ভারত যে তার প্রাচীনতা রক্ষার জন্য ঐতিহ্যমাত্রকেই আঁকড়ে ধরে বসেছিল তা মোটেই সত্য নয়; সেও উত্তর

ভারতের মতো পুরাতনকে নূতন ভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিল। সেই চেষ্টায় সহযোগিতা করেছিলেন 'তাল্লপক্কম্ চিন্নায়া' ও 'পুরন্দর দাস'। তাল্লপকম্ চিন্নায়া দক্ষিণী ভজন বা কীর্তন-পদ্ধতির মাঝে নূতনত্ব এনেছিলেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নবীন বাগ ও ধাতুপ্রয়োগ। অন্ধ্রদেশীয় এই বিদ্বান ও তাঁর সম্প্রদায় ১৫শ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। কীর্তনে তিনি পল্লবী অনুপল্লবী ও চরণম্ নামক তিনটি ধাতুর প্রয়োগ করেন এবং 'কৃতি' নামটি তিনিই প্রথম ব্যবহারে আনেন।

পুরন্দর দাস কর্ণাট জাতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি সরলি, অলংকার ও গণেশগীতের প্রচলনকারী ছিলেন। কিন্তু এঁর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল পদম্-এর নব-রূপায়ণে ও মূল-প্রবন্ধ-রচনায। পদম্-এ ইনি সুরকে করলেন প্রধান, ভাষা হল বাহন। পরবর্তীকালে এই পদম্ থেকে 'কৃতি'র বিশিষ্টতা এল, জন্মাল নূতন রীতি।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চদশ শতকের কৃতি বা কীর্তন -রীতিতে প্রত্যক্ষ ছিল ভক্তিবাদের প্রভাব। এই ভক্তিবাদ উত্তর ভারতেও আলোড়ন তুলেছিল। জন্মেছিল বৈষ্ণব মতবাদ, সুফী মতবাদ, তাদের নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে। বৈষ্ণব, সুফী প্রত্যেকেই গানের মধ্য দিয়ে তাঁর ভক্তিকে প্রকাশ করতেন। সেই ভক্তিবাদ ভগবানকে চিন্তা করেছে নানারূপে— ভগবানকে পিতা করেছে, সাথী করেছে, স্বামী করেছে, পুত্র করেছে; জগতকে দেখেছে লীলাক্ষেত্ররূপে, মানুষকে দেখেছে লীলারূপে। সেই লীলায় মানুষ হয়েছে ভগবান বা ভগবানের মন্দির। এসেছে কতো মতবাদ— যার মধ্যে আছে রামানুজের **বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ**, নিম্বার্কের **দ্বৈতাদ্বৈতবাদ**, ইত্যাদি। তার পরেও এসেছে বল্লভাচার্যের **শুদ্ধাদ্বৈতবাদ** ও চৈতন্যদেবের **অচিন্ত্যভেদাভেদ**। সরল ও বোধগম্য গান-বাদ্য-নৃত্যের সহায়তায় এই সব তত্ত্ব মানুষকে টেনেছে ভগবানের দিকে, স্থূল জগতের অনিত্য শরীরের কামনা বাসনা নীচতাকে সরিয়ে মানুষের মনকে টেনেছে উচ্চতর চেতনার দিকে, সৃষ্টি-সৌন্দর্যের দিকে; ভগবানকে ভালোবেসে সে ভালোবাসতে শিখিয়েছে মানুষকে, জয়গান করতে শিখিয়েছে মানুষের অন্তরের সত্তাকে। সঙ্গীত এ স্থলে মোহকের কাজ করে নি, রঞ্জকের কাজ করে নি, করেছে মোহ-ছেদকের কাজ, শুদ্ধি-কারকের কাজ।

তত্ত্ব-প্রচারকারী বহুজনকেই আমরা জানি, কিন্তু যাঁরা এক-একটি 'পন্থা' সৃষ্টি করে গিয়েছেন তাঁদের অনন্যতায় তাঁদের মধ্যে আছেন কবীর, নানক, নরসিংহ মেহতা, সুরদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি; হরিদাস, রামানন্দ রায় প্রভৃতি; রৈদাস, মীরাবাঈ এবং আরো অনেকে।

কবীর

কবীরের জীবনী সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী বহু আখ্যায়িকা আছে, তার থেকে সত্য উদ্ধার করা খুব শক্ত। কবীরের উক্তি থেকে যা উদ্ধার করা যায়, তারই উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়াই বোধ হয় এ ক্ষেত্রে সমীচীন।

কবীর এক জায়গায় বলেছেন— পহিলে দরসন্থ মগহর পাইও পুনি কাসী বসে আঈ; অন্য জায়গায় নিজেকে "কোরী" বলে পরিচয় দিয়েছেন। আবার

একটি গানের মধ্যে স্বীকার করেছেন— দেখেঁ নহী মুখ মেরো মানিকে মলেছ মোকো। এর থেকে এইটুকু ধারণা করা যায় যে, কবীরের সঙ্গে 'মগহর' এবং 'কাশীর' যথেষ্ট যোগ ছিল; তিনি 'কোরী' জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং 'ম্লেচ্ছ' বলেই তাঁর পরিচয় ছিল। কোরীরা আগে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, পরে অনেকে মুসলমান হয়ে পড়ে; অবশ্য এমনিতেই তারা অস্পৃশ্য ছিল। আদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কবীর গোরখপুরের পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত মগহর নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কবীর-পন্থীরা বলেন যে, কবীর কাশীর নিকটবর্তী লহবতালার বা বেলহরপুখরে জন্মেছিলেন। তাঁর জন্ম-কাল নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। রামানন্দের শিষ্য, সিকন্দর লোদীর বন্দী, ইত্যাদি নানা কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করতে দিয়ে কেউ বলেছেন, কবীরের জন্ম-১৩৮০ খৃষ্টাব্দে, কেউ বা বলেছেন ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে। যাঁরা রামানন্দের শিষ্য তাঁরা বলেছেন ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ, আর যাঁরা সিকন্দর লোদীর সমসাময়িক বলতে চেয়েছেন তাঁরা ধরেছেন ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ।

আবার যাঁরা দুটি ঘটনাকেই মেলাতে চেয়েছেন, তাঁরা ১৩৮০ ধরে কবীরকে প্রায় দুশো বছর বাঁচিয়ে রেখেছেন। কবীর-পন্থীদের মতানুসারে কবীর জন্মে-ছিলেন ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রামানন্দের তিরোভাবের কাছাকাছি সময়ে। এই প্রকার মতানৈক্য দেখলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে কবীর দু জন ছিলেন, এক জন রামানন্দের সময়ে এবং অপর জন ১৫শ শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে; প্রথম কবীর রামভক্ত ছিলেন এবং নামের ভজনা করতেন গান গেয়ে, আর অপরজন ছিলেন সুফী প্রভৃতি প্রভাবিত যিনি মনুষ্যত্বের গুণগান করতেন, মানুষের ভিতরে যে ভগবান আছেন তাঁকে ডাকতে বলতেন। আমরা আগেই বলেছি যে, কবীর কোরী ছিলেন, কিন্তু অন্য মতে কবীর ছিলেন জোলা অর্থাৎ নিম্নজাতীয় তাঁতি— যাঁরা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। কবীরের একখানি গানের ভাব থেকে তাঁর জাতি সম্বন্ধে অনুমান করা হয়েছে। গানটি হল—

তু বাম্হন মৈ জাতি জুল্হা
সুনলে মেরা জ্ঞানা। ইত্যাদি

অথবা

ঝিনী ঝিনী বিনী চদরিয়া।
কাহেকা তানা কাহেকী ভরনী
কৌন তারসে বিনী চদরিয়া॥

কবীরের অন্যপ্রকার জন্মকথা পাওয়া যায় ভক্তমাল গ্রন্থে; কিন্তু মনে হয় কবীরকে হিন্দু প্রতিপন্ন করবার জন্যই এই কাহিনী সৃষ্ট হয়েছে। কাহিনীটি অনেকটা যিশুর জন্মকাহিনীর মতো, যার সঙ্গে রামানন্দের আশীর্বাদরূপ প্রাচীন-গন্ধী অলৌকিকত্ব জড়িয়ে আছে। বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে রামানন্দ বিবাহিত মনে করলেন এবং হঠাৎ অন্য কোনো আশীর্বাদ না করে, বিভ্রান্ত যমরাজার সাবিত্রীকে 'শতপুত্রের জননী হও' বলার মতো একটি অবাস্তব অসম্ভব কল্পনাকে অনুকরণ করে, 'পুত্রবতী হও' বলে আশীর্বাদ করে ফেল্লেন, এ কিংবদন্তী মানতে গেলে একটু অস্বস্তি বোধ হয়।

যাই হোক কবীরের পিতা ও মাতা, সে পালকই হন আর না-হন, ছিলেন নীরু ও নীমা। অবশ্য এই নামগুলি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

কবীরের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; তাঁর রচনার মধ্যে তিনি গুরুর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোথাও গুরুর নাম জানান নি। জনশ্রুতি আছে যে, রামানন্দ কবীরকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। যিনিই গুরু হন, কবীর গুরুর বাণীকে সার জেনেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মানুষকে তুলে ধরেছিলেন সকলের ঊর্দ্ধে আর সেই মানুষ ও ভগবানের মাঝখানের গড়া সব বাধাকে অস্বীকার ও অশ্রদ্ধা করবার জন্য বারবার করে বলেছিলেন—

জো খোদায় মসজিদ বসত হৈ
ঔর মুলুক কহিকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা॥

মোকো কহাঁ ঢুঁডো বন্দে
মৈ তো তেরে পাসমে।
না মৈ দেবল না মৈ মসজিদ
না কাবে কৈলাস সে॥ ইত্যাদি

ব্যাসজীই সর্বপ্রথম রামানন্দকে কবীরের গুরু বলে প্রচার করেন। পরে অবশ্য রামানন্দ-কবীরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অজানিত এবং অপ্রমাণিত তথ্য পরিবেশন করার ব্যাপারে প্রবন্ধও লিখিত হয়েছে।

জনশ্রুতি আছে যে, মন্দির ও মসজিদ সম্পর্কে উপরোক্ত প্রকার মতবাদ ব্যক্ত করার জন্য কবীরকে সিকন্দর লোদীর দরবারে অভিযুক্ত করা হয়। সিকন্দর লোদী সুলতান হন ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে; সুতরাং এ সময়ে কবীরের বয়স প্রায় একশ

বছর কিংবা পঞ্চাশ বছর। আগেই বলেছি, রামানন্দের শিষ্য প্রমাণ করিতে গিয়ে কবীরের জন্মকাল ১৪শ খৃষ্টাব্দে পিছিয়ে গিয়েছে, আর তা হলে সিকন্দর লোদীর বিচার করার গল্প টেঁকে না। মনে হয় ওই জনশ্রুতির পিছনে সত্য নেই। পঞ্চাশ বছর বয়স ভেবে নেবার ব্যাপারটা তৈরী করেছিলেন মিস্ আণ্ডারহিল নামে এক য়ুরোপীয় মহিলা— বোধ হয় সিকন্দর লোদীর সঙ্গে কবীরের দেখা করাবার পক্ষে যুক্তিযুক্ততার জন্য। অবশ্য, কোন্ মতটি সত্য তা বলা সম্ভব নয়।

কবীর বিবাহ করেছিলেন এবং শোনা যায় যে, তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ।

তিনি বহু কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন যা কবীর-পন্থীরা গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করেছিলেন। শিখধর্ম কবীরের মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল; আদি গ্রন্থে কবীরের বহু গান সংকলিত আছে।

জন্মকালের ন্যায় কবীরের মৃত্যুর কালনির্ণয় নিয়েও মতভেদ আছে। কোনো মতে কবীরের মৃত্যু হয়েছিল ১৪২০ খৃষ্টাব্দে, কোনো মতে ১৪৪০এ, কোনো মতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে।

গানের মধ্য দিয়ে কবীর নামগান, গুরুভক্তি, সংসার-বৈরাগ্য, জীবে প্রেম, ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ভেদজ্ঞান বিসর্জনের বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর গানের সঙ্গে রাগরাগিণী যুক্ত থাকতে দেখা যায়; কিন্তু গানগুলি বিশুদ্ধভাবে গাওয়া হত কি না তা জানা যায় না। সুতরাং কবীরের সরল ভাষা রাগসঙ্গীতযুক্ত হয়ে সাধারণ জনকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করত কি না তা বলা সম্ভব নয়, তবে উচ্চ দার্শনিকতার দিকে যে টানত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নানক

কবীরের ন্যায় নানকও গানের সাহায্যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। সে গানগুলি রাগরাগিণীকে আশ্রয় করেই আপন ভাব প্রকাশ করত। এখনও 'জগত মে ঝুঠী দেখী প্রীত' কিংবা 'কাহে রে বন খোজন আঈ' ধ্রুপদী, খ্যালীদের কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সংগীত হিসাবেই শোনা যায়। নানক লাহোরের নিকটবর্তী তলমণ্ডীতে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারো মতে গ্রামটির নাম কানাকুচা। নানকের পিতার নাম কালু ও মাতা ত্রিপতা। জাতিতে এঁরা ক্ষত্রিয় বলে জানা যায়। এঁদের উপাধি ছিল 'বেদী'। নানক অল্পবয়সেই সংস্কৃত, ফার্সী ও

অঙ্কে পারদর্শী হয়ে ওঠেন কিন্তু কিছুকাল পরেই এঁর সংসারে বিরাগ আসতে আরম্ভ করে। প্রথম যৌবনেই ইনি গৃহত্যাগ করে চলে যান এবং ভগ্নাপতির নিকট আশ্রয় নেন। সেখানে নানকের উদাসীন ভাব দেখে ভগ্নী তাঁর বিবাহ দিয়ে দেন। নানকের পত্নীর নাম কারো মতে 'চৌনী', কারো মতে 'সুলখনা'। কিছুকাল পরেই মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে নানক সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং ধর্মশিক্ষার জন্য নানা মত পর্যালোচনা করেন ও নানা দেশ পর্যটন করেন। কয়েক বছর পরে পঞ্জাবে ফিরে এসে তিনি কয়েকজন শিষ্যের কাছে তাঁর ধর্মমত প্রকাশ করেন— এই মতে গুরুকে প্রধান আসন দেওয়া হয়েছে এবং প্রচলিত ধর্ম বা জাতিভেদকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সবাই গুরুর শিষ্য বলে এর নাম হল শিষ্য-ধর্ম বা "শিখ-ধর্ম"। এই মতে সন্ন্যাসধর্মের প্রয়োজন নেই; সংসারে থেকে সৎগুরুর উপদেশ পালনই এই মতের মূল-কথা। ভগবৎ-চিন্তা, একাগ্রতা, যোগসাধনা, উদারতা, পারস্পরিক প্রীতি ছিল নানকের ধর্মের সার মর্ম। ভজন গানের মাধ্যমে তিনি এই ধর্মের প্রতি সাধারণকে আকর্ষণ করতেন। তাঁর কাছে যারা আসত তারা শিষ্য হয়ে আসত, তাদের সাজ-সজ্জা একরকম হত, কাজ-কর্ম ও নিয়মাবলী একরকম হত।

নানক নিজেও সংসারাশ্রমে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও দুই যুবক পুত্র শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস।

সত্তর বৎসর বয়সে নানক ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। এ সময়ে তিনি গুরুদাসপুর জেলার কর্ত্তারপুর নগরে বাস করছিলেন।

প্রথম দিকে যখন নানক সংসারাশ্রম ত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি জগৎ মিথ্যা, মায়া বলেই প্রচার করেছিলেন। কোন্ গুরু তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না; কিন্তু কোথায় যেন কবীরকে অনুসরণ করবার একটা স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে নানক লিখেছিলেন—

রাম সুমির, রাম সুমির,
যেহী তেরো কাজ হৈ।
মায়াকো সংগ ত্যাগ,
হরিজুকী সরণ লাগ।
জগত সুখ মান মিথ্যা,
ঝুঠো সব সাজ হৈ॥

পরবর্তীকালে নিজের মতবাদ সম্বন্ধে নানক লিখলেন—

সাধো, মনকা মান ত্যাগো।
কাম ক্রোধ সংগত দুর্জনকী
ইনতেঁ অহনিসি ভাগো॥
সুখ দুখ দোনহুঁ সখ করি জানৈ
ঔব মান-অপমানা
হরখ শোকতেঁ রহৈ অতীত
সে জন তত্ত্ব পছানা॥
অস্তুত নিন্দা দৌ ত্যাগৈ
খোজৈ পদনির্বাণা
জান নানক য়হ খেল কঠন হৈ
কোহু গুরু মুখ জানা॥

তামিল দেশ থেকে যখন ভক্তিবাদের স্রোত চতুর্দিকে প্রবহমান হল তখন উত্তরে যেমন বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যাকে ভাসালো, তেমনি ভাসালো বৃন্দাবন, মথুরাকে। অন্যদিকে তার ঢেউ পৌঁছল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, প্লাবিত হল মহারাষ্ট্র, আর গুজরাট। ১৪শ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে এলেন জ্ঞানেশ্বর, এলেন নামদেব; উড়িষ্যায় ১৫শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এলেন লক্ষ্মীধর, শেষ সময়ে এলেন পীতাম্বর; ঐ সময়ের আগেই গুজরাটে এলেন নরসিংহ মেহতা। ১৫শ শতকের শেষের দিকে বৃন্দাবনে পেলাম বল্লভাচার্যকে, হরিদাস স্বামীকে, গোবিন্দদাস, সুরদাস, নন্দদাস, প্রভৃতিকে; আসামে পেলাম শঙ্করদেবকে; আর বাংলায় চৈতন্যদেবকে। সে সময়ে উড়িষ্যায় আছেন প্রতাপরুদ্রদেব ও রামানন্দ রায়, বাংলায় আছেন রূপ, সনাতন ও নরহরি সরকার, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি।

জ্ঞানেশ্বর

জ্ঞানেশ্বর ১৩শ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধের মধ্যে পুনার নিকটস্থ আলন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং অভঙ্গ ইত্যাদি ভজনমূলক গীতের মাধ্যমে নামকীর্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। মহারাষ্ট্রে তাঁর ভক্তিমূলক গান এবং 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতার টীকা অতি জনপ্রিয়। অবশ্য এই নামকীর্তনে রাগ ও তালের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না, তবু সাধারণের উপর এর প্রভাব ছিল অসাধারণ। এই প্রভাব বৃদ্ধিতে নানাভাবে সহায়তা করেন নামদেব।

নামদেব

নামদেব ১২৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কারো মতে তাঁর জন্মস্থান দক্ষিণ-হায়দরাবাদের নরসীব্রাহ্মণী নামক গ্রাম। পিতার নাম 'দামা সেঠ' ও মাতার নাম 'গোণাঈ'। নামদেব অল্পবয়সেই বৈষ্ণবজনোচিত সকল গুণের অধিকারী হয়েছিলেন এবং পণ্ডরপুরের বিঠলজীর সেবায় আত্মনিবেদন করেছিলেন। নামগান, দাসভাবে সেবা এবং প্রেম এই তিনটি ছিল নামদেবের ভজনার বৈশিষ্ট্য। তৃণ হতেও দীন এই ছিল তাঁর মন্ত্র; পরের সেবাই ছিল তাঁর ধর্ম। পাণ্ডুরং-এর পায়ে তিনি সব বিসর্জন দিয়েছিলেন, নিজ মূর্তি পর্যন্ত সেখানে মন্দিরের সিঁড়ির নিচে স্থাপন করতে বলেছিলেন, যাতে প্রতিজনের পদধূলি তাঁর মাথায় পড়ে। নামদেব অভঙ্গ গানে আপনার মত প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর গানেই বলেছেন যে, ভগবানকে তিনি গান গেয়ে ডাকতে চান, আনন্দ দিতে চান, কারণ ভগবান গান ভালোবাসেন।

এঁদের পরেই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী রামানন্দ উত্তর ভারতে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে কাশীধামে এসে বসবাস করেন এবং হিন্দী শিক্ষা করে ঐ ভাষার মাধ্যমে ভক্তিবাদ প্রচার করতে থাকেন। যাঁরা তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন তার মধ্যে কবীরের কথা আগেই বলেছি। আর একজন শিষ্য যিনি কবীরের মতোই নিম্ন-জাতীয় ছিলেন এবং গানেই আপন মনের কথা ব্যক্ত করেছেন, মানুষকে পরম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, উৎকৃষ্ট ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেছেন, তাঁর নাম ছিল 'রৈদাস' যাঁকে আদি গ্রন্থে বলা হয়েছে 'রবিদাস'। 'রৈদাস' ১৪শ শতাব্দের শেষের দিকে জন্মেছিলেন— জন্মেছিলেন এক চর্মকারের ঘরে; দীক্ষা নিয়েছিলেন রামানন্দের কাছে, এবং রৈদাস-সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। রৈদাস কাশীতেই বসবাস করতেন কিন্তু তাঁর জন্ম, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। রৈদাসের গেয় পদগুলিতে রাগরাগিণীর সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু তার থেকে বড় কথা হল পদের ভাব—

অব কৈসে ছুটৈ নাম রট লাগী।
প্রভুজী তুম চন্দন হম পানী
জাকী অঙ্গ অঙ্গ বাস সমানী॥

প্রভুজী তুম ঘন বন হম মোরা
জৈসে চিতবত চন্দ চকোরা...
প্রভুজী তুম স্বামী হম দাসা
ঐসী ভগতি করৈ রৈদাসা ॥

এই রৈদাসের অনুকরণেই মীরাবাঈ দাস্যভাব অবলম্বন করেছিলেন। রৈদাস ও কবীরের কযেক বৎসব পরে গুজরাটে নরসিংহ মেহতার আবির্ভাব হয।

'নরসিংহ মেহতা' বা 'নরখি' ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে জুনাগডের কাছে তলজ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বল্লভাচার্যের অগ্রদূত বলে বর্ণনা করা হযেছে। অল্প-বয়সেই তাঁর মধ্যে গোপীভাব প্রবেশ করে এবং তিনি কৃষ্ণকে স্বামীরূপে আরাধনা করতে থাকেন। নরসি-লিখিত পদগুলি 'শৃঙ্গারমালা' নামক গ্রন্থে সংকলিত আছে। পদগুলির মধ্যে কৃষ্ণজন্ম, বাল্যলীলা ইত্যাদি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস -বর্ণিত প্রায় সব ক'টি খণ্ডই আছে, এমন-কি দানলীলাখণ্ডও আছে— অবশ্য নৌকাবিলাস খণ্ডটি নেই। অন্য দিকে সুদামা-চরিত্র ও সুরতসংগ্রাম নামে দুটি অসাধারণ লীলাত্মক কাহিনী আছে। নরসির পদগুলি বোধ হয় প্রথম অবস্থায কবিতার আকারে ছিল, যে জন্য তাঁর নাম ও পদের কথা আমরা মীরাবাঈয়ের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোথাও পাই না। হয়তো মীরাঈয়ের জন্যই নরসির পদের প্রচার হয় এবং গান হিসাবে পরিবেশিত হতে থাকে। এখনও নরসির নাম খুব অল্পলোকেই জানেন। নরসির পদে তাঁর গান গাইবার, বাদ্য বাজাবার ও নাচবার কথা আছে, কিন্তু তিনি কোন্‌টির কতটুকু জানতেন বা কোথায এ সব শিক্ষা করেছিলেন তার প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। নরসি অন্যান্য গানও লিখেছিলেন যা উপদেশমূলক বা ধর্মমূলক, কিন্তু সেই গানগুলি অন্য কোনো নরসির কি না বোঝা যায় না। কারণ ভাষা সেই গুজরাটীই। মীরাবাঈ একজন নরসির নাম উল্লেখ করেছেন ; তিনি কে তাও জানা যায় না। আধুনিক পণ্ডিতরা যা হিসাব দিচ্ছেন তাতে নরসি চৈতন্যের পরবর্তী হয়ে যান, না হলে মীরার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হয় না ; আবার অন্য দিক দিয়ে হুমায়ুন আকবরের সমকালীন হতে গেলে সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে বহু গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব সন্ত প্রভৃতির জীবনী এত বেশী অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে তার সত্যতা যাচাই করতে গেলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। এক-একজনের জন্ম তারিখে যদি একশ-দেড়শ বছরের ব্যবধানকে নিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের অমানুষিক চেষ্টা করতে হয়, তা হলে ইতিহাসের দিক থেকে তার মূল্য শূন্যের কোঠায় দাঁড়ায় না কী ?

উড়িষ্যায় এই সময়ে যাঁদের পাই তাঁরা লক্ষ্মীধর বালুকেশ্বর প্রভৃতি বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁদেব সাঙ্গীতিক দান ব'লে কিছুই আমরা পাই নি।

১৫শ শতকের শেষের দিকে এসে আসামে আমরা পেলাম দু জন-ভক্তিবাদীকে যাঁরা চৈতন্যদেবের কিছু পূর্বের বা সমসাময়িক; একজন হলেন শঙ্কবদেব, অপবজন মাধবদেব।

শঙ্করদেব

শঙ্কবদেব ১৪৭০ খৃষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে আসামে শিরোমণি ভুঁইয়া চণ্ডীবব বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতাব নাম কুসুম্বর ভুঁইয়া, মাতা খেরসুতী, প্রথম জীবনে ইনি সাধারণ জনের মতোই সংসারধর্ম পালন করেছিলেন, কিন্তু পববর্তীকালে রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণব হয়ে যান। নানকের মতো সংসাবে থেকে অথচ সংসার-বাসনায় জড়িয়ে না পড়ে তিনি ধর্মপালন কবতেন। নিবাসক্ত শঙ্কবদেব দাস্যভাবেই কৃষ্ণের সাধনা করতে লাগলেন। তাঁব কাজের মধ্যে হল 'নামঘর' ও 'নাম-ঘোষা' প্রবর্তন। প্রচলন করলেন তিনি 'একশবণ নামধম'। কবীবেব মতো নাম, গুরু ও ভক্তিব উপরই তিনি সাধনাকে স্থাপন করেছিলেন। এই কারণে অনেকে বলে থাকেন যে, শঙ্কবদেবের সঙ্গে কবীবেব সাক্ষাৎ ও মিত্রতা হযেছিল। কিন্তু সময়ের হিসাবে সে অনুমান অপ্রমাণিত হয়ে যায়।

শঙ্করদেব 'ভক্তিরত্নাবলী' 'কালীযদমন' ইত্যাদি নাটক, 'সঙ্গীতপারিজাত,' 'বড়গীত' ইত্যাদি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। 'বড়গীত' শঙ্করদেবেরই সৃষ্টি। প্রধানত বিদ্যাপতির অনুকরণে মিশ্র মৈথিল ভাষাতেই এই গান তিনি রচনা করেছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গীত এই অর্থেই বড়গীত নাম দিয়েছিলেন, যে গীতে রাগরাগিণীর ব্যবহারহেতু উচ্চাঙ্গরূপ প্রকাশিত হযেছিল। শঙ্করদেব এই গীতগুলিতে বেলাবল, কর্ণাট, কেদার, গৌরী, শ্যাম, আশাবরী, সুহৈ ইত্যাদি রাগ সংযোজিত করেছিলেন। এই সব রাগ কিছুকাল আগেও যে সুরে গাওয়া হত, তার রূপ থেকে কর্ণাটক পদ্ধতির সঙ্গে মিলের প্রকৃষ্ট আভাস পাওয়া যেত। বাংলা ও আসাম এবং উড়িষ্যা যে আন্ধ্র ইত্যাদি দক্ষিণী পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং সে প্রভাব যে ১৫শ শতকেও সমভাবে প্রবল ছিল তার প্রমাণ বহন করেছে বড়গীত (বরগীত)।

অনেকেই বলে থাকেন যে পূর্বদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারে শঙ্করদেবই

অগ্রগণ্য ছিলেন এবং তিনি দেবভাবকেই প্রকাশ করেছিলেন। অপর দিকে চৈতন্যদেব নরভাবের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেবত্বে উন্নীত করেছিলেন। সুতরাং উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। কোনো কোনো মতে শঙ্করদেব অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ছিলেন বলে যা প্রচারিত হয় উপরোক্ত পার্থক্য দেখলেই তা কল্পিত বলে ধরে নেওয়া চলে। তিনি বাংলায় এসেছিলেন বলে অনেকেই বলে থাকেন, কিন্তু তা হলেও অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য হয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। শঙ্করদেব ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেহত্যাগ করেন।

মাধবদেব

মাধবদেব শঙ্করদেবের শিষ্য। তিনি ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। কোনো মতে মাধবদেব নারায়ণপুরে জন্মেছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল গোবিন্দ। তিনি অসমীয়া, মৈথিলী (অপভ্রষ্ট) ও সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন এবং বহুপ্রকার ঝুমুর, নামমালিকা, গোবর্ধনযাত্রা ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বহু বড়গীতও মাধবদেবের রচনাতে পাওয়া যায়।

তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন এবং বড়গীতের সহায়তায়, সহজবোধ্য ভাষায় ভগবৎকীর্তন জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন (বড়গীত-এর বানান বরগীত রূপে অনেক স্থলে দেখা যায়)।

শঙ্করদেব-রচিত একটি বড়গীতের উদাহরণ—

চিন্তিত গোপিনী-পেখিয়া নৈরাশা
লম্বিত আনন ফুকারে নিশ্বাসা।
তনুমন যামরে নয়ন জুরে বারি
পদনখ ক্ষিতিলেখু দেখু আন্ধিয়ারী ॥
কুচ দোহো কুঙ্কুম লেপিট লোলে
তাপিত ব্রজবঁধু শঙ্করে বোলে ॥

গানটির রাগ বেলোয়ার অর্থাৎ বেলাবল এবং তার রূপ দক্ষিণীদের মতানুযায়ীই, যা কালক্রমে রূপ বদলেছে— অর্থাৎ গা ও নি বিকৃতিযুক্ত মূর্ছনা হয়েছে॥ বড়গীত ইত্যাদির প্রাচীন সুর ও তাল পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন হয়েছে গীতগোবিন্দ পদের, কবীরের ভজন ইত্যাদি গানের। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কীর্তনগায়ক সম্প্রদায়, ভজনগায়ক সম্প্রদায় বর্তমান থাকতেও এই পরিবর্তনগুলি রোধ করা গেল না বা পরিবর্তন-পূর্ব রূপ লিপিবদ্ধ রইল না। আরও

দুঃখের কথা, কবীর নানক প্রভৃতির শিষ্যসম্প্রদায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনেকে নিজে নিজে ভজনের সুর দেন। তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিষ্য সম্প্রদায়ের কাছে প্রকৃত সুর কি পাওয়া যায় না?

মীরাবাঈ-এর গান সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। রাজপুতনার বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের ইতিহাসে মীরাবাঈ-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখনীয়। কিন্তু মীরাবাঈ-এর জীবন-ইতিহাস রহস্যময়!

মীরাবাঈ

'টড্'-এর ইতিহাস অনুযায়ী মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের পত্নী। তিনি ১৪২০ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন; তাঁর পিতা ছিলেন মেরতার রতন সিং। এই মতে মীরাবাঈয়ের মৃত্যু হয়েছিল ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৬ বৎসর বয়সে। অন্য মতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে মীরাবাঈ দেহত্যাগ করেন। এই মীরাবাঈ আপনাকে রৈদাসের শিষ্যা বলে অভিহিত করেছেন।

আধুনিক মতে, মীরাবাঈ রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র ভোজের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে, বিবাহ হয়েছিল ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে; এবং স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে। সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর এক পুত্র রতন সিং রাণা হন। কিন্তু ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁরও মৃত্যু ঘটে ও বিক্রমজিৎ রাজসিংহাসনে বসেন। মীরাবাঈয়ের ধর্মমতের সঙ্গে রাণার মতের মিল না হওয়ায় মীরাবাঈ সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান এবং সেইখানে শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। কিছুকাল পরে তিনি দ্বারকায় যান এবং রণছোড়জির সাধন-ভজন শুরু করেন। সেই স্থানেই ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর দেহাবসান হয়। অন্যমতে, ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজের মৃত্যু হয়; মীরা পাঁচ-ছয় বছর পর বৃন্দাবনে চলে যান এবং সেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে গুজরাটে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। শেষ জীবন গুজরাটেই কাটে। আরেক মতে, জন্মকাল ১৫০২ খৃষ্টাব্দ (যখন অন্য কেউ কেউ বলছেন ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ) আর মৃত্যুকাল ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ। মীরার অন্যান্য বিবরণের ব্যাপারে মোটামুটি সকলের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়— মীরার সেই গিরিধর গোপালের পূজা, স্বামী ব'লে বরণ করা, মেবারের বধূ হয়েও নাচগান করা, এবং শেষ পর্যন্ত রাণার হাত থেকে বিষ পান করা ও একদিন বৃন্দাবন চলে যাওয়া। এর পরেই কিন্তু যত গণ্ডগোল। মীরা নিজে বলেছেন "গুরু মিলিয়া রৈদাসজী"; আর এই রৈদাস কবীরের সমসাময়িক; সুতরাং মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের

সময়ে বর্তমান না থাকলে রৈদাসের শিষ্য হতে পারেন না। আবার ভক্তমাল গ্রন্থে আছে যে, মীরার সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, কারো মতে এই সাক্ষাৎ হয় রূপ গোস্বামীর সঙ্গে ; সে কাহিনী সত্য বলে প্রমাণ করতে গেলে মীরাবাঈকে ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান থাকতে হয়। কিন্তু তাতেও কুলোয় না ; আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জনশ্রুতি সপ্রমাণ করবার জন্য মীরাবাঈকে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবন ধারণ করতে হয়।

এত ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে যে, শুধু কিংবদন্তীগুলিকে খাড়া রাখবার জন্যই মীরাবাঈয়ের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে এত হাঙ্গামা করতে হযেছে। প্রকৃতপক্ষে মীরার কোনো জীবনকাহিনী জানা ছিল না। বোঝা যাচ্ছে মীরাবাঈয়ের পদগুলি যখন প্রচারিত হল তখন মীরা মৃত, তাই তাঁর গানের ভাষার মধ্য থেকে তাঁকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু মুশ্‌কিল হল ভাষার সমাধান নিযে, ভাব নিয়ে ও বক্তব্য নিয়ে। ভাষা পাওয়া গেল রাজস্থানী, গুজরাটী ও বৃজ ভাষা বা মিশ্র। ভাব প্রকাশিত হল ভক্তির, প্রেমের, উপদেশের ও গুরুমহিমা-কীর্তনের ; আর বক্তব্যের মধ্যে হঠাৎ দেখা দিল রাণার বিষ পাঠানোর কথা, বিষ অমৃত হয়ে যাওয়ার কথা। এতগুলি ভাষা দেখে স্থির করতে হল যে, মীরাবাঈ রাজস্থানে ছিলেন, গুজরাটে গিয়েছিলেন এবং বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। এমন-কি একটি গানে চৈতন্যদেবের নাম নিয়েছিলেন এটাও অনুমান করা হল। গানটি হচ্ছে—

অব তো হরী নাম লৌ লাগী…
শ্যাম কিসোর ভয়ো নবগৌরা
চৈতন্য জাকো নাঁর ॥
পীতাম্বর কো ভাব দিখাবৈ কটি কৌপীন কসৈ
গৌর কৃষ্ণকী দাসী মীরা, রসনা কৃষ্ণ বসৈ ॥

শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রমাণের জন্যই বৃজ ভাষায় এই গান লিখতে হল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ মীরাবাঈয়ের পক্ষে চৈতন্যদেবকে শ্রীহরি বলে মেনে নেওয়া ১৫৩০-৪১ খৃষ্টাব্দে কী করে সম্ভব হল? বৃন্দাবনে কি তখন চৈতন্যদেবকে সকলে শ্রীকৃষ্ণ বলে মেনেছেন? মীরাবাঈয়ের একটি গানে "বাঁকেবিহারীর" নাম আছে। গানটি হল—

হমরো প্রণাম বাঁকেবিহারীকো।
মোর মুগট মাথে তিলক বিরাজৈ
কুণ্ডল অলকা কারীকো ॥…

য়হ ছবি দেখ মগন ভঈ মীরা
মোঁহন গিরবরধারীকো ॥

"বাঁকেবিহারী" হরিদাস স্বামীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। মীরাবাঈ ঐ বিগ্রহও সমসময়ে দেখেছেন; সে ক্ষেত্রে বাঁকেবিহারীর সঙ্গে চৈতন্যদেবকে এক আসনে বসানো কি মীরাবাঈয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল যখন তিনি হরিদাস স্বামীকেও দেখছেন? তা ছাড়া, বৃন্দাবনের অন্য বিগ্রহের কথা তিনি বলেন নি, অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, হরিদাস স্বামীর উপাসনা-পদ্ধতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। সে ক্ষেত্রে এইটুকুই বরঞ্চ বেশী স্বাভাবিক যে, মীরাবাঈ চৈতন্য সম্প্রদায়ের ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারকে আলৌকিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই পরবর্তীকালের কোনো বৈষ্ণব চৈতন্যদেবের প্রশস্তি গেয়েছিলেন বলে সন্দেহ জাগে, অবশ্য মীরার নাম ব্যবহার করে।

মীরাবাঈ যে ১৬শ শতাব্দে বর্তমান ছিলেন এবং ভক্তমাল ইত্যাদি গ্রন্থে যে সত্য কথা লিখিত হয়েছে প্রমাণ করবার জন্য ঐ গানগুলির প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিকে দেখা যায়, মীরা রামনাম উচ্চারণ করছেন যাতে গিরিধরের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ এই গিরিধর তাঁর বাল্যের বিগ্রহ, তাঁর পূর্বজন্মের স্বামী, তাঁর ইহজন্মের সাথী। এ গানটি লক্ষণীয়—

রাম মিলণ রো ঘণো উমারো
নিত উঠ জোউঁ বাটরিয়াঁ।...
লগী লগন ছুটণকী নাঁহী
অব কিঁউ কীজৈ আঁটড়িয়াঁ।
মীরাকে প্রভু কব রে মিলোগে
পূরো মনকী আসড়িয়াঁ॥

দেখলেই বোঝা যায় মীরাবাঈয়ের ধর্মজীবনে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন এসেছিল যখন গিরিধরের পাশে এসে রামনাম নিজ স্থান করে নিল। তার পরেই দুটি নাম একসঙ্গে মিলে যাচ্ছে; তখনকার গান হল—

রাম নাম রস পীজৈ মনুআঁ
রামনাম রস পীজৈ।...
মীরাকে প্রভু গিরধরনাগর
তাহিকে রঙ্গমে ভিজৈ॥

এই রামনামের সঙ্গে সম্পর্কিত রামানন্দ-সম্প্রদায়ের রৈদাসকে মীরাবাঈ

গুরুর আসনে বসিয়েছেন। যদি বলা যায় এ রৈদাস পরবর্তীকালের (যা কোনো কোনো পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেয়েছেন), তা হলে মীরাবাঈয়ের আর-একটি গানের দিকে দৃষ্টি দেব ; তাতে দেখব যে, রামানন্দের অন্যান্য শিষ্যদের সম্বন্ধেও মীরা কী রকম ভক্তিমতী। গানটি হল—

ভজ লে রে মন গোপাল গুনা।
অধম তরে অধিকার ভজনসু
জোই আযে হরি সরনা ॥···
গজ অরু গীধহু তরে ভজনসূঁ
কোউ তর্য়ো ন'হী ভজন বিনা
ধনা ভগত **পীপা** মুনি সিওরী
মীরা কীহু করো গণনা ॥

১৬শ শতকের মীরা আর কারও নাম করলেন না! অথচ শুধু রৈদাস, ধনা ও পীপার নাম করলেন— ইতিহাসের দিক দিয়ে নিশ্চয়ই এর কোনো সার্থকতা আছে।

আর একটি কথা, মীরাবাঈ নরসিজী-কী-মায়রা লিখে নরসি মেহতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন। কোনো কোনো মতে নরসিজীই মীরার প্রকৃত মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন, রৈদাসকে মীরাবাঈ গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেছেন যে, মীরার ভক্তির মধ্যে 'পতিভাব' প্রবল ছিল, যা নরসির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত ; নরসি আপনাকে গোপীরূপে ভেবেছেন, মীরাবাঈ আপনাকে ভেবেছেন স্ত্রীরূপে। এইখানে কিন্তু দুজনের দৃষ্টির পার্থক্য রয়েছে।

সব দিক বিচার করে আমরা এই সমাধানে পৌঁছতে পারি যে, রাণা কুম্ভের সময়ের মীরাবাঈ হচ্ছেন প্রকৃত মীরাবাঈ। টড্-এর ইতিহাস বিশ্বাস করছি, সংগ্রাম সিংহের পুত্রদের কাহিনী বিশ্বাস করছি, তা হলে রাণা কুম্ভের কাহিনী বিশ্বাস করতে সংকোচ কেন? সংগ্রামের পুত্র ভোজ অল্প বয়সে মারা যান, আমাদের গল্পের সত্যতার জন্য তাঁকে অন্তত পঁচিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করতে হয় এবং ত্রিশ-একত্রিশ বছরে সংসার থেকে বিদায় নিতেও হয়, অথচ টড্ কোথাও তাঁর বিবাহের একটা সংবাদ উল্লেখ করেন নি। আশ্চর্যজনক ব্যাপার! রাণা সংগ্রাম যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে, দেহরক্ষা করলেন ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে। তখন উদয় সিংহের বয়স কত? ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন বিক্রমজিৎ রাণা হলেন তখন বয়স কত? শিশু যাকে কোলে করে নিয়ে যাওয়া যায় এমন অবস্থায় থাকলে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, তখন প্রতাপসিং কতটুকু ইত্যাদি জানতে

হলে আশ্চর্যজনক হিসাবের প্যাঁচে পড়তে হয়। এই হিসাবগুলি যদি আমরা মানতে পারি এবং এত খুঁটিনাটি খবর যদি টড্ সংগ্রহ করতে পারেন তা হলে রাণা সংগ্রামের পুত্রবধূর সংবাদটা পান নি এটা বিশ্বাস করা যায় কি করে? এটি একটি বড প্রশ্ন। আবার অন্য দিক ভাবলে আর-এক প্রশ্ন জাগে: রাণা কুম্ভ যদি মীরাকে বিবাহ করে থাকেন, সে বিবাহ কি একপত্নীক বিবাহ ছিল, যা চরিতকাররা বোঝাতে চেয়েছেন? আমরা জানি তা সম্ভব নয়, কারণ কুম্ভের দুই পুত্র ও এক কন্যার সংবাদ আমরা পাই। অপরে বলেছেন মীরার ভজন গান শুনে রাণা তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। তা হলে তো তাঁর কোনো কালেই রাগ বা সন্দেহ করা উচিত নয়; তা ছাড়া রাণা নিজেই বৈষ্ণব ছিলেন, মীরার সংস্পর্শে হন নি; তাঁর কার্য-কলাপের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। তিনি গীতগোবিন্দের টীকা লিখেছিলেন, কৃষ্ণের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন।

এর পরে বিষের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা যাক:

১) পিয়াজী স্থাবে নৈণাঁ আগে
রহজ্যো জী।··
ভৌ সাগরমে বহী জাত হু
বেগ ম্হারী সুধ লীজ্যো জী।
রাণাজী ভেজ্যা বিখকা প্যালা
সো অমৃত কর দীজ্যো জী।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
মিল বিছুড়ন মত কীজ্যো জী॥

২) সীসোদিও রুঠ্যো তোম্হারে কাঁইকরলেসী
ম্হে তো গুণ গোবিন্দকা গাস্যাঁ হোমাঈ।
রাণোজী রুঠ্যো বারো দেখ রখাসী
হরি রুঠ্যাঁ কিঠে জাস্যাঁ হো মাঈ॥ ইত্যাদি

৩) তেরি কোঈ নহি রোকণহার
মগন হোই মীরা চলী।
লাজ সরম কুলকী মরজাদা
রিসসৈঁ দূর করী॥···
সেজ সুখমণা মীরা সোহৈ
শুভ হৈ আজ ঘরী

তুম জাও রাণা ঘর অপণে
মেরী থাঁরী নাহিঁ সরী ॥

৪) রাণাজী থে ক্যাঁনে রাখো ম্হাস্থ বৈর…
কাজল টীকী রাণা হম সব ত্যাগ্যা
ভগ্‌বী চাদর পহর
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
অমৃত কর দিয়োজহর,

৫) মৈ গোবিন্দ গুণ গাণা
রাজা রুঠৈ নগরী রাখৈ হরি রুঠ্যাঁ কহঁ জাণা।
রাণা ভেজ্যা জহর পিয়ালা
অমৃত করি পী জাণা ॥…
মীরা তো অব প্রেম দিবানী
সাঁবলিয়া বর পাণা ॥

২য় গানটি দেখলে সন্দেহ জাগবে রাণার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে। মীরা বলছেন, 'রাণা রাগ করলে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে, কিন্তু হরি ক্রুদ্ধ হলে কোথায় যাবো?' কথাগুলি যেন বলে দেয় যে মীরাবাঈ কবীরের মতো কোনো হরিভক্তি প্রচারকারিণী যাঁকে রাণা সহ্য করতে পারছেন না।

৩য় গানে মীরা কুলের মর্যাদার দাম দিচ্ছেন না, নামকীর্তন করছেন, রাণার বারণ শুনছেন না।

১ম, ৪র্থ ও ৫ম গানে রাণা বিষ দিচ্ছেন। মীরা বলছেন যে, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য ও অলংকার ত্যাগ করেছেন আর গিরিধর বিষকে অমৃত করে দিয়েছেন। তারপরে সাপ দংশন করতে আসলে তাকে শালগ্রাম শিলায় পরিবর্তিত করেছেন। মীরার কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি অলংকারাদি ধারণ করার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু করেন নি; অতএব তিনি বিধবা ছিলেন না। কাজেই ভোজের বিধবা পত্নী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, সাধারণ অর্থ করলে বিষ বলতে রাণার প্রেরিত বিষ বোঝাবে, কিন্তু বিষ অন্য অর্থে সংসার-প্রবেশ-রূপ বিষ, সংসারের কুটিলতা -রূপ বিষ হতে পারে। যেমন সর্প বলতে মোহবন্ধন হতে পারে। তৃতীয়ত, রাণা বিষ পাঠালেন আর মীরা গান গেয়ে উঠলেন এবং সে গান মীরাই নিজের মহিমা প্রচারের জন্য চতুর্দিকে গেয়ে বেড়ালেন, মীরার এইরূপ মানসিক অবস্থা কল্পনা করা একটু কষ্টকর। এর চেয়ে বোধ হয় অনেক ভালো হয়, যদি

আমরা ভাবি যে মীরা রাজবংশীয় ছিলেন। কিন্তু শিশোদীয় বংশের আজ্ঞা পালন করে তিনি গৃহস্থবধূ হতে চান নি এবং সংসারের প্রলোভনকে বিষ ও সর্প বলে অভিহিত করে গোবিন্দ-ভজনা ও গোবিন্দ-নামকীর্তন করে বেড়িয়েছেন। ঘরেই তিনি থেকেছেন, তাই মীরা-পন্থী কিছুর স্থষ্টি হয নি এবং তাঁর গান বহুকাল পরে রাজস্থানে, গুজরাটে প্রচারিত হয়েছে। কবীর, রৈদাস, প্রভৃতির ভক্তিগাথার প্রচারের ফলে মীরার পদ চাপা পড়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, একই প্রকৃতির পদ অনেকবার লেখা দেখে মনে হয় মীরার কিছু গান পরবর্তীকালে অন্য কোনো লেখক রচনা করে দিয়েছেন। একদিকে বৈদাস প্রভৃতি অন্যদিকে চৈতন্য প্রভৃতির নামযুক্ত পদ দেখলেও ঐ একই অনুমান জন্মায়।

সত্য কথা বলতে কি, রাণা কুম্ভের সময়ের মীরাকে আমরা শেষোক্ত যুক্তি দিয়ে ভালো ভাবে মেনে নিতে পারি, আর চৈতন্যের সমসাময়িক মীরাকে মানতে হলে দ্বিতীয় মীরার সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয়। তবে শেষোক্ত মীরা পরবর্তীকালের কাল্পনিক স্থষ্টি বললে বোধ হয় দোষ হয় না। যাই হোক, মীরা 'নরসিজী-কী-মায়রা' 'গীতগোবিন্দ টীকা' 'রাগ গোবিন্দ' ও 'রাগ সোরটের পদ', এই চারখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মীরার গানে রাগরাগিণীর নির্দেশ পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে রাজপুতানা ও গুজরাটের লোকগীতের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

মীরাবাঈয়ের পতিভাবে পূজা চৈতন্যমতে প্রভাবিত বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু হরিদাসী বা বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় ঐ ভাব গ্রহণ করেন নি; অর্থাৎ বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যখন বাংলার বৈষ্ণবগণ প্রেমকে করেছিলেন মুখ্য।

মথুরা-বৃন্দাবনে ভক্তিবাদের যে গান গাওয়া হত তার দুটি রূপ ছিল: বিষ্ণুপদ বা কীর্তন, এবং ভজন। বিষ্ণুপদে চার থেকে আট চরণ পর্যন্ত পাওয়া যেত, এবং এর গানরীতি আধুনিক ধ্রুপদরীতির মতোই ছিল, অর্থাৎ ধ্রুব প্রবন্ধের যে স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, সেই পরিবর্তনকে বিষ্ণুপদে প্রকাশ করা হত। সুতরাং পদের ছন্দই এখানে প্রধান ছিল, তাল সেই ছন্দকে মেনে চলত। যাই হোক, ধ্রুব প্রবন্ধের প্রকার হলেও বিষ্ণুপদের নাম তখনও কীর্তনই ছিল, ধ্রুপদ নামে সে অভিহিত হয় নি বলেই অনুমিত হয়। রাজা মানের ধ্রুপদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পরবর্তীকালে ধ্রুপদের মাঝে তা বিলীন হয়। ভজন ছিল লোকগীত, তার তাল ও সুর ছিল সরল। ভজনকে হয়তো ঐ সময়ে বিষ্ণুপদের অন্তর্ভুক্ত করা হত, কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ে অষ্টছাপের প্রত্যেকেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরদাস, গোবিন্দস্বামী ও পরমানন্দ দাস। বল্লভাচার্য পুত্র বিঠ্ঠলনাথ এবং আটজন শিষ্য, এঁরা প্রত্যেকেই গেয়পদ রচনা করেছেন যা আজও গাওয়া হয়ে থাকে।

বল্লভাচার্য ভগবানকে বাৎসল্য-ভাব নিয়ে কামনা ও ভজনা করেছেন। তাঁর অষ্টছাপেও এই বাৎসল্য-ভাবটিই প্রধান ছিল, তাই সকলের গানে এই ভাবটি বেশী পাওযা যায়, যদিও শৃঙ্গার ইত্যাদি ভাবেব রচনার অপ্রতুলতা নেই।

সঙ্গীত প্রসঙ্গে আমরা এই অষ্টছাপের তিনজনকে স্রষ্টারূপে পাই। সুতরাং তাঁদের বিবরণই শুধু জানাচ্ছি।

সুরদাস

সুরদাস নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। কেউ সুর নামে, কেউ-বা সুরদাস নামে, কিংবা সুরশ্যাম অথবা সুরদাস মদনমোহন নামে আপনার পরিচয় দিযেছেন, কিন্তু কোথাও আপন পরিচয রেখে যান নি। বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের সুরদাস শ্রীনাথজীর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর গানে শ্রীনাথজীর নাম পাওয়া যায় না। কাজেই পদগুলি কোন্ সুরদাসের তা বোঝা শক্ত। 'সুরসাগর' 'সুরসারাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু সেই গ্রন্থে কী প্রকার প্রক্ষেপ পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তা না জানলে গ্রন্থগুলি আমাদের খুব কাজে আসে না।

সুরদাস ১৪৭৮ বা ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর কাছে সীহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও মাতার নাম জানা যায় না। অল্প বযসেই ইনি গৃহত্যাগ করেন ও ঘুরতে ঘুরতে মথুরায় পৌঁছান। সেখান থেকে কিছুদিন বাদে গোঘাট নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এই স্থানেই তিনি সুরসাগরের পদ রচনা করে কীর্তন গান করতেন। সুরদাস কার কাছে গান শিখেছিলেন সে বিবরণ আমরা পাই না, তবু দেখি, তাঁর প্রতিটি গানের পদে রাগের নাম দেওয়া রয়েছে। গোঘাটে থাকাকালে বল্লভাচার্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং সুরদাস অষ্টছাপের একজন প্রধান বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন। সুরদাস এই সময়ে বৃন্দাবনসমীপস্থ গোবর্ধনের নিকটে পরসোলীতে বাস করতে থাকেন। তাঁর সুরসাগর গ্রন্থ এখানেই সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থের কতকগুলি রচনা বিষ্ণুপদ, এবং অন্যগুলি লোকগীতের অনুসরণে সৃষ্ট ভজন। তা ছাড়া আর কয়েকটি পদ আছে যা ধ্রুবপদ্ধতির।

সুরদাস কৃষ্ণলীলার পদ লিখেছেন, যার মধ্যে নৃত্যসম্বলিত রাসলীলাবিষয়ক পদ আছে। বৃন্দাবনে ঐ সময়ে যে ঝুমুর চাচর প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের সংস্কার সাধনে সুরদাস যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এই সহায়তা বা সহযোগিতার জন্যই বোধ হয় ঐ সময়ে অপরাপর সঙ্গীতজ্ঞদের প্রচেষ্টায় উন্নত প্রকৃতির ধমারের উদ্ভব হয়। শোনা যায়, সুরদাস ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। প্রবাদ আছে, অকবর সুরদাসের সঙ্গে, হরিদাস স্বামীর সঙ্গে ও কুম্ভনদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই প্রবাদ বিশ্বাস করা কঠিন। বোধ হয়, আজমীরে সুফীসন্তদের সঙ্গে বৎসরে একবার করে অকবরের সাক্ষাৎকারের কাহিনীকে বৃন্দাবন পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছে। সুরদাসের সাঙ্গীতিক অবদান সম্বন্ধে আর একটি কাহিনীর সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন।

প্রবাদ আছে, সুরদাস নাকি নূতন রাগরূপ সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের ধারণা, কাহিনীকারেরা এঁকে নাযক রামদাসের পুত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। সুরদাসের পদে সেই সময়ে ব্যবহৃত ও প্রচলিত রাগগুলিরই নাম পাওয়া যায়, কোথাও নূতনত্ব দেখাবার চেষ্টা মাত্র তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁর রাগগুলির মধ্যে পটমঞ্জরীই নেই। অথচ সুরদাসকী-পটমঞ্জরী একটি প্রসিদ্ধ রাগরূপ। সুরদাস একটি গানে ছত্রিশটি রাগনাম প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে ইমন আছে, নায়কী আছে, জয়জয়বন্তী আছে, আড়ানা আছে; আবার সেই সঙ্গে সাবন্ত সুঘরাই প্রভাতী আছে— যাদের জন্মসময় নিয়ে মতভেদ নিতান্তই স্বাভাবিক। উক্ত গানটি সুরদাসের কি না তা বলা শক্ত। তা ছাড়া, অন্যান্য গানেও আমরা হটীলী, হোরী, মুলতানী-ধনাশ্রী, মারু ইত্যাদি রাগনাম পাই। যদি এ রাগগুলি সত্যই সুরদাসের সময় জন্মে থাকে তা হলে রাগরাগিণী-পদ্ধতির বহু গ্রন্থকার ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে অনায়াসে পেছিয়ে যেতে পারবেন। ধরুন সুঘরাই: অবুল ফজল বলেছেন, অকবর বাদশা কুড়াই রাগটিকে সুঘরাই নামে পরিবর্তিত করেছিলেন। যদি সুরদাসের সময়ে সুঘরাই থেকে থাকে তা হলে অবুল ফজলের কথা মিথ্যে হয়ে যায়। অথবা ভেবে নিতে হয় যে, পরবর্তীকালের কোনো গায়ক সুরদাসের কবিতায় সুর বসিয়েছিলেন।

সুরদাস অন্ধ ছিলেন কিনা বলতে পারি না, যদিও গ্রন্থকারদের মতে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি যে ভাবে বর্ণ-অলংকারাদির বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাঁর অন্ধত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। বোধ হয়, নিম্নোক্ত প্রকার গানই তাঁকে অন্ধ বলে পরিচিত করিয়েছে—

নাথ মোহিঁ অবকীবের উবারো।...
করমহীন জনমকো অন্ধ
মোতে কৌন নকারো॥...

এই "জনমকো অন্ধ" কথাটিই সব গণ্ডগোলের মূল; অথচ সঙ্গেই আছে, অন্ধ বলেই "মোতে কৌন নকারো"। তা ছাড়া, পরের পদগুলিও ঐ অন্ধ শব্দের মানে বদলে দেয়, যেমন—

পতিতনকে ইক নায়ক কহিয়ে
নীচনমে সরদারো।
কোটি পাপ ইক পাসঙ্গ মেরে
অজামিল কৌন বিচারো॥

এখানে অন্ধ অর্থে বোঝায় তাকে যে সত্য, সুন্দরকে দেখতে পায না, মিথ্যা ও পাপে ডুবে থাকে।

সুরদাসের কথা উঠলেই "সন্ত সুরদাস"এর কথা মনে পড়বে, যাঁর কথা 'মুনশিয়াৎ অবুল ফজল' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইনি ১৬শ শতাব্দের প্রথম দিকে কাশীতে থাকতেন। পরবর্তীকালে ইনি দিল্লীতে সম্রাট অকবরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং "দীন ইলাহি" ধর্মে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। "দীন ইলাহী" ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়েছিল, সুতরাং ধরে নেওয়া চলে যে সন্ত সুরদাস ১৫৩০ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

সুরদাস মদনমোহন চৈতন্য সম্প্রদায় -ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর কবিতার পদগুলি দেখলে মনে হয়, সুরদাস সেগুলি সাধারণত কবিতা হিসাবেই লিখেছিলেন। কোনো মতে তিনি ১৫১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন এবং অকবরের রাজত্বকালে সন্ডীলের অমীনরূপে কাজ করেছিলেন।

সুরশ্যাম বলতে প্রথম সুরদাসকেও বোঝায়। আবার অজ্ঞাতপরিচয় অন্য কবিকেও বোঝায়, যাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা আজও সম্ভব হয় নি।

গোবিন্দস্বামী

গোবিন্দস্বামী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, এমন-কি তানসেন যে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন এ কথাও লেখা আছে। গোবিন্দস্বামী ১৬শ শতকের প্রথম দিকে জন্মেছিলেন বলে মনে হয়, কারণ তিনি বিঠ্‌ঠলনাথের শিষ্য ছিলেন। এঁর পিতা বা মাতার

নাম জানা যায় না, তবে এক ভগ্নীর কথা শোনা যায়। কোনো মতে তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল ভরতপুরে। গোবিন্দস্বামী কবি, সংস্কৃতজ্ঞ এবং উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। গৃহী হলেও তাঁর বহু শিষ্য ছিল বলে অনুমান করা হয়, যে জন্য তাঁকে স্বামী বলা হত। পরবর্তীকালে সংসার ত্যাগ করে গোবিন্দ বৃন্দাবনে এসে বাস করতে থাকেন এবং মহাবনে আপন স্থান নির্ধারণ করে নেন। ওই স্থানকে কদমখণ্ডী বলে। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দস্বামী দেহত্যাগ করেন। তাঁর গানে শ্রীমদ্‌ভাগবতেব প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, এমন-কি অনুবাদ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। কোনো গ্রন্থ প্রণয়ন না করলেও গোবিন্দস্বামী কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে বহু গান রচনা করেছেন; তাঁর গানে নায়িকাভেদ বর্ণনাও পাওয়া যায়।

পরমানন্দ দাস

পরমানন্দ ১৫শ শতাব্দের শেষ দিকে জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল কনোজে। পিতামাতার নাম জানা যায় না। পরমানন্দ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং স্বামী নামে অভিহিত হতেন। অষ্টছাপভুক্ত হয়ে তিনি গোবর্ধনে বাস করতে থাকেন এবং 'পরমানন্দসাগর' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা, গোপীব সঙ্গে প্রেম ইত্যাদি বিষয় বিদ্যাপতির অনুসরণে লিখিত আছে। পরমানন্দের কবিত্বশক্তি উচ্চশ্রেণীর ছিল। পরমানন্দ ১৫৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন।

হরিদাসী সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে আমরা গায়ক হিসাবে হরিদাস স্বামীকে ও তাঁর শিষ্য হরিদাস চতুর্বেদীকে পাই; অন্য কারো নাম শুনি না। সুরদাস নাম নিয়ে যেমন গণ্ডগোল ঐ সময়ের হরিদাস নাম নিয়েও ঠিক তেমনই গণ্ডগোল; অথচ হরিদাসের সমকালীন হিতহরিবংশকে নিয়ে কোনো অসুবিধা ঘটে না। অবশ্য, এ কথা বলা যায় যে, ঐ রকম অদ্ভুত নাম অন্যে রাখতে চান নি; কিংবা সঙ্গীতকার হিসাবে হিতহরিবংশ প্রসিদ্ধ ছিলেন না বলেই ঐ নাম ব্যবহার করার লোভ কারও হয় নি। তবু এ কথা সত্য যে, হিতহরিবংশ সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি রাধাবল্লভ-সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন; বিষ্ণুপদ ও হোলিবিষয়ক কবিতা গানের উপযোগী করে রচনা করেছিলেন। সেই সব পদ যে ধ্রুপদ-ধমার এবং ভজনের রীতিতে গাওয়া হত তার প্রমাণ রাগকল্পদ্রুমে আছে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও হরিবংশ তেমন কিছু

প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারলেন না, বরং তাঁর সন্তান কৃষ্ণদাস যে রাধাবল্লভ-সম্প্রদায় ত্যাগ করে চৈতন্য-সম্প্রদাযে প্রবেশ করলেন এই কথাই রটনা হল বিশেষ ভাবে। হরিদাস সম্বন্ধে এমন কোনো কথাই ওঠে না, সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, হয় হরিদাস অনন্য ছিলেন, আর না হয তাঁকে তানসেন প্রভৃতি নামের সঙ্গে জড়িয়ে সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের পর্যায়ে ওঠাবার চেষ্টা করা হযেছে। হঠাৎ ঐ সময়ে হরিভক্তির প্রাবল্য ঘটায় বহুজনে হরিদাস নাম নিতে থাকার জন্যও অবশ্য বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হতে পারে— কে যে প্রকৃত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না! কিন্তু হরিদাস স্বামীর এত নাম হল কেন? "অষ্ট শিষ্য" বলে কথাটি এল কেন? এ কি অষ্টছাপের অনুকরণ নয়? বৃন্দাবনে বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধুরা নিজ নিজ মতকে প্রাধান্য দেবার জন্য নানা কৌশল ও কূটনীতির আশ্রয় যে নিতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ নানা গ্রন্থে, নানা কাহিনীতে ছড়িয়ে আছে। কাজেই একটা অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কোনো অকাট্য সত্যকে পাবার উপায় নেই। তবু ইতিহাস সৃষ্টির পথে হরিদাস প্রভৃতিকে না পেলে চলেই না।

অন্তত সাতজন হরিদাসকে আমরা পেয়ে থাকি :

১ হরিদাস (স্বামী)

২ হরিদাস (২য়)

৩ হরিদাস (গায়ক)

৪ হরিদাস (ডাগুর)

৫ হরিদাস (যবন)

৬ হরিদাস (কবীরপন্থী)

৭ হরিদাস (রামসনেহী-সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রভৃতি

এঁদের মধ্যে শুধুমাত্র হরিদাস স্বামীর জন্ম নিয়ে মতানৈক্য লক্ষণীয়—

১ হরিদাস আশুধীর স্বামীর পুত্র ; জন্ম মূলতানে, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে।

২ আশুধীর স্বামীর পুত্র ; জন্ম অলীগড়ের হরিদাসপুর গ্রামে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ; সারস্বত ব্রাহ্মণ।

৩ জন্ম ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মথুরার রাজপুর গ্রামে ; সনাঢ্য ব্রাহ্মণ।

৪ জন্ম ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে।

এই মতানৈক্য থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

হরিদাস স্বামী

হরিদাস স্বামীর রচনা ও রাগ-ব্যবহার লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, তিনি প্রাচীন পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছেন, রাজা মানের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন নি। অতএব তিনি এমন সময়ে জন্মেছিলেন যখন ধ্রুবপদ্ধতি মথুরা, বৃন্দাবনে চলছে। এইটুকু বিবেচনা করলেই আমরা বুঝে নিতে পারব যে, হরিদাস স্বামী ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গঙ্গাধর ও মাতার নাম চিত্রা; জন্মস্থান মথুরার রাজপুর গ্রাম। তাঁর সঙ্গীতগুরুর নাম আমাদের অজ্ঞাত। হরিদাসকে মূলতানী ভেবে নিয়ে কোনো সমালোচক গুরুর নাম বলেছেন বৈজু, অপরে বলেছেন গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত স্বামী। বৈজুকে আমরা জানি, কিন্তু কৃষ্ণদত্ত স্বামীকে খুঁজে পাই না।

অবশ্য, এই খোঁজার কোনো অর্থ নেই, কারণ ঐ সময়ে আমরা যে দিকে খুঁজব সেই দিকেই দেখব, এক-এক জন দিকৃপাল সঙ্গীতজ্ঞ বীণা সহযোগে, তানপুরা সহযোগে গেয়ে উঠছেন, কিন্তু তাঁর গুরু? অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত হয়ে কোন্ অন্ধকারের আড়ালে তিনি লুকিয়ে আছেন! ১৫শ শতকে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ যে কজনকে পাই কারো কি গুরুর নাম জানা যায়? আরও পিছিয়ে যাই— অমীর খুস্‌রোর গুরু কে? গোপাল নায়কের পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস দেখি, সেণ্ট আম্‌ব্রোজ্ থেকে শুরু করে ওব্রেকৃট্ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেও তাঁদের গুরুকে খুঁজে পাই না। প্রকৃতপক্ষে, যখন একটা পরিবর্তনের ঢেউ আসে, তখন শিল্পসৃষ্টিতে, মানসিক বিবর্তনে শিক্ষা-গুরুর প্রয়োজন হয় না— ঢেউয়ের ধাক্কায় সৃষ্টি হয়, বিবর্তন হয়। সুতরাং যা নিতান্ত গতানুগতিকভাবে ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে চলছিল, তাই হরিদাস স্বামীদের কালে নবীন রূপ নিল, নূতন গতি নিল; গুরুর প্রয়োজন ঘটল না, যেমন ঘটে নি কবীর, নানকের কবিতা-রচনার কালে, নরসী মেহতার সুরত সংগ্রাম ব্যাখ্যার সময়ে। তবু গুরুবাদী আমরা, মন মানে না, গুরুর সন্ধান করে ফিরি, একটা কোনো নাম তৈরী করে নিতে পারলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

পঁচিশ বৎসর বয়সে হরিদাস বৃন্দাবনে চলে আসেন এবং সাধনায় রত হন। এইখানে আশুধীর স্বামীর নিকট তিনি দীক্ষা নেন। এই আশুধীর স্বামীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আদি নিবাস ছিল মূলতানে, পরে তিনি অলীগড়ে আসেন। কবে তিনি বৃন্দাবনে এলেন তার কোনো সঠিক সংবাদ নেই। তাঁর নিজেরও নাকি এক পুত্র ছিলেন যাঁর নাম ছিল হরিদাস; এবং এই হরিদাসই

যে হরিদাস স্বামী সে কথা প্রমাণ করবার জন্য নানা জনে চেষ্টা করেছেন। এমন-কি হরিদাসের যে আর দুজন ভাই ছিলেন, সেটা জানাতেও কসুর করেন নি। কিন্তু এ কাজ যাঁরা করেছেন তাঁরা হয় আশুধীর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং হরিদাস স্বামীকে নিজ গোত্রীয় করবার প্রচেষ্টা করেছেন অথবা তাঁরা বৃন্দাবনে আপন আপন প্রভাব বৃদ্ধির জন্য হরিদাস স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। হরিদাস স্বামীর সংসারবিমুখ শিষ্যেরা কখনোই আশুধীর স্বামীর সঙ্গে হরিদাস স্বামীর রক্তের সম্বন্ধ স্বীকার করেন নি; বরং বলেছেন, আশুধীর সারস্বত ও হরিদাস সনাঢ্য ব্রাহ্মণ। অবশ্য, আশুধীরের পুত্র কিনা জানি না, মুলতানের হরিদাসকে মানতে আমাদের আপত্তি নেই। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

হরিদাস নিম্বার্ক সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি সখীভাবে কৃষ্ণের ভজনা করতেন। ১৫৩০-৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর ইচ্ছাদ্বৈতবাদী হরিদাসী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তিনি কুঞ্জবিহারী শ্যামাশ্যামের আরাধনা করতেন এবং বাঁকেবিহারীর মন্দির তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। হরিদাস স্বামী খুব বেশী পদরচনা করেন নি। "সিদ্ধান্ত" ও "কেলিমালে" এই পদগুলি সংগৃহীত আছে। বেশীর ভাগ পদের শেষে "শ্যামা কুঞ্জবিহারী" শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। পদগুলির রচনাভঙ্গী দেখলে মনে হয় এগুলি ধ্রুপদ অঙ্গের—তাল এখানে মুখ্য, গানের ছন্দ গৌণ। প্রমাণ হচ্ছে যে, বিষ্ণুপদ যে-কোনো কারণেই হোক তালের অধীন হয়ে আসছিল—হয়তো ভজনের প্রভাবে, হয়তো ধ্রুব-প্রবন্ধের প্রভাবে, হয়তো বা ধ্রুবপদের সংমিশ্রণে। কিন্তু রাগের ব্যবস্থাটুকু ঠিক ছিল; সংকীর্ণ বা নবীন রাগকে সযত্নে পরিহার করা এবং তার রূপকে অবিকৃত রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছিল। সালগসূঢ় প্রবন্ধের চারটি "ধাতু" এবং আভোগে নায়ক ও লেখকের পরিচয় ইত্যাদি ব্যাপার অপরিবর্তিত রাখবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তবে "অঙ্গ" ব্যবহৃত হত খুব অল্প। ভাষা বৃজভাষা, কিন্তু শুদ্ধ ও ভাবগম্ভীর।

গোস্বামীগণের মতে অন্যান্য যা গান পাওয়া যায়, সে সব অন্য হরিদাসের। পরবর্তী অনুকরণও হতে পারে। অবশ্য বৃন্দাবনে এ সময়েই একের বেশী হরিদাস যে উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়; হরির ভক্ত বিধায় অনেকেই হরিদাস নামে আপনাকে অভিহিত করতেন। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিলোচনকে আচার্য হরিদাস বলা হত, যে জন্য হরিদাস স্বামীকে বলা হত "আসুকো হরিদাস"। অজ্ঞাতপরিচয় অন্য কোনো হরিদাসও হয়তো ছিলেন যিনি অপ্রমাণিত এই গানখানি লিখেছিলেন—

চরণকমল জোত নিহারি
মেরে মনকী তপত দুর হো।···
হরিদাস স্বামীকে প্রভু সব ঘটে ব্যাপক
ঘরি ঘরি সুমরণ কাহে ন করহো॥

লক্ষ্য কবলেই দেখা যায় হরিদাস কোথাও নিজেকে স্বামী বলেন নি, বৈষ্ণবজনোচিত দীনতায় বলেছেন শ্রীহরি-দাস অর্থাৎ শ্রীহরিব দাস—

"শ্রীহরিদাসকে স্বামী শ্যামা কুঞ্জবিহারী"

স্বামী বলতে এখানে কুঞ্জবিহাবীকে বোঝাচ্ছে। এই বৈষ্ণবীয় দীনতার জন্য অনেকে হরিদাসকে চৈতন্যপন্থী বলবার চেষ্টা করেছেন, বলেছেন চৈতন্যও রাধা-ভাব গ্রহণ করতেন। অথচ সখীভাব ও বাধাভাবে বহু প্রভেদ। যাই হোক, চৈতন্যপন্থী ভাববাব ফলে হরিদাসেব সমসাময়িক কৃষ্ণদাসকে 'গীতপ্রকাশ' গ্রন্থের লেখক বৈষ্ণব উড়িষ্যাবাসী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে এক কবে ফেলতে অনেকেরই অসুবিধা হয় নি, এবং এই সূত্রে হবিদাসকে গীতপ্রকাশকার কৃষ্ণদাসকে কৃষ্ণদত্ত বলে বিবেচনা করে তাঁর সঙ্গীতশিষ্য বলে পবিচয় দিতেও বাধা আসে নি, যদিও কৃষ্ণদত্ত বলেই যে অপর একজন কেউ ছিলেন তার কথা কোনো কোনো গ্রন্থকার জানিয়েছেন। হবিদাসের সঙ্গে যে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে একই সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং একই সময়ে অপ্রকট হয়েছিলেন, সেই কৃষ্ণদাস বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের অষ্ট-ছাপের একজন আচার্য। যাই হোক, যত দূর জানা যায়, হরিদাস বল্লভ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসলীলা, হোলি প্রভৃতির গীতিপদ্ধতিকে উন্নততর করেছিলেন, বাদ্যে ও নৃত্যেও নবীনতা এনেছিলেন। কিন্তু কে যে ধ্রুপদের ধাতু ও তাল নামের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, ধমার নামের উদ্ভাবন করেছিলেন তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি, যদিও ধমার যে সে সময়ে প্রচলিত ছিল তার আভাস পাওয়া যায়।

হরিদাস কুড়ি বাইশটির বেশী রাগ ব্যবহার কেন করেন নি, তা বলা যায় না; হয়তো সংকীর্ণ মিশ্র রাগের ব্যবহারে প্রাচীন রাগগুলি তখন চাপা পড়ে গিয়েছিল। হরিদাস স্বামী আমাদের সঙ্গীতের যে উপকার করেছেন, সেটা হল তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে মুসলিম প্রভাব রোধ করার চেষ্টা এবং শাস্ত্রীয় নিয়মকে প্রচলিত রাখার সংকল্প। কিন্তু তাই বলে তিনি লুপ্ত প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরতে যান নি, যা তখনকার শাস্ত্রকাররা করেছিলেন। তিনি ১৫শ শতাব্দের পরিবর্তিত ধ্রুব-প্রবন্ধাদিকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং ভগবদ্‌গুণকীর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কথা হল, সেই পদ্ধতি কি সাধারণে প্রচারিত হয়েছিল?

আমাদের তা মনে হয় না। সম্প্রদায়গত করে রাখবার যে প্রবৃত্তি আমরা ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করি, তাতে হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কোনো গুণী সেই বস্তু দশের উপকারে বিতরণ করবেন, এটা অসম্ভব মনে হয়। অনুমান হয়, অন্য কোনো হরিদাস হয়তো বৈজু, গোপাল, রাজা মান, বকমু প্রভৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং প্রাচীন পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য হয়ে যে নবীন প্রণালীর সৃষ্টি করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই সব সৃষ্টি হরিদাস স্বামীর নামে প্রচার করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে গায়ক হরিদাস বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী-সেবক শ্রীহরিদাস নন। অবুল ফজল হরিদাসের নাম করেন নি, ফকীরুল্লা করেন নি, করেছেন করম ইমাম এত বছর বাদে, তাও শুধু বলেছেন সন্ত স্বামী হরিদাস, যার অনেক অর্থ হয়। তবু আমাদের অনুমানের পক্ষে কোনো প্রমাণ তো আমরা দিতে পারছি না, কাজেই এখন ঐ মতটুকু প্রকাশ করেই আমাদের চুপ করতে হচ্ছে। তাই ব'লে এখনকার যা কিছু সব হরিদাস স্বামীর দান, এ কথার আমরা প্রতিবাদ করবই। যাঁরা বলবেন যে, বৈজু, গোপাল, মদনরায়, রামদাস, দিবাকর, সোমনাথ, তানসেন ও সমোখন হরিদাসের শিষ্য তাঁরা কিংবদন্তী-আশ্রয়ী। সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী যিনি একদিনের জন্যও তাঁর বাঁকেবিহারীর সেবা ত্যাগ করে বাইরে যান নি এবং ইষ্টদেবতার পূজায় সখীভাবাপন্ন সংসারত্যাগীদের সঙ্গে গীত-বাদ্য-নৃত্য করেছেন নিতান্ত একান্তে, তিনি সংসারী, ব্যবসায়ী বা আত্মসুখসর্বস্ব মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গীতশিক্ষা দেবেন, এ কথা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। আজও বহু সাধকসম্প্রদায় আছে; কোনো ব্যক্তি তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের সাধন-পদ্ধতির কোনো অঙ্গ শিখেছেন বলে বলতে পারবেন না, যদি-না সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধি অর্থ বা যশ -প্রার্থী হয়ে অনুচিত কোনো কার্য করেন। আজও কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ গান সম্প্রদায়েই আবদ্ধ থাকত যদি সাংসারিক লাভের লোভ অনুগামীদের মধ্যে দেখা না দিত। অতএব ললিতার প্রতিমূর্তি অনন্য হরিদাস বোধ হয় তানসেন প্রভৃতির গুরু ছিলেন না, ছিলেন অন্য কোনো হরিদাস এবং তাঁর সমকালীন গায়করা। তবু কেন এমন অদ্ভুত জনশ্রুতি, তানসেন এমন-কি অকবরকে নিয়ে এমন হরিদাসের চিত্র; তার উত্তর বোধ হয় এই: অকবরের সময়ে মুসলিম প্রভাব পাকে-প্রকারে বর্ধিত হচ্ছিল, মুসলমান নূতন কিছু গড়বার চেষ্টা করছিল; কাজেই হিন্দু তার প্রাচীনত্ব রাখবার চেষ্টায় ছিল এবং হরিদাস স্বামীর নাম দিয়ে সব কিছু হিন্দুর প্রমাণ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল, আর গায়ক তানসেন, যাকে নিয়ে অকবরের গর্ব, মুসলমানদের গর্ব, তিনি যে ঐ হরিদাসের অতি নগণ্য ছাত্র এই কথা প্রচার করে

শান্তি পাবার চেষ্টা করছিল। হরিদাসের চিত্র দেখলেই বোঝা যায়, চিত্র একখানিই তার দুটি অনুলিপি— একটিতে অকবর নেই, একটিতে আছেন। যেটিতে আছেন, সেটিতে তিনি অতি বৃদ্ধ, যা অসম্ভব। হরিদাস স্বামীর চিত্রটি একই প্রকার আছে। কিন্তু তানসেনকে নিতান্ত যুবক মনে হয; তা ছাড়া, এই ছবির সঙ্গে তানসেনের নাম লেখা যে ছবি দেখা যায়, তার মুখ বা চেহারার মিল পাওয়া যায় না।

হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিছু আশ্চর্য নয়, কারণ পরমতসহিষ্ণু অকবর ধর্ম আলোচনার জন্যই দেখা করতে পারেন, সেটা কিছু নয়; অদ্ভুত হচ্ছে ছবি আঁকাটা। ছবির পিছনে প্রচারের প্রচেষ্টা বড স্থূলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হরিদাস নিশ্চযই এ ছবি অনুমোদন করতেন না। অন্য কোনো সুফী, সন্ত, সন্ন্যাসীর সঙ্গে কি অকবরের সাক্ষাতের চিত্র আছে? না থাকলে, কেন নেই? হরিদাস ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। অকবর ঐ সময় পর্যন্ত সুন্নীভাবাপন্ন ছিলেন। তারপর যখন ভিন্ন মতে পরিবর্তিত হলেন, তখন ফতপুর সিক্রিতে ইবাদৎখানা তৈরী করালেন এবং প্রথমে মুসলিম ধর্মগুরুদের ডাকলেন, তারপরে ডাকলেন হিন্দু প্রভৃতিকে যাঁদের নাম পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং সুন্নীভাবাপন্ন অকবরের হরিদাস স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়।

হরিদাস স্বামীর রচিত বলে কযেকখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, যথা— 'হরিদাসজী কো গ্রন্থ', 'স্বামী হরিদাসজীকে পদ', 'হরিদাসজী কী বাণী,' ইত্যাদি। এগুলি হরিদাসী সম্প্রদায় -প্রণীত হওয়াই সম্ভব, যদি-না অন্য কোনো হরিদাসের পদ এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে; তবে গোস্বামীদের বিবরণ বিশ্বাস করলে বলতেই হবে যে এই গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগ পদই স্বামী হরিদাস-রচিত নয়, সম্প্রদায়ের পরবর্তীকালের গীতিকারদের লিখিত। বৃন্দাবনের অন্য হরিদাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায না।

দ্বিতীয় হরিদাস যিনি চতুর্বেদী উপাধিধারী ছিলেন তিনি হরিদাস স্বামীর শিষ্য। হরিদাসপুর যে হরিদাসের নামে তাঁকে আশুধীর স্বামীর পুত্র বলে কেউ কেউ পরিচয় দেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কে তা আমরা বলতে পারি না। গায়ক হরিদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে তিনিও স্বামী ছিলেন এবং রেবার বীরভান সিংহের রাজসভার প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। প্রবাদ, এই হরিদাস স্বামীর কাছেই তানসেন সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন তাঁর যৌবনকালে। এ প্রবাদের কোনো মূল আছে কিনা তা এখনও খুঁজে দেখা হয় নি। এর রচিত বলে একখানি গানের প্রচলন্ আছে। গানখানি হল—

"তান তরবার তার কসি পর লিয়ে
ফিরত গুণী জহঁা তহঁা জিতত তুরত্।...
তেহি সভাকে বীচ লড়ত স্বামী হরিদাস। ইত্যাদি

হরিদাস ডাগুর নামে এক সঙ্গীতজ্ঞের গান পাওয়া যায় (এমন-কি একখানি ছবিও পাওয়া যায়), যদিও সেখানি সত্যই কার তা বোঝা যায় না। এ ছবি রেবার হরিদাসেরও হতে পারে, তবে বৈরাম খাঁর ঘরানায় হরিদাস ডাগুরের বলেই প্রচার করা হয়। মুশকিল এই যে, বৈরাম খাঁর বংশধরদিগের বিবরণের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না— এক-একজন এক-এক প্রকার বিবরণ দেন। যতদিন অল্লাদিয়া খাঁ বেঁচে ছিলেন তিনি এই বংশকে ধাড়ী মিরাশি বলতেন। বৈরাম খাঁ থেকে নসীরুদ্দীন খাঁ পর্যন্ত কেউই নিজেকে ডাগুর বলতেন না; হঠাৎ রহীমুদ্দীন খাঁর সময় থেকে এঁরা ডাগুর হয়ে গেলেন, কালিদাস ডাগুর প্রভৃতির আবির্ভাব হল, নিজেরা পাণ্ডে ছিলেন বলে প্রচার করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, হরিদাস ডাগুর কোন্ সময়ের ব্যক্তি সেটা জানা যায় না। কোনো মতে ইনি তানসেনের বয়োজ্যেষ্ঠ, কোনো মতে কনিষ্ঠ। জগন্নাথ কবিরায় এঁকে কনিষ্ঠই বলেছেন। তাঁর গানে আছে—

ভগবন্ত সুরভরণ, রামদাস জস্নুপায়ৌ
তাসসৈন জগৎগুরু কহায়ৌ
ধোঁধু বানী রসাল ॥
সুরতিবিলাস হরিদাস ডাগুর
জগন্নাথ কবিরায় তিনকে পগ
পরসিবে কৌ শ্যামরাম রঙ্গলাল ॥

দেখা যাচ্ছে হরিদাস ডাগুর ধোঁধীরও পরবর্তী অর্থাৎ ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। তবে তিনি যে উত্তম গায়ক ছিলেন এবং শ্রুতিজ্ঞান তাঁর অদ্ভুত ছিল এ কথা স্বীকার্য। তানসেন ডাগুর-বাণীকে তৃতীয় স্থান দিয়েছিলেন; সেই ডাগুর বাণীর গায়ক যদি এই হরিদাস হন তা হলে তাঁর সম্বন্ধে যে তানসেন প্রভৃতির উচ্চ ধারণা ছিল না এটা স্বীকার করতেই হবে। আমরা মনে করি, ডাগুর এখানে পঞ্জাবের কোনো স্থাননির্দেশক। হরিদাস ডাগুরের কতকগুলি গান পাওয়া যায় যাতে শিবের বন্দনা আছে, নায়িকাভেদ বর্ণনা আছে, নির্গুণপন্থীর উপদেশ আছে, নাদের বিবরণ আছে। বৈজু, গোপাল ও তানসেনের অনুসরণ যেন এই সব গানে লক্ষ্য করা যায়। তবে গানের ভাষা বেশ সরস এ বিষয়ে সন্দেহ

নেই, হয়তো ধোঁধীর মতো নয় কিন্তু বিশেষ কমও নয়। "ভরি ভরি ঘরি ঘরি আবত গাগরি নাগরি নারি রী তু কৌনকে রস মিস করি"— কবিতার দিক দিয়ে চমৎকার। সেনী ঘরেও যে ডাগুরের দু-একটি গান শোনা যায় না তা নয়।

অন্যান্য হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গীতের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক। সঙ্গীতের নবীনরূপ সম্পাদনে ঐ সময়ে আর যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন চৈতন্য-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের চৈতন্যদেব সমূহ সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন, নানা রাগরাগিণীতে নাম-গান প্রচলন করেন; এই রাগরাগিণী ব্যবহারে তাঁকে সহায়তা করেন স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, অদ্বৈত গোস্বামী, নরহরি সরকার প্রভৃতি। চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী সকলেই জানেন, কিন্তু অন্যান্যদের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায না।

চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। একুশ বৎসর বয়সেই ইনি প্রকাণ্ড বিদ্বান বলে খ্যাত হন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গীত তিনি শিখেছিলেন কি না বলা সম্ভব নয়। মনে হয় শ্রীবাস প্রভৃতির সহাযতায়ই রাগরাগিণীযুক্ত নামকীর্তনের প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। বহুজনে মিলে সংকীর্তন, বেড়া কীর্তন, উদ্দণ্ড কীর্তন চৈতন্যদেবই প্রচার করেছিলেন। লীলাকীর্তনের মধ্যকালীন রূপ তাঁর জন্যই প্রসারের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কীর্তনের বিভিন্ন তাল কী ভাবে জন্মাল তার বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না, অথচ ঐ সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদ যে সুর-তাল সংযোগে গীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়; পেলেও ঐ কবিদের গানের তাল কোথাও দশপাহিড়া, দশকোশী ইত্যাদি নাম গ্রহণ করে নি। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোভাব ঘটে।

রায় রামানন্দ বা রামানন্দ রায় ছিলেন ভবানন্দর পুত্র এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। খুব সম্ভব ইনি ১৪৬৫-৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামানন্দ যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রবীণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাব্যগীতে পারদর্শিতার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন উড়িষ্যারই সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থে। রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' নামে একখানি সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন; সেই নাটকে গীত হবার উপযোগী বহু সংস্কৃত গানও তিনি রচনা করেছিলেন যা কীর্তনীয়াগণ আজও শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করে থাকেন। রামানন্দ বিদ্যাপতিকে, চণ্ডীদাসকে

অনুসরণ করে পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। ১৫২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে বা কাছাকাছি সময়ে রামানন্দ রায় দেহত্যাগ করেছিলেন বলে অনুমান হয়।

স্বরূপ দামোদর ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয। তাঁর আদি নিবাস ছিল ভিটাদিয়ায়। স্বরূপের পিতৃদত্ত নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য আর পিতার নাম ছিল পদ্মগর্ভাচার্য। স্বরূপ দামোদর সঙ্গীতে যথেষ্ট কৃতী ছিলেন বলে শোনা যায়। কীর্তনে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ তিনি চমৎকার গাইতেন।

অদ্বৈত আচার্য ছিলেন শ্রীহট্টের লাউড় গ্রামবাসী। তাঁর পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম ছিল নাভা। কোনো মতে অদ্বৈত ১৪৩০, কোনো মতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা মনে করি, তিনি ১৪৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ চৈতন্য অপেক্ষা ৩৫ বৎসরের বড় ছিলেন। অদ্বৈতের প্রায় ৫২ বৎসর বয়সে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম পুত্র অচ্যুতের জন্ম হয়। প্রাচীন হিসাব ধরলে অদ্বৈত পুত্রের জন্মকালে ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ। তিনি প্রথমে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ছিলেন। কোনো মতে অদ্বৈত অবধূতমার্গ অবলম্বনকারী ছিলেন, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব হয়ে পড়েন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, চৈতন্যদেবকে তিনি বিদ্যাপতির পদ গেয়ে শোনাতেন; এমন-কি গানের সঙ্গে করতালি দিয়ে নৃত্য করতেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত মৃত্যুমুখে পতিত হন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। কোনো মতে তিনি ১২৫ বছর বেঁচে ছিলেন।

নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ১৪৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। শ্রীখণ্ডের এই সঙ্গীতজ্ঞের পিতা ছিলেন নারায়ণদেব, মাতা গোয়ী। নরহরি সরকার বহু কীর্তনের পদ রচনা করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' নামে তাঁর একখানি গ্রন্থ আছে। "পিরীতিরীতি"র ব্যাখা করে ইনি চণ্ডীদাসের অনুসরণে কয়েকটি পদ লিখেছিলেন বলে শোনা যায়। গৌরলীলা-বিষয়ক অনেকগুলি পদ ইনি রচনা করেছেন। কোনো মতে ইনিই চৈতন্যদেবকে ঈশ্বররূপে সর্বপ্রথম পূজা করেন এবং গৌরনাগরী ভাবের প্রচার করেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করেন। শ্রীখণ্ডের কীর্তনীয়া সম্প্রদায় নরহরি এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দের প্রভাবেই গড়ে ওঠে। 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' নামক অপর একখানি গ্রন্থও নরহরি সরকার পরবর্তীকালে প্রণয়ন করেছিলেন।

গোবিন্দ ঘোষ ও তাঁর দুই ভাই, মুকুন্দ দত্ত, রামানন্দ বসু প্রভৃতি কয়েকজন চৈতন্যভক্ত কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁদের

অধিকার কতটুকু ছিল তা জানা যায় না, যদিও ধরে নেওয়া যায় যে, সেকালের কীর্তন বিশেষত জয়দেব ও বিদ্যাপতি-রচিত পদ রাগযুক্ত ভাবেই গাওয়া হত।

চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পরিচয়দানের সঙ্গে আমরা ১৫শ শতকের ভক্তিবাদী সঙ্গীতজ্ঞদের সাধারণ পরিচয় শেষ করলাম। বাকী রইল ঐ সময়ের সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থের গ্রন্থকর্তাদের পরিচয়।

রাণা কুম্ভের সাঙ্গীতিক দান সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অন্যান্য গ্রন্থকারদের মধ্যে আছেন 'সঙ্গীতসর্বস্ব'কার জগদ্ধর, 'গীতপ্রকাশ'কার কৃষ্ণদাস, 'সঙ্গীতসার'রচয়িতা হরিনায়ক, 'রাগমালা'রচয়িতা ক্ষেমকর্ণ এবং 'সঙ্গীতরত্নমালা'কার মম্মটাচার্য।

'জগদ্ধর' অজ্ঞাতপরিচয়; তবে তিনি বসন্তরাজীয়, সঙ্গীতাবলী ও নাট্যলোচন গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে জগদ্ধরের আবির্ভাবকাল ১৫শ শতকের মাঝামাঝির কিছু পরে। এঁর 'সঙ্গীতসর্বস্ব' একখানি সংকলন গ্রন্থ, নূতন কোনো বস্তু এতে নেই।

'কৃষ্ণদাস' উড়িষ্যাবাসী সঙ্গীতজ্ঞ। আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এঁর পরিচয় পাওয়া যায় নি; তবে জগন্নাথদেবের বেত্রধারী সেবক এক কৃষ্ণদাস ছিলেন, তিনি এই কৃষ্ণদাসও হতে পারেন। কৃষ্ণদাস 'গীতপ্রকাশ' নামে একখানি প্রামাণ্য সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তার মধ্যে রায় রামানন্দকে একজন বিজ্ঞ সঙ্গীতবেত্তা বলে ঘোষণা করেছিলেন। গীতপ্রকাশে এবং এই সময়ের অন্যান্য পুস্তকে আমরা ক্ষুদ্র গীতের বিবরণ পাই, যা আগে কোথাও পাই নি। গ্রন্থকারেরা প্রবন্ধকে তিন প্রকারে বিভক্ত করছেন— শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র। এই রকম ভাগ কে প্রবর্তন করলেন তা বোঝা যায় না; তবে সন্দেহ হয়, সঙ্কীর্ণ রাগাদির পরিচয়সূত্রে যে সব অপ্রাপ্য গ্রন্থের রচনা হয়েছিল, তার থেকেই এই ভাগগুলির জন্ম হয়েছে। পূর্বভারত ব্যতীত অন্য কোথাও এই ভাগ দেখি না, অথচ জৌনপুর থেকে মথুরার মধ্যে যে ক্ষুদ্র গীত প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন পাই। গীতপ্রকাশের পনেরোটি অধ্যায়ের মধ্যে ক্ষুদ্রগীত অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুকাল আমাদের জানা নেই, মনে হয় ১৬শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হবে। অনেকে মনে করেন যে, এই কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে বাস করতেন এবং ইনিই স্বামী কৃষ্ণদাস। একই সময়ে কয়েকজন কৃষ্ণদাস বর্তমান থাকায় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বৃন্দাবনে দুজন কৃষ্ণদাসকে এই সময়ে পাওয়া যায়, যাঁদের মধ্যে একজন হলেন

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্ণদাস। অপরজন হলেন রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের হিতহরিবংশের পুত্র কৃষ্ণদাস।

উড়িষ্যার কৃষ্ণদাস কোনো দিন দেশ ছেড়ে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই; তাঁর গ্রন্থও পাওয়া যায় ওড়িষী ভাষায়। অন্য দিকে, স্বামী কৃষ্ণদাস ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ে যোগদান করে বিলছুকুণ্ডতে বাস করেছিলেন এবং গিরিরাজ মন্দিরের অধিকারী হয়েছিলেন। এঁর মৃত্যু হযেছিল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী হরিদাসের মৃত্যুর সম-সময়ে। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের নাম 'কৃষ্ণসাগর' যার ভাষা বৃজভাষা।—

কমল মুখ দেখত কৌন অঘাই।
সুনিহি সখী লোচন অলি মেরে
মুদিত রহে অরুঝাঈ॥...

হরিনায়ক তাঁর গ্রন্থে নিজের পরিচয় দেন নি; কিন্তু পরবর্তীকালের গ্রন্থকারেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থের লেখক হরিনায়কের উল্লেখ করেছেন। 'সঙ্গীতদামোদরে'র রচনা দেখলে মনে হয় 'গীতপ্রকাশে'র সঙ্গে সঙ্গে 'সঙ্গীতসার' থেকেও কিছু সংকলন ঐ গ্রন্থে আছে। সঙ্গীতনারায়ণ ও নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থে তো বহু উদ্‌ধৃতিই আছে। সুতরাং ভেবে নেওয়া যায় যে, হরিনায়ক ১৫শ শতকের শেষ দিক থেকে ১৬শ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। হরিনায়ককে পূর্বভারতীয় গ্রন্থকার ব'লেই সন্দেহ হয়, কারণ বাংলা ভিন্ন অন্য কোনো স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ বা রচনাকাররা তাঁর নাম করেন নি, যদিও এই ব্যক্তির নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো ছিল। অলংকার-বর্ণনা করতে গিয়ে হরিনায়ক নাম ব্যবহার করেছেন 'সরল', 'যমল', 'নাগপাশ', 'কুটিল' ইত্যাদি। এই সব নামের সঙ্গে অলংকারের প্রকৃতির অতি চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র গীত বিষয়ে হরিনায়কের আলোচনা সম্বন্ধে তো আগেই বলেছি॥

'ক্ষেমকর্ণ' অজ্ঞাতপরিচয়। ইনি 'রাগমালা' নামক গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থটিতে শুধু রাগরাগিণী বিভাগের বিবরণ আছে। রাগ এই গ্রন্থে ছয়টি, রাগিণী ছত্রিশটি এবং রাগপুত্র আটচল্লিশটি।

'মেঘকর্ণ' সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না। তাঁর গ্রন্থের নামও 'রাগমালা' এবং সেখানেও ঐ ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ও আটচল্লিশ রাগপুত্র। দেখলে মনে হয়, ক্ষেমকর্ণ ও মেঘকর্ণ একই ব্যক্তি, লিপিকার-প্রমাদে দুটি পৃথক্ নামের উৎপত্তি হয়েছে। এঁদের এই প্রকার রাগ-রাগিণী-রাগপুত্র বিভাগ দেখলে গ্রন্থকারদের

১৫শ শতকের বলে ভাবতে একটু অসুবিধা হয়। ১৬শ শতকের গ্রন্থকারদের মধ্যেই এঁদের গণনা করা উচিত, এবং তাও শেষের দিকে, যদিও অনেকে এঁদের ১৫শ শতকেই রেখেছেন।

এই প্রসঙ্গে 'মম্মটাচার্য্য', 'কল্লিনাথ', অজ্ঞাতপরিচয় 'নারায়ণ' ও 'দাক্ষিণাত্য নিবন্ধ রাগবিবেক'-রচনাকার সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য 'লক্ষ্মীনারায়ণ'কে যে আনা যায় না তা নয়।

সমালোচকরা বলেন যে, ১২শ শতাব্দে এক মম্মট ছিলেন, তিনি 'সঙ্গীত রত্নমালা' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। আমরা যে 'মম্মটাচার্য্য'কে পাই তাঁর গ্রন্থ 'সঙ্গীত-রত্নমালা', কিন্তু সে গ্রন্থে রাগরাগিণী বিভাগ আছে। রাগ সেখানে ছয়টি, যার মধ্যে কর্ণাট আছে, আর রাগিণী সেখানে ছত্রিশ যার মধ্যে শ্রী আছে আর আছে চন্দনী, প্রপাতনী, নবনী ইত্যাদি পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত রাগ। সুতরাং এঁকে অনেক বিবেচনা করেও ১৬শ শতকের শেষ দিক থেকে আর পিছনে নিয়ে যাওয়া যায় না।

'কল্লিনাথ-মত' বলে একটি মতের নাম আমরা শুনে থাকি। অনেকে এই কল্লিনাথকে 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র টীকাকার বলে মনে করেন। এমন-কি কোনো কোনো ব্যক্তি এঁকে কালীয়নাথ অর্থাৎ কৃষ্ণ বলে ভেবে নেন। যাই হোক, মত-প্রচারক হিসাবে আমরা যে কল্লিনাথকে পাই, তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই, মতটিই শুধু অপরের গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সেখানে দেখি কল্লিনাথ রাগ-রাগিণী বিভাগ করেছেন যাতে রাগ ছয়টি, রাগিণী ছত্রিশটি এবং সেই সঙ্গে পুত্রও আটচল্লিশটি। কিন্তু এই রাগিণী বিভাগে নামগুলি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকারের। কোথাও শ্রীর রাগিণী রুদ্রাণী, কোলাহল ইত্যাদি, কোথাও মধুমাধবী ইত্যাদি, কোথাও বা বৈরঞ্জী ইত্যাদি, যেগুলিকে একটিমাত্র স্থলেই পাওয়া সম্ভব। সে স্থলে, কল্লিনাথকে প্রাচীনতর কল্লিনাথ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা ও কলানিধি থেকে বৈরঞ্জী, দেবাল ইত্যাদি কয়েকটি রাগ বেছে নিয়ে রাগিণী নামে চালিয়ে দেবার যে চেষ্টা হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। যাই হোক, এই দ্বিতীয় কল্লিনাথকে ১৬শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝির কোনো পণ্ডিত বলে ভেবে নেওয়া যায়।

'নারায়ণ' কোন্ সময়ের গুণী তা বোঝা যায় না, কিন্তু 'সঙ্গীতকৌমুদী' গ্রন্থের রাগ-রাগিণী বিভাগ দেখে তাঁকে দক্ষিণী পণ্ডিত বলে মনে হয়। ইনি 'শৃঙ্গারশেখরে'র অনুসরণ করে রাগসংখ্যা লিখেছেন ত্রিশ এবং তার মধ্যে আটটিকে করেছেন প্রধান। 'শৃঙ্গারশেখর' যেখানে আটটি রাগের নাম করেছেন ভৈরব,

শ্রী, মালব, বসন্ত, নাটক, বঙ্গাল ভূপাল ও পলমঞ্জরী বা ফলমঞ্জরী, সেখানে 'সঙ্গীতকৌমুদী'তে পাই ভৈরব, শ্রী, মালব, বসন্ত, ভূপতি, সারঙ্গ, ভূপাল ও পটমঞ্জরী। তার মধ্যে ভূপতি নামটি যেন সন্দেহজনক, লিপিকার-প্রমাদপুষ্ট। রাগিণীব মধ্যেও আমরা দক্ষিণী নীলাধরী, ভৌলী, মেঘরঞ্জী ইত্যাদিকে খুঁজে পাই— অবশ্য দক্ষিণী বলতে আমরা আন্ধ্র বোঝাতে চাচ্ছি।

'দাক্ষিণাত্য নিবন্ধ রাগবিবেকে'র গ্রন্থাকার অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি রাগরাগিণী বিভাগে 'শৃঙ্গারশেখর'কে পুরাপুরী অনুকরণ করেছেন।

আমরা ১৮শ শতাব্দের গ্রন্থে ঐ দুটি গ্রন্থের উল্লেখ পাই, তার আগে পাই না, অতএব ধরে নিতে পারি যে, 'সঙ্গীতকৌমুদী' ও 'দাক্ষিণাত্য নিবন্ধ রাগবিবেকে'র লেখকরা ১৬শ শতকের মাঝের দিকে বর্তমান ছিলেন, কারণ তার পরে থাকলে রামামাত্য প্রভৃতির প্রভাব এঁদের উপর কিছুটা পড়ত।

লক্ষ্মীনারায়ণকে আমরা তবু কিছুটা জানি। ইনি বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় ছিলেন এবং 'সঙ্গীতসূর্যোদয়' নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ গ্রহণ করে 'মতঙ্গ-ভরত' নাম দেওয়া পর্যন্ত হয়েছিল। সূর্যোদযের তালভাগ ও নৃত্যভাগ বিশদভাবে রচিত হয়েছিল, যেজন্য এর আর-এক নাম ছিল 'লক্ষ্মণ-ভরত'। লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম বিঠ্ঠল। এই বিঠ্ঠল নাকি 'সঙ্গীতরত্নাকরে'র তেলগু টীকা লিখেছিলেন। অন্যদিকে দেখছি, সিংহণার্যের পৌত্র বিঠ্ঠল তেলগু ভাষায় সঙ্গীতরত্নাকরের টীকা লিখেছেন। সিংহণার্যও বিজয়নগরে থাকতেন। তা হলে লক্ষ্মীনারায়ণের পিতাই কি সিংহণার্যের পৌত্র বিঠ্ঠল? লক্ষ্মীনারায়ণ ১৪৮০ থেকে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

১৫শ শতাব্দের বিবরণ এইখানেই শেষ হত, কিন্তু বিবরণের মাঝে ছোটো ছোটো ফাঁক রয়ে গিয়েছে যা ভরাট না হলে বিবরণ অনুমানাত্মক হয়ে পড়ে। লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে বৈজু তানসেন প্রভৃতি গায়করা তাঁদের গানে হনুমানমত, ভরতমত এমন কি কল্লিনাথমতেরও উল্লেখ করেছেন। বৈজুর গান দেখুন—

ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্র চাহ্যো হনুমান কিংবা ভরত ভাখ্যো।

কিংবা

অংস গ্রহন্যাস বিকৃত দ্বাদস ভেদসো
ভরত সঙ্গীত হনুমত জতাবৈ।...

আবার, তানসেনের গান দেখুন—

ব্রহ্মা বেদ উচরায়ৌ সারঙ্গ বৌরায়ৌ

ভরত মত কল্লিনাথ হনুমত মত সপ্তাধ্যায গায়ৌ ॥

এ অবস্থায় ভরত ও কল্লিনাথকে কোন্ শতাব্দে গণনা করব ?

১৬শ শতকে হনুমানের মতকে আমরা অবুল ফজলের আইন-এ-অকবরীতে পাচ্ছি। ১৭শ শতক থেকে ভরতকে খুঁজে পাই। তা হলে ভরত বা কল্লিনাথ ১৬শ শতকের আগে কি করে আসেন? আমাদের অনুমান এই যে, ভরত ও কল্লিনাথের মত গড়ে উঠেছিল ১৫শ খৃষ্টাব্দে, ব্রহ্মা শিব ইত্যাদি মতের অনুকরণে। তখন সন্তানাদির প্রশ্ন ওঠে নি। ১৬শ শতাব্দে পুত্র ইত্যাদি রাগিণীর সঙ্গে গণ্য হতে আরম্ভ করল, ফলে মতগুলিতে নবীনতা প্রকাশ পেল, ঐ মতগুলিকে প্রাচীনতব বলে বিবেচনা করা কষ্টকল্পনা হয়ে দাঁড়াল।

চতুর্থ অধ্যায়

ষোড়শ খৃষ্টশতক হল পরিবর্তনের যুগ। এই শতকে একদিকে প্রাচীন নবীন রূপ নিল, রাগরাগিণী তাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করল। নূতন সংকীর্ণ রাগ গুলির আধিপত্য বৃদ্ধি পেল, মুস্‌লীম প্রাধান্য প্রকট হল। অন্যদিকে শাস্ত্রজ্ঞান কমতে থাকল। নিরক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য শাস্ত্রচর্চাও উপেক্ষিত হতে থাকল।

এই শতকেই রাজা মানের ধুরপদ নানা স্থানে প্রচার লাভ করল। প্রাচীন ধ্রুব নূতন পরিবেশে অজ্ঞাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ও গোপাললাল বৈজু হরিদাস প্রভৃতির প্রচেষ্টায় পরিবর্তিত রূপ নিল। বকষু, মজ্‌ঝু এবং অন্যান্যেরা এই ধ্রুব প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য রাজা মানের ধুরপদে প্রয়োগ করতে লাগলেন, প্রাচীন রাগরূপের সামান্য পরিবর্তন সাধন করে নিজনামে বা পালকের নামে সেই রাগগুলিকে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। এই সমস্ত কিছু পরিবর্তন তানসেনের মধ্যে এসে একটি নির্ধারিত আদর্শের রূপ নিল— যা আজও মূলতঃ অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাঁরা এই পরিবর্তনকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে প্রাচীন শাস্ত্রকে নূতন করে লোকের চক্ষে ধরবার চেষ্টা করলেন, কেউ-বা একটা সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা খুঁজতে লাগলেন, অপর দু-একজন পরিবর্তনকে শাস্ত্রসম্মত করবার চেষ্টা করলেন। ভক্তিবাদী সম্প্রদায়গুলিও তাদের ধর্ম অনুসরণ করে চলল, তবে একালে তাদের প্রভাব যেন কিছুটা কমে গেল। দক্ষিণভারত এই সময়ে সঙ্গীতে প্রাধান্য প্রকাশ করতে থাকল, অন্তত শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় সে উত্তর ভারতকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

বাবরের সময়ে আমরা যে যে গায়ককে পাই তাঁরা হলেন রামদাস, সুরদাস, চরজু, তানসেন প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকের জীবনীই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি, শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। রামদাসের সম্বন্ধে বলতে গেলেও সেই অনুমানই নির্ভরের স্থল।

রামদাস

রামদাসকে রামদাস মুণ্ডিয়া নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। ইনি গ্বলিয়রের অধিবাসী ছিলেন এবং মনে হয় ১৪৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর

শিক্ষা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, রামদাস গ্বলিয়রেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং বহুকাল গ্বলিয়রেই ছিলেন। এঁর নামের পূর্বে বাবা শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়— মনে হয়, এঁর নিজস্ব শিষ্যমণ্ডলী ছিল যাদের ধর্মগুরু ছিলেন ইনি। রামদাস যে সন্ন্যাসী ছিলেন না তা তাঁর দরবারে অবস্থান থেকেই বোঝা যায় এবং অর্থসঞ্চয়ের পরিমাণ দেখে অনুমান করা যায়। তা ছাড়া, তাঁর নায়ক উপাধিও সন্ন্যাসীজীবনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রামদাস প্রথম জীবনে কোথায় ছিলেন জানা যায় না, তাঁকে হঠাৎ দেখতে পাই ইস্‌লাম শার দরবারে। শের শার পুত্র ইস্‌লাম শা তখন দিল্লীর অধিপতি। তারপর তাঁকে দেখা যায় বৈরাম খাঁর কাছে। বৈরাম খাঁ যখন ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করেন তখনও নাকি রামদাস সঙ্গে ছিলেন এবং বদাউনীর মতে বৈরাম খাঁকে একলক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তারপরে আমরা রামদাসকে অকবরের সভায় দেখি। সেখানে তাঁর স্থান ছিল তানসেনের পরেই। নায়ক উপাধি তিনি কোথায় অর্জন করেছিলেন জানি না, তবে তিনি যে উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন তা আমরা জগন্নাথ কবিরায়ের গান থেকেই পাই— "রামদাস জমু পাযৌ"। এঁর মৃত্যুর দিনক্ষণ জানা যায় না। রামদাসকে আমরা চিনি তাঁর রচিত রামদাসী মল্লার ও রামদাসী সারং-এর জন্য।—

এঁডি এঁডি ডোলে বৃজনাগরী
মদমাতী ডোলে সুন্দর।
বাজত বীণ মৃদঙ্গ ঝাঁঝ ডফ
নিরত রাধাগোরী অপন মন্দর॥

কিংবা

কেতেক দূর হৈ জো মথুরানগর
কন্‌হাই পরদেস কিয়ো।

ইত্যাদি রামদাস-রচিত গান ধ্রুপদীয়াদের অতি প্রিয়। মল্লারে বিকৃত গান্ধার ব্যবহার কে যে প্রবর্তন করেছিলেন জানি না। কিন্তু তার রূপ পরিবর্তনের মধ্য-কালীন অবস্থা আমরা রামদাসীতে পাই।

সুরদাস

সুরদাসের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গানে আর অবুল ফজলের গ্রন্থে। তিনি বাবা রামদাসের পুত্র এবং অকবরের দরবারে গায়ক হিসাবে গণ্য ছিলেন এইটুকুই আমরা ঐতিহাসিক তথ্যরূপে জানি; আর যা-কিছু সবই জনশ্রুতি

বা মৌখিক বৃত্তান্ত। সুরদাস কয়েকটি রাগ উদ্‌ভাবন করেছিলেন এ কথা আমরা রাগনাম দেখে ঠিক করি বা গুরুর মুখে শুনি, কিন্তু সুরদাস-রচিত ঐ রাগের গান খুঁজতে গেলে মুশ্‌কিলে পড়তে হয়। শুধু তাই নয়, রামদাস সুরদাস প্রভৃতির নামসংশ্লিষ্ট রাগের রূপও আমরা নানাজনের কাছে নানা রকম দেখি। খুব সম্ভব তানসেনের প্রভাবে এঁদের সৃষ্টি অবহেলার বস্তু হয়ে পড়েছে। তবু শুনলে আশ্চর্য লাগবে যে, রামদাস ও সুরদাসের উদ্ভাবিত রাগগুলি সেনীঘরে গাওয়া হয়ে থাকে— কি পুত্রের বংশে, কি কন্যার বংশে।

সুরদাসের সৃষ্ট বলে যে রাগগুলি প্রচারিত আছে সেগুলি হল সুরদাসী মল্লার, সুরদাসী সারং ও সুরদাসী পটমঞ্জরী। সব কটি রাগেরই স্বকীয় বিশিষ্টতা আছে এ কথা মানতেই হবে, তবে প্রাচীন ও প্রকৃত রূপগুলি পেলে বলা যায় এই সৃষ্টির পিছনে সুরদাসের উদ্ভাবনী প্রতিভা কতটা কাজ করেছে। একটা অদ্ভুত ঝোঁক ঐ সময়ে সকলের মধ্যে দেখা যায়। সেটা হচ্ছে মল্লার রাগটিকে নানাভাবে প্রকাশ করা ; কেন যে এই ঝোঁক এসেছিল তার কারণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। সুরদাসের যে দু-একটা গান পাই, তার কাব্যমূল্য বা ভাবসম্পদ সাধারণ এবং ঐ সাধারণত্ব দিয়েই রামদাসপুত্র সুরদাসকে চেনা যায়। যথা—

পাতি হরজুকে হাথ হিদিজে
রাত হি দিজে হো।
সমঝ বুঝ বাতেঁ চলৈয়ো
কহিও ঠাকুর সোঁ ॥…

কিন্তু বিপদ হল এই, যে গান আমরা সুরদাসের বলে গাই, 'তা হয় সুরদাস স্বামীর, না হয় সুরদাস মদনমোহনের— পরবর্তীকালে সুরসংযোজনা করা গান। অর্থাৎ এটা সত্য যে গায়ক সুরদাস লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন বহুকাল আগে।

এমনি ভাবে লুপ্ত আরও অনেকেই হয়েছেন, শুধু অল্প কয়েকজনের নাম অকবরের সভায় খুঁজে পাওয়া যায় ; কিন্তু নাম পর্যন্তই, পরিচয় নেই। অকবরের দরবারে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সংখ্যায় কত ছিলেন তা নির্ভুলভাবে জানা দুরূহ। অবুল ফজল তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট বলে যে কটি নাম উল্লেখ করেছেন সে কটি মিলে সংখ্যায় দাঁড়ায় ছত্রিশ। নামগুলি হল :

তানসেন, রামদাস, সুরদাস, চরজু, রাগসেন, চাঁদ খাঁ, মিয়াঁলাল, সরোদ খাঁ, সুভান খাঁ, বিচিত্র খাঁ, শ্রীজ্ঞান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বাজ বহাদুর, তানতরঙ্গ, পরবীন খাঁ, সুলতান হাফিজ হুসেন, হাফিজ খাজা অলী, রহমৎ উল্লা, মহম্মদ খাঁ,

ধাডী, দাউদ ধাডী, মোল্লা ইশাক ধাডী, পীরজাদা, বীরমণ্ডল খাঁ, শিহাব খাঁ, কাসিম, তাশ বেগ, মীর অবদুল্লা, উস্তা দোস্ত, শেল দাবন ধাড়ী, উস্তা ইয়ুসুফ্, সুলতান হাশিম, উস্তা মহম্মদ অমীন, উস্তা মহম্মদ হুসেন, উস্তা শা মহম্মদ, বয়রাম কুলী ও মীব সৈয়দ অলী।

মহম্মদ কবম ইমাম্ আরও কযেকজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম উল্লেখ করেছেন, যথা শ্রীচন্দ, বৃজচন্দ, সমোখন সিং, ধুন্ধী, সুরত সেন, বিলাস খাঁ, সুরজ খাঁ, মদন রায় লালা, দেবী ব্রাহ্মণ, বাকর খাঁ, আকিল, খিজব খাঁ, নবাৎ খাঁ, হসন্ খাঁ সোনবাজপেই, এবং মীরা মধনায়ক। এ ছাডা চঞ্চল সেনেব নামও করেছেন, কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে ছিলেন তা জানান নি। অনুমানে তাঁকে অকবরের সময়ে ধরে নেওয়া যায়। এঁরা ছাড়া আবদব বহীম খান্-খানানের দরবারে দেখা যায় আগা মহম্মদ নাঈ, মৌলানা অকবাতী উস্তা মীর্জা অলী ফতগী, মৌলানা শরফ, মহম্মদ মুমীন এবং হাফিজ নজরকে।

দুঃখের কথা যে, এতগুলি নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শুধু জন্মস্থান অমুক স্থানে, অমুকেব বংশ ইত্যাদি সামান্য দু-একটি সংবাদ ছাডা আর-কিছু জানা যায় না। কাজেই এই জীবনী সম্বন্ধে এরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান তেমন কাজে লাগে না, শুধু ধারণা করে নেওয়া যায় যে, অকবরের সময়ে গ্বলিযর ধ্রুপদ ও যন্ত্রসঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং সেখানে হিন্দু 'সঙ্গীতজ্ঞ' ব্যক্তিরাই শিক্ষকতা করতেন। গ্বলিয়রের এই পরিবেশে যে সকল মুসলমান গুণী বাস করতেন তাঁরা অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পডতেন। অন্য দিকে আর-একটি সংবাদ সংগ্রহ করা যায়; সেটা হচ্ছে এই যে, তখন সঙ্গীতে মুসলমানদের সংখ্যা ও প্রভাব ক্রমেই বেডে চলেছিল। যাই হোক, লক্ষণীয় যে এত গুণীর মধ্যে আমরা জানি শুধু তানসেন আর তাঁর পুত্রদের। নায়ক চরজুর গান আমরা গাই, সৃষ্ট রাগেরও চর্চা করি, কিন্তু তাঁকে চিনি না। গ্বলিয়রবাসী চরজু কবে জন্মালেন, কি ভাবে নায়ক হলেন, কিছুই জানি না। তাঁর পুত্রের নাম যে প্রবীণ খাঁ তাও জানলাম অবুল ফজলের কৃপায়, তিনি যে বীণাবাদনে দক্ষ তাও পড়লাম অবুল ফজলেরই গ্রন্থে। আমাদের সঙ্গীতগুরুরা শুধু বলে দিলেন যে, চরজুর উদ্ভাবিত একটি মল্লার আছে আর ঐ সুরে রচিত দু-একখানি গান আছে। একখানি গান দেখুন—

আলিরি দেখেহি রহিয়ে মোহন
পীতম পৈ কহাঁ চড়রহি রা মোহে।...

সুভান খাঁর পরিচয় জানি না, একখানি গান জানি—

পটতাল নীকো তাল...
শাহ অকবরকো রিঝাবত পটতাল,
রসলাবন ঔর ভেদ উপজাবন।
কহত সুভান সুনহো সব গুণীয়ন...

মহম্মদ করম ইমাম্ শ্রীচন্দ, বৃজচন্দের নাম উল্লেখ করেছেন এবং ১৯শ শতক পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্ক টেনেছেন। এই সম্পর্ক বিশ্বাসযোগ্য হত যদি না তিনি এক জায়গায় বলতেন, যে এঁরাই মুসলমান হয়ে চাঁদ খাঁ হয়েছিলেন। অন্য আর-এক জায়গায় তিনি চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁকে খ্যালী আখ্যা দিয়েছেন। এই সব পরস্পরবিরোধী বিবরণ দিয়ে করম ইমাম্ যে কী প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেটাই বোঝা যায় না। শ্রীচন্দ, বৃজচন্দ দুটি বিখ্যাত বাণীর প্রবর্তক অথচ তাঁদের নাম অবুলফজলের গ্রন্থে পাওয়া যায় না কেন? রামদাস, চরজুর নাম তো রয়েছে! সুরজ খাঁর নামই বা পাওয়া যায় না কেন? অথচ এই চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁর জন্য হিন্দুদেরও কী নিদারুণ মাথাব্যথা! তাঁরা এঁদের দিবাকর ও সোমনাথ নামে অভিহিত করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। আসল কথা, এঁরা কেউই উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন না। তা হলে নিশ্চয়ই অবুল ফজল এঁদের নাম করতেন। মদন রায়, সমোখন সিং বা মিশ্রী সিং-এর নামও এই কারণে বাদ পড়েছে। আর বাদ পড়েছে নবরত্নের বেশীর ভাগ রত্নেরা। অকবর বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে নবরত্নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাতে ছিলেন তানসেন, মানসিং, ফৈজী, অবুলফজল, টোডরমল, ফেরিস্তা, বদায়ু, খান্-খানান ও বীরবল। কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তিরা সেই জায়গায় সঙ্গীতজ্ঞদের নবরত্নসভা ভেবে নিলেন, নিয়ে কতকগুলি নাম আমদানি করলেন। তাঁদের অকবরের রাজত্বকালে খুঁজে পাওয়া যায় না, কিংবা পেলেও রত্ন হবার মতো গুণ তাঁদের মধ্যে অবিষ্কার করা সম্ভব হয় না।

মসনদ অলী খাঁ, মীয়াঁ খুদাবকষ্, দরিয়া খাঁ, মামুদ খাঁ, খাণ্ডেরাও সম্বন্ধে কোথাও উচ্চবাক্য নেই, অথচ তাঁরা রত্ন! এই নবরত্নকাহিনী প্রমাণ করবার জন্য গানের উল্লেখও করা হয়, কিন্তু সে গানেও আটজন সঙ্গীতজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। একখানি গানে সকলের নাম নেই, পৃথক পৃথক্ গানে এক-একজনের নাম আছে, তা এমন ভাবে যাতে বোঝাই যায় না এই গুণীরা কোন্ শ্রেণীর। তা ছাড়া এঁদের পরিচয়ও কেউ জানেন না, যখন অন্য ব্যক্তিদের সামান্য পরিচয় কোথাও-না-কোথাও পাওয়া যায়। আমরা জানি, সুভান খাঁ ও তাঁর ভাই বিচিত্র খাঁ, শ্রীজ্ঞান খাঁ, মীয়াঁ চাঁদ, শিহাব খাঁ, সরোদ খাঁ, মীয়াঁ লাল, নায়ক চরজু, চাঁদ খাঁ প্রভৃতি

গ্বলিয়রের অধিবাসী ছিলেন; জানি, আগ্রায় ছিলেন রঙ্গসেন, বাজ বাহাদুর ছিলেন মালবের রাজা। অন্ততপক্ষে গ্বলিয়র আগ্রা ইত্যাদি স্থানের ধ্রুপদ-ঘরানা সম্পর্কে একটা ধারণা তো আমরা তৈরি করে নিতে পারি। তা হলে তানসেন সম্বন্ধে আলোচনা করতে সুবিধাও হয়।

তানসেন

তানসেন গ্বলিয়র-বাসী মকরন্দ পাণ্ডের পুত্র। বিভিন্ন জনশ্রুতি প্রমাণ করবার জন্য বিভিন্নজনে তাঁর নানা সামঞ্জস্যহীন জন্মের তারিখ দিয়েছেন। কেউ বলেছেন ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ, কেউ-বা বলেছেন ১৫০৬, অপরে ১৫২০, শিবসিংহ সরোজে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে। কোন্ তারিখটি ঠিক তা বিচার করতে গিয়ে দেখা গেছে ফজল অলীর 'কুল্লিয়াৎ-গ্বালিয়র' অনুসারে তানসেন তাঁর উপাধিটি পেয়েছিলেন গ্বলিযর রাজ বিক্রমজিতের দরবারে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী সময়ে। এই উপাধি পেতে গেলে তানসেনকে ১৪৯৩ বা তারও আগে জন্মাতে হয়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, কুল্লিয়াৎকে বিশ্বাস করতে গেলে মানরাজার প্রশংসাসূচক গানখানিকেও বিশ্বাস করতে হয়, যাতে আছে—

ছত্রপতি মান রাজা তুম চিরঞ্জীব রহো,
জোলোঁ ধ্রুব মেরু তারো…

এই গানটির শেষ চরণে লেখা আছে—

দেত করোরন গুনীজনকো অজাচক কিয়ে
তানসেন প্রতিপারো।

তা থেকে অবাক হয়ে ভাবতে হয়— বিক্রমজিতের কাছে যদি "তানসেন" উপাধি মিলে থাকে, তা হলে কি মৃত রাজা মানকে সম্বোধন করে তানসেন গান লিখেছিলেন? কারণ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দেই তো রাজা মান মৃত। অন্যদিকে অবুল ফজল বলছেন যে, তানসেন যখন অকবরের সভায় আসেন তার আগেই নাকি তিনি সঙ্গীতজগৎ থেকে অবসর নেবার কথা ভাবছিলেন; অতএব ধরে নেওয়া যায় যে সে সময়ে তানসেনের বয়স সত্তর বৎসর। কাজেই তাঁর জন্ম সময় ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ। আমরা কিন্তু তানসেনের-অকবরের প্রশংসাসূচক গানের বহর দেখে মোটেই মনে করতে পারছি না যে তানসেন এই সময়ে বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তৃতীয় কথা হল, অকবরের সভায় তানসেনের পুত্র তানতরঙ্গ যখন বয়স্ক তখন তানসেনের বয়স ঐ সময়ে সত্তরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। যদি ধরে নিই যে, তানসেন অল্প বয়সে

বিবাহ করেছিলেন তা হলে তো তৃতীয় কথাটির খুব দাম থাকে না। তা ছাড়া, তানসেন অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন এটা স্বতঃসিদ্ধ, কারণ তা না হলে অকবরের সভায় তানসেনের প্রায় সব কয়টি সন্তানই প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞরূপে খ্যাতিলাভ করতে পারতেন না।

আরও একটি ভাববার বিষয় আছে। তানসেনের কালে কন্যাদের অল্প বয়সে বিবাহ হত। অকবরের রাজত্বকালে যদি তানসেনের কন্যার সঙ্গে নবাৎ খাঁর বিবাহ হয়ে থাকে, তা হলে হয় তানসেনের বয়স কিছু অল্প করতে হয় অথবা তানসেনের একাধিক বিবাহ স্বীকার করতে হয়। শেষ কথা, রাজা মানের মৃত্যুর পর গ্বলিযরে এমন এক অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছিল যে, বক্সু, মজ্‌ঝু প্রভৃতি সকলকেই স্থানত্যাগ করতে হয়েছিল। এমন অবস্থায় তানসেনের দরবারে অবস্থান মৃগনয়নীর কৃপাপাত্র হওয়া বা উপাধিগ্রহণ ব্যাপারগুলি যেন অস্বাভাবিক লাগে; মনে হয়, এ সময়ে হয় তানসেন খুব ছোটো, না হয় অন্য কোথাও বাস করেছেন।

সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করলে তানসেনের জন্ম ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে। অবুল ফজল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কিছু এধারে-ওধারে আইন-এ-অকবরী গ্রন্থ লিখেছিলেন। সে সময়ে তানসেন চৌষট্টি বৎসরের প্রৌঢ় এবং তাঁর সন্তানেরা কেউ চল্লিশ কেউ-বা আটত্রিশ এই রকম বয়সের; সুতরাং তাঁরা দরবারে গাইবার উপযুক্ত হয়েছেন। আর তানসেনের জন্ম ১৫০৬ ধরলে বিলাস খাঁর বয়স জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হয় অন্তত সত্তর বছর।

তানসেনের ব্যাপারে আর-এক বিভ্রাট বাধছে তাঁর পৈতৃক নাম নিয়ে। বহুজনের মতে তাঁর নাম ছিল রামতনু বা তন্না। এই রামতনু নাম প্রমাণ করবার চেষ্টায় পরবর্তীকালের গুণীরা গান পর্যন্ত বেঁধে ফেলেছিলেন, যাতে সন্দেহ জন্মাতে না পারে। গানের নমুনা দেখুন—

রাজা বামনিরঞ্জন গুন মণি গ্রাম
ঔর গীতকলানিপুণ দুজো ন দেখত ॥···
ধন ধন বীরভাননন্দন তুঅ গুণকী উপমা
রামতন নহী পাবত ॥

কিন্তু তবু সন্দেহ জাগে। অবুল ফজল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেউই বললেন না যে, তানসেনের পূর্বনাম বা প্রকৃত নাম রামতন। আর কোনো গান পাওয়া গেল না যাতে তানসেন ভিন্ন অন্য ভনিতা আছে। এত তত্ত্ববিদ্‌ এলেন, নাম নিয়ে সবাই বিব্রত হয়ে পড়লেন, জনশ্রুতি ছাড়া কিছুই খুঁজে পেলেন না,

ছোটোবেলাকার গানেও দেখলেন সেই তানসেন-যুক্ত ভনিতাই রয়েছে। আমরাও ঐটাই আশা করেছি, কারণ তানসেনের অন্য কোনো নাম সৃষ্টি করবার কারণ আমরা খুঁজে পাই নি। আমরা দেখেছি ঐ অকবরের যুগেই রঙ্গসেন আছেন, চঞ্চল সেন আছেন, অথচ ঐ নামগুলি পৈতৃক নয়। এমন কথা কেউই বলছেন না। তা হলে তানসেনের বেলাতেই বা এত অনুমানের প্রচেষ্টা কেন? আমরা মনে করি, তানসেনের আসল নাম তানসেনই অন্য কিছু নয়— ডাকনাম কেউ কিছু অনুরূপ ভাবলে আমাদের আপত্তি নেই। আর তা না হলে বলা যেতে পারে যে, তানসেন হল এই বিরাট সঙ্গীতজ্ঞের সাঙ্গীতিক নাম, লেখক ও গায়ক রূপের পরিচিতি প্রদানকারী ছদ্মনাম।

এই নামেই তানসেন গ্বলিয়রে বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন। তারপর সেখানকারই কোনো সঙ্গীতগুরুর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, যাঁর কোনো পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু যিনি রাজা মান ও অমীর খুসরো বা সুলতান হুসেনের সঙ্গীতপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই গুরুকে মুসলমান বলেই সন্দেহ হয়, কারণ হিন্দুরা বোধ হয় তখনও অমীর খুসরোর পদ্ধতিকে সুনজরে দেখেন নি, অশাস্ত্রীয় বলে একপাশে ঠেলে রেখেছেন। এই গুরু যে পরবর্তীকালে সুফী ধর্মাবলম্বী মহম্মদ গৌস নয় তার প্রমাণ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, তবে তিনি নায়ক বক্‌সু প্রভৃতি কারও মুসলমান শিষ্য মহম্মদ গৌসের কাছে শিখে থাকতে পারেন, অনুমান হয়। এর পরে গ্বলিয়রের পতন হল ও তা দিল্লীর অংশ হল। তখন হয়তো তানসেন ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে হরিদাস গায়কের সাক্ষাৎ পেলেন এবং রেবা রাজ্যে গিয়ে তাঁর কাছে গান শিক্ষা করতে লাগলেন। হরিদাসের মৃত্যুর পর তানসেন রেবারাজের সভাগায়ক হলেন। রাজা বীরভান সিং তখন মৃত। রাজত্ব করছেন রামচন্দ্র সিং। হরিদাস গায়কের শিক্ষাতেই তানসেন ধ্রুব প্রবন্ধ অনুযায়ী ধ্রুবপদে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন, এবং নিজ গানরীতিতে দুই গুরুর নিকট শেখা দুটি পদ্ধতিকে সুন্দরভাবে মিশিয়ে নেন। আসলে তানসেনের কণ্ঠ ছিল অপূর্ব, গান-ভঙ্গী ছিল অনবদ্য, সৃজনীক্ষমতা ছিল চমকপ্রদ। তাই কার কাছে শিখেছেন, কবে ও কতদিন শিখেছেন এ প্রশ্ন কখনও ওঠে নি। যখন উঠল তখন মহম্মদ গৌসের নাম এল, যিনি অকবরের রাজত্বকালে নিতান্ত উপায়হীন হয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; হরিদাস স্বামীর নাম এল যিনি কোনোদিন বৃন্দাবনের বাইরে বার হন নি বা বাঁকেবিহারী ব্যতীত অন্য কোনো দেবতার কথা চিন্তা করেন নি, নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ করেন নি; গোবিন্দস্বামীর

নাম এল যাঁর পক্ষেও ঐ একই কথা খাটে; গোপালনায়কের বংশের একজন স্ত্রীলোকের কথা এল, যার জীবনী বিশ্বাস করাই কঠিন, যেহেতু বৈজু ও গোপালের সঙ্গীত-যুদ্ধ, গোপালের মৃত্যুদণ্ড বা দীপক গাইতে গাইতে নদীর জলে মৃত্যু এবং কন্যার পিতার অস্থি বুকে নিয়ে কাঁদা আর শেষ পর্যন্ত মুসলমানী হয়ে যাওয়া, এই গল্পের কোনো কিছুই আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করবার কারণ খুঁজে পাই না। শুনলে অবাক হতে হয় যে, এই গল্পেরই অন্য একটি বিবরণে ঐ কন্যার নাম হয়েছে মীরা এবং মহম্মদ গৌস্‌কে সেই বংশের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যদিও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে মহম্মদ গৌস্‌ ছিলেন খাঁটি মুসলমান। কোনো তথ্যানুসন্ধানী হয়তো মহম্মদ গৌসের দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থের উল্লেখ করতে পারেন, এবং বলতে পারেন যে, যিনি 'গুলজার-এ-চমন' ও 'জবাহর-উল-খমসা' রচনা করেছেন তিনি তানসেনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারবেন না কেন? উল্লেখটুকু মেনে নিয়েও আমরা বলতে পারি যে সুফীরা সাধারণ কাউকে গান শিখিয়েছেন এমন উদাহরণ আমরা পাই নি। তানসেন যে ধার্মিক ছিলেন এবং সুফীসন্তদের ভক্তি করতেন এবং গানে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এ কথা নিতান্ত সত্য এবং সেই জন্যই তাঁর গানে হিন্দু দেবদেবী, মুসলমান পীর-পয়গম্বরের অর্চনামূলক উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এই উক্তির মাঝে গৌস্‌ থাকলে সেই গৌস্‌কে কখনোই সঙ্গীতগুরু বোঝাবে না। তা ছাড়া, গৌস্‌ একজনই ছিলেন এ কথা কি নিঃসংশয়ে বলা যায়?

যাই হোক, রামচন্দ্র বাঘেলার দরবারেই তানসেনের প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং অকবর বাদশা ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নিজ দরবারে নিয়ে এলেন। আজ তানসেনের যে খ্যাতি সে খ্যাতি তিনি অকবরের সহায়তাতেই লাভ করেছিলেন। তানসেন দরবারের নবরত্নের একজন। নিত্য নূতন গান তিনি রচনা করছেন, পুরনো রাগের নূতন রূপ দিচ্ছেন, শাস্ত্রকে ভাঙছেন। 'তিত্ত' মত বলে মতের প্রতিষ্ঠা করছেন এবং 'অতাঈ' সংজ্ঞায় সম্মানিত হচ্ছেন। ঐ সময়ে অতাঈ শব্দের অর্থ ছিল 'সর্বোৎকৃষ্ট গায়ক'। কিতাব-ঈ-নওরস গ্রন্থে এই অর্থই আছে।

তানসেন রাজারামের রাজত্বে কটা আর গান লিখেছেন? তাঁর যে গান দিয়ে আমরা তাঁর গুণপণার বিচার করি, সে গান সবই অকবরের সভায় লেখা। আজ যে আলাপ, যে ধ্রুপদরীতি চলছে তার স্রষ্টাও তানসেন। তাঁর হাতেই আলাপে তুকের জন্ম হল; তাঁর প্রতিভাতেই ধ্রুপদ ধ্রুব ও ধ্রুবপদর সংযোগে নবীন রূপ নিল— ধাতু হল স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ; তাঁর প্রভাবেই রাগে

সাত স্বরের স্থলে আট, নয় স্বর ব্যবহৃত হতে থাকল, অথচ অমীর খুসরোর রীতিকে যতটা সম্ভব বর্জন করে চলার ব্যবস্থা হল ; তাঁরই সৃজনীশক্তিতে কানডা, মল্লার, সারং, কল্যাণ, টোডী নবীন রূপ গ্রহণ করে দরবারী বা মিয়াঁকী নাম ধারণ করল। এই সৃজনীশক্তির জন্য তিনি 'মীযাঁ' উপাধি পেলেন। শাস্ত্র তিনি জানতেন, কিন্তু ব্যবহারিক সঙ্গীতকে তিনি শাস্ত্রের উপরে স্থান দিতেন ; তাই তিনি নায়ক হন নি, হয়েছিলেন গুণী— যিনি গানে আনেন নূতনত্ব, চমৎকারিতা, আনেন নবীন অনুভূতি, অপূর্ব রস। শুধু গান নিয়ে তিনি থাকেন নি, রবাব যন্ত্রকে তিনি নবরূপ দিয়েছেন। আরবীয় যন্ত্রে ভারতের সুরবৈচিত্র্য প্রয়োগ করে রবাবকে যন্ত্রশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আরো একটি কাজ তিনি কবেছিলেন, সেটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর দীপক রাগকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নত করবার জন্য তাব রূপের আমূল পরিবর্তন। বৈজু, গোপালেরও দীপকের গান আছে কিন্তু সে দীপকের রূপ বা প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু তানসেনের দীপক এমন একটি রূপ নিয়েছিল যা বোধ হয় সেনী ঘরানার নিজস্ব সম্পত্তি করে নেওয়া হযেছিল, এবং দীপকের অন্য কোনো রূপের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গিযেছিল, যদিও দক্ষিণ ভাবতে প্রাচীন প্রকৃতির দীপক হয়ত ছিল। উত্তর ভারতেব এই দীপকের পরিবর্তনের জন্যই লোচন পণ্ডিতকে আক্ষেপ করে লিখতে হয়েছিল— সর্বৈর্মিলিত্বা দীপকোপি লেখ্যঃ।

তানসেন অকবরের সভায় থাকাকালীন অকবরের সম্পাদনায় 'রাগসাগর' নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না। তানসেন নিজেও 'রাগমালা' ও 'সঙ্গীতসার' নামে দুখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

এ সময়ে তানসেনের পুত্ররাও অকবরের দরবারে স্থান পেয়েছেন। এই পুত্রদের নাম পাই তানতরঙ্গ, সুরৎসেন ও বিলাস খাঁ বলে। জীবনীকাররা বলেন যে তানসেনের চার পুত্র ছিলেন— শরৎসেন, সুরৎসেন, তানতরঙ্গ ও বিলাস খাঁ। কেউ-বা তানতরঙ্গের পরিবর্তে তরঙ্গসেন বলতে চান; কিন্তু তরঙ্গসেন নাম যেন জোর করে আনা বলে মনে হয়, বিশেষত অবুল ফজল যখন তানতরঙ্গের নাম তানসেনের পুত্র বলেই করছেন।

বরঞ্চ শরৎসেনের নাম আমরা কোথাও পাই না, আর তরঙ্গসেনের গান শুধু তানতরঙ্গকে বংশ থেকে-বাদ দেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট বলে মনে হয়। এঁর একটিমাত্র গান আমরা পাই, অকবরের সভায় গাইবার জন্য যেন ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি করা। লক্ষ করবার বিষয় হল, অকবরের সভায় তানতরঙ্গ ও বিলাস খাঁর নাম রয়েছে,

সুরৎসেনের নাম পরে যোগ হয়েছে পণ্ডিত হিসাবে, কিন্তু জহাঙ্গীরের সভায় এসে তানতরঙ্গ ও সুরৎসেন দুজনেই যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে পরে আবার আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে তানসেনের গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে এই ধরণের পক্ষপাতিত্বের বোধ হয় যোগ আছে। শোনা যায় তানসেন প্রেমকুমারী নামক এক হুসেনী ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং সেই জন্যই নাকি তাঁকে মুসলমান হতে হয়েছিল। আমরা যতদূর জানি, হুসেনী ব্রাহ্মণ বলতে সেই হিন্দুদের বোঝায় যাঁরা কোনো মুস্‌লীম সন্তের মন্ত্রশিষ্য হন। অতএব তাঁরা জাতিচ্যুত হন না, তবে না-হিন্দু না-মুসলমান অবস্থায় থাকেন। মনে হয়, তানসেনও সেই পর্যায়ের ছিলেন। কিন্তু তার পরেই গণ্ডগোল বাধছে; সুরৎসেন, শরৎসেনের নাম উল্লেখের শেষে হঠাৎ বিলাস খাঁ আসছে কেন? (যাঁরা তরঙ্গসেনকে স্বীকার করেন তাঁদের এই নামটির বেলাতেও কোনো অসুবিধা হয় না)। বিলাস খাঁকে বিলাসসেন করার চেষ্টা বৃথা, কারণ জীবনীতে, গানে সর্বত্রই ঐ বিলাস খাঁ। শুধু তাই নয়, সকলকে ডিঙিয়ে ঐ বিলাস খাঁ জহাঙ্গীরের সভায় প্রধান গায়ক হয়ে বসলেন। মনে হয় না কি যে মুসলমান ব'লেই এই সুযোগ তিনি পেলেন? অনুমান করা যায় না কি যে, যাঁর নাম তানতরঙ্গের অনেক পরে এসেছিল তিনি মুস্‌লিম মাতার সন্তান ছিলেন বলেই হঠাৎ এমন ভাবে এগিয়ে যেতে পারলেন? বিলাস খাঁ যে মুস্‌লীম হন নি, তার প্রমাণ তাঁর পুত্র উদয়সেন, দয়ালসেনের নামে। আর-একটি কথা। তানসেনের কন্যার নাম সরস্বতী। তাঁর বিবাহ হল নবাৎ খাঁর সঙ্গে, কোনো হিন্দুর সঙ্গে নয়। ভাবলে মনে হয় না কী যে, এ ক্ষেত্রেও কোথায় যেন মুস্‌লীম ভাব একটু রয়েছে? অবশ্য সবই অনুমান; সেনী বংশও অন্যপ্রকার বলে থাকেন; তবু সন্দেহ জাগে যে, বোধ হয় তানসেনের একাধিক স্ত্রী ছিলেন। এইবার তানতরঙ্গের কথায় আসি। অবুল ফজল একেও তানতরঙ্গ খাঁ বলতে চেয়েছেন; কিন্তু আমরা কোথাও এঁকে খাঁ রূপে দেখি নি। গান লিখেছেন শুধু তানতরঙ্গ। বংশের পরিচয় দিয়েছেন 'সেন' ব'লে, এমন-কি যখন বিলাস খাঁর বংশের প্রত্যেকে খাঁ তখন এই শ' খানেক বছর আগেও রহিমসেন ও অমৃতসেন নাম চলেছে। অনেকে এঁকে শিষ্য বলে তানতরল নামে চালাতে চেয়েছেন কিন্তু নাম টেঁকে নি। সুতরাং তানতরঙ্গ ঐ হুসেনী রক্তেরই সন্তান বলে মনে হয়।

এই সন্তানের পিতা তানসেন ছিলেন সত্যিকারের একজন কবি। নিজ প্রতিষ্ঠা বাঁচাবার জন্য তদানীন্তন রাজকীয় নিয়মরক্ষার জন্য হয়ত তিনি অকবরের

অতিরিক্ত তোষামোদী করেছেন, কিন্তু সেইটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। ধ্রুব প্রবন্ধে যত প্রকার ধাতুর ব্যবহার আছে, যে কটি অঙ্গ আছে, কোনো কিছুই বর্জন না করে একদিকে যেমন তানসেন প্রাচীন রীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানবিক প্রেম ও মানসিক ভাবকে রসাত্মক ভাষায় প্রকাশ করে তেমনই তিনি কাব্যগীতির অপরূপত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মনে রাখতে হবে গানে স্বর প্রধান, সুতরাং ভাষা সেখানে বাহনের কাজ করেছে। কিন্তু সেই বাধাকে অতিক্রম করে সে যে অনুপম রূপ প্রকট করেছে তা একজন উচ্চস্তরের কবির পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব। তানসেনের গানের মধ্যে দেবতা ও সূফীসন্তদের বন্দনা আছে, রাজপ্রশংসা আছে, নাদের বিভিন্ন প্রকাশ সম্পর্কে মতামত আছে, রাগরাগিণী সম্বন্ধে আলোচনা আছে, নায়িকা-ভেদ সম্বন্ধে বিবেচনা ও নায়িকার বর্ণনা আছে, কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ আছে এবং মানবিক গুণাগুণ ও ঋতু ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এইসব গানের পদ বহু প্রকার রাগেই তানসেন গেয়েছেন। শোনা যায়, অকবর বাদশা ভৈরব এবং কানড়া অন্য কোনো গুণীর মুখে শুনতেন না। ফলে ভৈরব মীয়াঁকা ভৈরব আর কানড়া দরবারী কানড়া নামে পরিচিত হয়ে পড়েছিল, যে জন্য ভাবভট্টকে পরবর্তীকালে লিখতে হয়েছিল— জো দরবারী সো শুদ্ধ কহাবে। তানসেনের নামে যে রাগগুলি চলে সেগুলি হল দরবারী কানড়া, দরবারী কল্যাণ, দরবারী আসাবরী, শহানা, মীয়াঁকী মল্লার, মীয়াঁকী সারং, মীয়াঁকী টোড়ী, মীয়াঁকী জয়জয়ন্তী। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তানসেন দেহত্যাগ করেন।

জহাঙ্গীর বাদশা তাঁর 'তুজুক-ই জহাঙ্গীরী'তে একজন তানসেন কলাবন্তের বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না, শুধু ইনি যে সাধুপ্রকৃতির ছিলেন এবং ভজন গান গাইতেন সে কথাটা জানা যায়। তানসেনের প্রায় সমসময়ে আর-একজন তানসেনের উপস্থিতি রহস্যময়।

তানসেনের বহু গানে অকবরের গুণপনার প্রশংসা আছে, যেমন— অরব খরব কর দিখায়ে, সুর মিলায়ে, কণ্ঠ মিলায়ে, অকবর পরখ পায়ে। এই প্রশংসা যে নিতান্ত অমূলক তা নয়। অকবর সঙ্গীতের চর্চা যে করতেন তার প্রমাণ আছে। তিনি যে সাঙ্গীতিক আলোচনায় যোগদান করতেন এবং নিজে নক্কাড়া বাজাতে পারতেন তাও জানা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল, যেজন্য 'রাগসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করবার পরও তিনি দক্ষিণী

পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিঠ্‌ঠলকে নূতনভাবে শাস্ত্র উদ্ধার করতে বললেন। অমীর খুসরো -প্রবর্তিত ও সুলতান শর্কী -দ্বারা পরিমার্জিত খ্যাল তখন চলছে, যার প্রমাণ পাওয়া যাবে তুজুক-ই-জহাঙ্গিরীতে "নওরসী" গানগুলির সমালোচনা প্রসঙ্গে; অকবর নিজ দরবারে সেই গানকে কোনো কৌলীন্য দেন নি, ভারতীয় শুদ্ধ সঙ্গীত ধ্রুপদকে দিয়েছেন অকুণ্ঠ মর্যাদা। বস্তুত অকবরের মতো দু-একজন শাসকের জন্যেই হিন্দুসঙ্গীত বহুকাল পর্যন্ত সগৌরবে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিল।

অল্লাউদ্দীন খল্‌জীর মতো আর দু-একজন শাসক এলে অকবর পর্যন্তও হিন্দুসঙ্গীত বেঁচে থাকত কিনা সন্দেহ। অবশ্য খল্‌জীর মতো অপকার না করলেও অকবর অন্যভাবে কিছু অপকার যে আমাদের করেন নি তা নয়। তিনি যেমন অতি সূক্ষ্মভাবে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের উচ্চপদ দিয়ে একটু একটু করে মুস্‌লীম ভাবাপন্ন করে আনছিলেন, যাতে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের বংশধররা শুধু উচ্চপদের লোভে মুসলমান হয়ে যান, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও মুস্‌লীম ভাবাপন্ন তানসেন প্রভৃতিকে উচ্চ সম্মান ও অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে অবস্থায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলমান হয়ে যেতে প্রলুব্ধ, এমন-কি বাধ্য হন। এঁদের সন্তানেরা তো ঐ সুযোগ-সুবিধার জন্য লালায়িত থাকবেনই। তাই আমরা দেখি, সম্রাট অকবরের সভায় হিন্দুগুণীর সংখ্যা যখন যথেষ্ট, জহাঙ্গীর বাদশার দরবারে তখন হিন্দুগুণীর সংখ্যা অতি নগণ্য —তাঁদের সন্তানরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই সামান্য ত্রুটি বাদ দিলে মধ্যযুগের ইতিহাসে ঐ যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে হিন্দুসঙ্গীতকে শুধু বাঁচানো নয়, নূতন জীবন নূতন গতি দিয়ে গিয়েছিলেন অকবর বাদশা, তাঁর ১৫৪২ থেকে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ এই ৬৩ বৎসর জীবিতকালের মধ্যে। এই কালের মধ্যে যাঁদের কিছুটা চিনি তাঁরা হলেন বাজবহাদুর, নবাৎ খাঁ, তানতরঙ্গ, সুরৎসেন, বিলাস খাঁ ও ইব্রাহিম আদিল শা।

বাজবহাদুর

বাজবহাদুর সঙ্গীতজগতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিন্তু এঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এঁর প্রকৃত নাম ছিল "মালিক বায়াজিদ্", পিতার নাম ছিল শুজাৎ খাঁ। বাজবহাদুর বোধ হয় ১৫২৫ থেকে ১৫৩০এর মধ্যে জন্মে-

ছিলেন, তবে কোথায় জন্মেছিলেন অজ্ঞাত। গুজরাটের সুলতান বহাদুর শা হুমায়ুন বাদশার নিকট পরাজিত হলে মালবে মল্লু খাঁকে নবাবরূপে দেখা যায়, পরে কুতুব খাঁকেও পাওয়া যায়; তারপর মালব ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে শের শাহ-কর্তৃক অধিকৃত হয়। এর পরে মালবের শাসনকর্তা হন শুজাৎ খাঁ বা সুজায়াৎ খাঁ। এই পাঠান সুজায়াৎ খাঁর পুত্র হলেন বাজবহাদুর।

বাজবহাদুর বোধ হয় ১৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে মালবের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি কার কাছে সঙ্গীত শিখেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর গানে রাজা মানের সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব তাঁর পত্নী রূপমতীর গানের ভাষায় তালে ও ভাবেও বর্তমান আছে। এই প্রকৃতির গানের জন্য বাজবহাদুরকে খ্যালগায়ক বলা হয়। আসলে কিন্তু এ গানরীতি ধ্রুপদেরই। আর বাজবহাদুর আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গান করে ঐ রীতিকে বাজখাঁনী রীতি নামে পরিচিত করিয়েছিলেন, যা শুনে অবুল ফজল লিখেছিলেন, "এঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই।" রাজা মানের গান-পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর, অবুল ফজল এই কথাই বলতেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করতেন। মহম্মদ করম ইমাম বাজবহাদুরকে শাস্ত্রপ্রবীণও বলেছিলেন।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আধম খাঁ রূপমতীর রূপ ও গুণের কথা শুনে তাঁকে লাভ করবার দুরাশায় মালব আক্রমণ করেন। ফলে রূপমতীকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে অপমানের হাত থেকে বাঁচতে হয়। সুতরাং কোনো কোনো গ্রন্থে যে জনশ্রুতি প্রচারিত আছে, বাজবহাদুর দীপক গান করে পুড়ে মরছেন আর রূপমতী বিলাপ করছেন, সে জনশ্রুতি নিতান্তই কষ্টকল্পনা। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাজবহাদুর অকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁর সভাসদ মধ্যে পরিগণিত হন। বাজবহাদুরের মৃত্যুর সময় জানা সম্ভব হয় নি।

বাজবহাদুরের রচিত গানের সংখ্যা কত জানি না, আমরা দু-একখানি পেয়েছি। নট রাগে রূপমতীরও গান পেয়েছি—

জোবন জাত দিয়ে দগা।
ওর রঙ্গন কি কহা কহুঁ তোসো
জৈসী কুসুমকী রংগা ॥…
ঝমাঝম গোরে মুখকা ঝমকা।
রঙ্গিলী বেসরকে মোতীকা ঠমকা ॥…

বাজবহাদুরের ধ্রুপদ গান বলে একখানি গানের উল্লেখ করা হয়, সেখানি প্রমাণসিদ্ধ কিনা তা জানা যায় না—

তুঁহি সর্বসক্তিমান জগমে বিরাজে
স্বজন করত জীব সব নিরখ
অচরজ লাগত।…
বাজবহাদুর নিতহি গুণ গাবে…'

ভাষাটা যেন বাজবহাদুরের নয় বলে মনে হয়।

নবাৎ খাঁ

নবাৎ খাঁ তানসেনের জামাতা— কন্যা সরস্বতীর স্বামী। ইনি নাকি পূর্বে হিন্দু রাজপুত ছিলেন; কিন্তু মুশকিল সেই রাজপুত নামটি নিয়ে। অনেকে বলেছেন এঁর নাম ছিল সমোখন সিং, মুসলমান হয়ে নূতন নাম হয় নবাৎ খাঁ। হরিদাস স্বামীর শিষ্য বলে যে আটজনের নাম উল্লেখ করা হয় সমোখন সিং তাঁদের মধ্যে একজন। যদিও সেই স্থলে এঁর নাম দেওয়া আছে রাজা সৌরসেন বা সোঁকাসেন বলে, আমরা কিন্তু সমোখন সিং উচ্চারণটিই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পেয়েছি। মহম্মদ করম ইমাম সমোখন সিংকেই খণ্ডার বাণীর জনক বলেছেন এবং পরিচয় দিয়েছেন তানসেনের জামাতা বলে। অবুল ফজল সমোখন সিংএর বা নবাৎ খাঁর নামই করেন নি। অল্প কয়েকজনের মতে নবাৎ খাঁর হিন্দু নাম ছিল মিশ্রী সিং (নবাৎ-এর ভারতীয় অর্থ মিশ্রী); এবং ইনি সমোখন সিংএর পুত্র ছিলেন। এই মতে মিশ্রী সিং পঞ্জাবের খণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এঁর পিতা নাকি অকবরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার কথা অবশ্য লেখা নেই।

যাই হোক, নবাৎ খাঁ পূর্বে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন— কারো মতে বিবাহের পূর্বে— সে ক্ষেত্রে সমোখন সিংএর মৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হয় না; কোনো মতে বিবাহের পরে— সে ক্ষেত্রে সরস্বতী যে মুসলীম কন্যা সে কথাটি প্রমাণিত হয়। নবাৎ খাঁর জীবনকথা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তিনি কোথায় জন্মেছিলেন তাও নয়। মনে হয় ১৫৩৫-৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বীণাবাদ্যে নবাৎ খাঁ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, এবং শোনা যায় যে অকবরের দরবারে ইনি তানসেনের গানে সহযোগিতা করতেন। সেই সূত্রেই পরিচয় এবং পরে তানসেনের নাম অনুসারে কন্যাবংশও সেনী নামে পরিচিত। এই

বংশে বীণাবাদনই প্রাধান্য লাভ করেছিল বলে একে বীনকার-বংশ বলা হয়। নবাৎ খাঁ বীণা কার কাছে শিখেছিলেন জানি না, কিন্তু বীণাবাদনের প্রাচীন পদ্ধতি পরিপূর্ণরূপে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বলে শোনা যায়। তার সঙ্গে তানসেনের বিশিষ্ট গানরীতি ও বাদ্যরীতি সংযুক্ত হয়ে নবাৎ খাঁর বীণাবাদন নবীনরূপ গ্রহণ করেছিল, যা পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের একমাত্র রীতি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। নবাৎ খাঁর সম্বন্ধে অনেক গাল-গল্প আছে, যেগুলি মুখরোচক হলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। নবাৎ খাঁ বিবাহের সময় নাকি তানসেনের নিকট যৌতুকস্বরূপ দু শ ধ্রুপদ পেয়েছিলেন, যা বীনকার-বংশের নিজস্ব সম্পত্তি। এ গান অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এমন-কি পুত্রবংশেও না। নবাৎ খাঁর মৃত্যুতারিখ আমাদের জানা নেই। এঁকে জাহাঙ্গীরের দরবারে আমরা দেখতে পাই না।

যাঁরা নবাৎ খাঁকে সমোখন সিংএর পুত্র বলেন, তাঁদের মতে সমোখন সিং সিংহলগড়ের রাজা ছিলেন। এঁদের সঙ্গে বৃজচন্দ, শ্রীচন্দ, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ ও মহাপাত্রের নাম উল্লেখ্য। কথিত আছে, তানসেন গওহর বা গওরহার বাণী, এবং নবাৎ খাঁ খণ্ডার বাণী সৃষ্টি করেছিলেন। মহম্মদ করম ইমাম বলেন যে বৃজচন্দ ডাগুর ও শ্রীচন্দ নৌহার বাণীর প্রচলন করেন। অতএব এই দু জন গুণীকে স্মরণ করা উচিত। আমরা এইটুকু শুধু জানি যে, বৃজচন্দ দিল্লীর নিকটস্থ "ডংগর" নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং শ্রীচন্দ পঞ্জাবের "নৌহর" গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু এই জানার সঙ্গে যা বেশী করে জানা উচিত, সেটি হল "বাণী" সম্বন্ধে। বাণী এঁরা কেউই তৈরী করেন নি, শুধু সেগুলিকে সামান্য সংস্কার করে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে বাসস্থানের নাম অনুসারে শিষ্যেরা বাণীর নূতন নামকরণ করেছেন। প্রাচীনকালে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌরী ও বেসরা গান-রীতি ছিল, এমন-কি সাধারণীও ছিল; ঐ গানরীতিগুলি গায়কের প্রকৃতি অনুসারে এক-একজনের নিকট এক-একটি প্রীতিকর হত বা অনুশীলনসাধ্য হত। তানসেন প্রভৃতির পূর্বকালেও ঐগুলি প্রচলিত ছিল এবং কালের নিয়মে তাদের কিছু কিছু রূপান্তরও ঘটেছিল। আমরা জানি, তানসেনের যুগে গ্বলিয়র, আগ্রা, বৃন্দাবন ইত্যাদি এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা ইত্যাদি অঞ্চলে সঙ্গীতচর্চা চলেছে বেশী পরিমাণে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, গ্বলিয়র ও পঞ্জাবের গায়কদের দ্বারাই প্রাচীন রীতিগুলি প্রচারিত হবার সুযোগ পাচ্ছিল; এবং সেই কারণেই তানসেনের যুগে এসে ঐগুলি ১) গ্বলিয়রী বা গ্বরীয়রী বা গওরারী ২) খণ্ডহারী বা খণ্ডারী, ৩) ডংগরারী, ডংগুরী, ডংগরী বা ডাগরী এবং ৪) নৌহারী নামে

প্রচলিত হয়ে পড়ে। এগুলি যে আগেই ছিল তার প্রমাণ তানসেন গানেই দিয়েছেন, যথা— রাজা গওরার ফৌজদার খণ্ডার, দীবান ডাগুর, বকসী নৌহার। তানসেন প্রভৃতি এইটুকু করেছেন·যে, তাঁরা অকবরের সভায় ঐ রীতিগুলির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তাও বৃজচন্দ, শ্রীচন্দের দান সম্বন্ধে বহুজনেই একমত নন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, তাঁর সৃষ্ট গৌডারী এই ব্যাখ্যা আমাদের মনঃপূত নয়। কেননা সবকটি স্থানজ্ঞাপক নামের মধ্যে হঠাৎ জাতিবাচক নাম ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক মনে হয়।

চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁর নাম আমরা শুনি তানসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। কোথায় কবে কী কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল তার নির্ভরযোগ্য কোনো বিবরণ নেই; শুধু তাই নয়, সুরজ খাঁর এমন কোনো খ্যাতি ছিল না যা তাঁকে তানসেনের সমকক্ষ করে তুলতে পারে। শোনা যায়, অকবর তাঁর সভায় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান করতেন, কিন্তু নবরত্নেব এক রত্নের সঙ্গে সুরজ খাঁর প্রতিযোগিতা অকবর অনুমোদন করবেন একথা অবিশ্বাস্য মনে হয়। এই সংবাদ বরং বিশ্বাস্য যে চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ নামে যাঁদের পরিচয় দেওয়া হয় তাঁরা অমীর খুসরোর পঞ্জাব-অন্তর্গত খয়রাবাদ নিবাসী শিষ্যবংশীয় গুণী, যাঁরা হয়তো অকবরের সভায় গুণপনা দেখাবার জন্য কোনো দিন উপস্থিত হয়েছিলেন। খয়রাবাদী খ্যাল বলতে যে রীতি বোঝায় এঁদের সেই রীতির স্রষ্টা বলে বিবেচনা করা হয়। এই বিবেচনার পিছনে সত্য কতটা আছে জানি না। এমনও হতে পারে যে, পঞ্জাবী ভাষায যে ধ্রুপদমিশ্র গান তাঁরা গাইতেন, তাকেই খয়রাবাদী রীতি বলা হত, যা পরবর্তীকালে খ্যাল নামে চলিত হয়েছে।

চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ নাম দেখে তাঁদের হিন্দুধর্মপরিত্যাগকারী বলে ভেবে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সকলে নিয়েছেনও তাই; কিন্তু তাঁরাই যে সোমনাথ ও দিবাকর এটুকু ভাবাই কষ্টকর; এই নাম দুটিকে ছোটো বড়ো কোনো সূত্র থেকেই আবিষ্কার করা যায় না। এ ব্যাপারে "নাদবিনোদ" গ্রন্থখানি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে রাগদর্পণ গ্রন্থ অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। সেই গ্রন্থে আছে যে গ্বলিয়রের সুভান খাঁ নৌহারবাসী ছিলেন, শ্রীজ্ঞান খাঁ ফৎপুরবাসী ছিলেন। অতএব চাঁদ খাঁ সুরজ খাঁ খয়রাবাদী হয়েও সঙ্গীতশিক্ষার কারণে গ্বলিয়রে এসে থাকতে পারেন। তা হলে আইন-এ-অকবরীর চাঁদ খা আর এই চাঁদ খাঁ একই ব্যক্তি হয়ে পড়েন। সে ক্ষেত্রে খয়রাবাদী খ্যাল ইত্যাদির জনশ্রুতি কতটা টিকবে বলা যায় না। তা ছাড়া, মহম্মদ করম ইমামকে খুব বিশ্বাস করাও বিভ্রান্তিজনক।

তিনি বৃজচন্দ ও শ্রীচন্দকে বাণীর স্রষ্টা বলে আবার এক জায়গায় তাঁদের চাঁদ খাঁ, সুবজ খাঁ বলে পরিচয় দিয়েছেন।

তানসেনের গৌরবে রামদাস বাবাজীকে না ভুললেও তাঁর সাথী মহাপাত্রকে আমরা খুব সহজে ভুলে যাই বলেই এই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁকে দাঁড করিয়েছি। রামদাসের সঙ্গে ইনি ইসলাম শার দরবারেও ছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর অন্য পরিচয় ছিল। অকববই তাঁকে "মহাপাত্র" উপাধি দান করে তাঁর গুণ-পনার যথোচিত মর্যাদা দিলেন। তাঁকে ভুলক্রমে কখনো কখনো মহিপতি বলে সম্বোধন করা হয়।

তানতরঙ্গকে আমরা তানসেনের পুত্র বলেই বিবেচনা করি। তাঁর বংশের শেষ দিকেব আলমসেন, অমৃতসেন এমন-কি অমৃতসেনের দত্তকপুত্র নিহালসেনও নিজেকে তানসেন বংশের বলে পরিচয় দিতেন। অবুল ফজল, ফকীরুল্লা প্রভৃতিও তাই বলেছেন, শুধু দু-একজন এবং বামপুরওযালারা কেন জানি না, ঐ পরিচযটুকু গোপন রাখতে চেয়েছেন। বিলাস খাঁর এবং সদাবঙ্গের বংশের সঙ্গে কি তান-তরঙ্গের বংশের কোনো বেষারেষি ছিল? মনে হয়, ছিল। মনে হয়, এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য তানতরঙ্গকে গ্বলিযরে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং সেইখানেই বংশানুক্রমে রাজ-আশ্রয়ে বাস করতে হয়েছিল। যাঁরা তানতরঙ্গ মানতরঙ্গ প্রভৃতিকে দেখিযে শিষ্যবংশের অজুহাত তোলেন তাঁরা মানতরঙ্গের বংশেরও যেমন পরিচয় দিতে পারেন না, তেমনি পুত্র শরৎসেন ও তরঙ্গসেনের বংশ সম্পর্কেও কোনো কিছু জানাতে অপারগ হন; অথচ তানতরঙ্গ-বংশ তার ধ্রুপদ-ঐতিহ্য নিয়ে সগর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করে। যাই হোক, তানতরঙ্গ যদি তরঙ্গসেনেরই অপর নাম হয়, তা হলে তিনি তানসেনের তৃতীয় পুত্র। কিন্তু আমরা যতদূর অনুমান করতে পারি, তাতে তানতরঙ্গই প্রথম পুত্র, সুরৎসেন দ্বিতীয় পুত্র, শরৎসেন বা কোনো মতে নিচোডসেন তৃতীয় পুত্র এবং বিলাস খাঁ কনিষ্ঠ পুত্র। তানতরঙ্গ খুব সম্ভব ১৫৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর তানসেনেরই কাছে, এবং গানেও তিনি সে কথা স্বীকার করেছেন— তানাবিকট তানসেন জাকো সুজস বাখানিয়ে। তারপরে তাঁকে আমরা উৎকৃষ্ট গায়করূপে অকবরের দরবারে দেখতে পাই। তখন বিলাস খাঁ সাধারণ শ্রেণীর গায়ক। এ হল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অর্থাৎ তানসেনের মৃত্যুর পরেই দেখলাম তানতরঙ্গ দিল্লীতে অনুপস্থিত, জহাঙ্গীরের দরবারে বিলাস খাঁ প্রধান। জনশ্রুতি এই যে, তানসেনের মৃত্যুকালে

বিলাস খাঁর সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে পুরোভাগে নিয়ে যায়। কিন্তু যে বিলাস-খানি টোড়ীর জন্য এই জনশ্রুতি সে টোড়ী প্রাচীন টোড়ীরই সামান্য রদবদল, তার এমন কিছু আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য অন্তত অকবরের সময়ে চিন্তনীয় নয়, যখন টোড়ী নিজরূপ তখন পর্যন্ত একেবারে বিসর্জন দেয় নি। আর উদাহরণস্বরূপ "কৌন ভ্রম ভুলোরে" পংক্তিযুক্ত যে গানটিকে উদ্ধৃত করা হয়, সেটি মোটেই মৃত্যুকালে গাইবার গান নয়। তানসেনের জীবিতকালে অপরের কাছে তানসেনের গুণ-প্রকাশক গান! না হলে কেউ বলে না, "মিলহো তানসেন গুরুজ্ঞানী।" তবু আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তানসেনের বৃদ্ধ অবস্থায় শূন্যপদ অধিকার করা নিয়ে একটা বিবাদ নিশ্চয়ই হয়েছিল, যাতে যে-কোনো কারণেই হোক বিলাস খাঁ জয়ী হয়েছিলেন। তারপর থেকে তানতরঙ্গের আর কোনো সংবাদই আমরা পাই না; শুধু তাঁর বংশের সন্তানদের দেখে তাঁর বিচার করি। এই বিচার থেকে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তানসেনের চার পুত্রের এক পুত্র অর্থাৎ শরৎ বা নিচোড়সেন গায়ক বা বাদক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন নি। সুরৎসেন ছিলেন পণ্ডিত, তিনি মার্গ অর্থাৎ সংস্কৃত রাগাদির চর্চা করতেন। তানতরঙ্গ ছিলেন গায়ক এবং তাঁর বংশে গানই ছিল প্রধান, যন্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নি। আর বিলাস খাঁ গায়ক হলেও যন্ত্রই তাঁর বংশে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল যেজন্য সেই বংশকে রবাবীয়া বংশ বলা হত। অপর দিকে তানসেনের কন্যাবংশ বীণাকে করেছিল প্রধান এবং বীনকার-বংশ বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছিল। তানতরঙ্গের গানের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তাঁর গানের নমুনা—

প্রথম মঞ্জন কর অঞ্জন দেত নৈন
ঔর মাঁগ সিন্দুর তা পর সিস ফুল
গরে মুকুতমাল ভাল টীক অঙ্গ চন্দন
পহর নীল সাড়ী মুখকমলপর অলক
সোহত চতর বনবারী আয়ে আড় নিরখত।..

রৈন গমায়ে আয়ে হো লালন কহাঁ জাগে
খগরী রাত বাত কহো প্যারে।

তানতরঙ্গ রসরঙ্গ ভীনী কীনহীনখ-চিহ্ন
ভাগ জাগে হমারে॥

অনুক্রম সোঁ পাবে তীবরতরতীবর
কোমল অতকোমল সকারী ত্রয় ভেদ
সংগ লিয়ে সুর তাল।···

তানতরঙ্গের রচনায় কৃষ্ণলীলা, নায়িকা-বর্ণনা, সঙ্গীত-বিচার ও ভগবৎ-ধ্যান পাওয়া যায়।

বিলাস খাঁ

বিলাস খাঁ ছিলেন তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র। খুব সম্ভব ১৫৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। পিতার কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করে ১৫৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি অকবরের সঙ্গীতজ্ঞরূপে পরিচিত হন। প্রতিভাসম্পন্ন হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে বিলাস খাঁ দরবারে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, প্রতিষ্ঠা পেলেন এবং জহাঙ্গীরের দরবারে প্রধান সঙ্গীতজ্ঞের পদলাভ করলেন। কোনো মতে ইনি উদাসীপ্রকৃতির ছিলেন, অর্থাদির প্রতি এঁর কোনো মমতা ছিল না। এ বক্তব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে বলবার কিছু নেই।

জহাঙ্গীর তাঁর গ্রন্থে বিলাস খাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নি, কাজেই বিলাস খাঁ কেমন ছিলেন তা জানা যায় না। তবে এঁর গান থেকে আমরা জানতে পারি যে বিলাস খাঁ সাধুপ্রকৃতির ছিলেন, যদিও তানসেনের মতোই তিনি বাদশার গুণকীর্তন করেছেন এবং আতিশয্যের সঙ্গেই করেছেন।

বিলাস খাঁর মৃত্যুসময় আমাদের অজ্ঞাত। সাঙ্গীতিক জীবনে বিলাস খাঁ "বিলাসখানী টোড়ী" "বিলাসখানি কল্যাণ" ইত্যাদি রাগ সৃষ্টি করেন এবং ভগবদ্-বিষয়ক, রাজপ্রসংসা-সূচক, নায়িকাভেদবর্ণনাকারী গান রচনা করেছেন। বিলাস খাঁর একটি প্রসিদ্ধ গান হল জহাঙ্গীরের প্রসংসাসূচক—

রবখৎলী দিল্লীবর শা জহাঙ্গীর বৈঠে তখত···
তানসেননন্দন বিলাস গাবে সুধ সারঙ্গ
রঙ্গনাথরটপাণি পদপঙ্কজ চিত চাহে।

ইব্রাহিম আদিল শা

বীজাপুরের সুলতানবংশ ছিলেন সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে ইব্রাহিম আদিল শা দ্বিতীয় তাঁর "নওরস-ই-আদিল" গ্রন্থের জন্য সঙ্গীতজগতে কীর্তিমান স্রষ্টারূপে ঘোষিত হন। ইনি একাধারে গায়ক, কবি ও ভাবুক-রসজ্ঞ

ছিলেন। তাঁর গানে তানসেন প্রভৃতির মতো রাজপ্রশংসা ছিল না, বিভিন্ন বিষয় ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে বর্ণনা বা আলোচনা ছিল। কানডা রাগটি আদিল শার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে মনে হয়, কারণ তাঁর গানের বেশীর ভাগই এই রাগে রচিত। পরবর্তীকালে এই কানড়া নওরসীকানডা বা নবরসকানডা নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। আদিল শা নওরস শব্দটি মঙ্গলসূচক অর্থে ব্যবহার করতেন। তাই নওরস শব্দটি রাগনামের পূর্বে ব্যবহার করাও তাঁর রীতি ছিল। শোনা যায়, আদিল শার দরবারে প্রায় এক হাজার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজে বখ্‌তার খাঁ ও চাঁদ খাঁর নাম করেছেন। বখতার খাঁর গুণপনায় তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বখতার খাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। আদিল শার গানে সাধারণত তিনটি ধাতু বা তুক্ পাওয়া যায়। তিনি এদের নাম ঠিকমতো দেন নি ; প্রথমটির নাম নেই— সেটিকে তিনি স্থায়ী বলতেন, কি ধ্রুব বলতেন তা জানা যায় না ; দ্বিতীয় তুক্‌কে আদিল শা বলেছেন "বৈন", কচিৎ "অন্তরা" ; তৃতীয় তুকের নাম আভোগই আছে। এই তিনটি তুক্ দেখে জহাঙ্গীর তাঁর তুজুক-ই-জহাঙ্গীরীতে গানগুলিকে ধ্রুপদ ও খ্যালের মধ্যবর্তী বলেছেন। যদিও এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই সময়ে খ্যাল প্রচলিত ছিল, তবু নওরস গ্রন্থে খ্যাল-টপ্পার নাম নেই। আসলে এই গানগুলি হল ত্রিধাতুযুক্ত ধ্রুবপ্রবন্ধের অনুকরণ, যা আদিল শা তাঁর সঙ্গীতশিক্ষকের নিকট পেয়েছিলেন। আদিল শা হিন্দুদের শিল্পকলায় অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং হিন্দুদের কাছ থেকেই সঙ্গীত, চিত্রাংকন ইত্যাদি শিক্ষা করতেন, সুতরাং ধ্রুবপ্রবন্ধের তিন ধাতু সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট ছিল না বলেই মনে হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আভোগের মধ্যেই দুটি খণ্ড লুকিয়ে আছে। তাঁর গানে সরস্বতী গণেশ প্রভৃতির স্তব আছে, পীর পয়গম্বরের বন্দনা আছে, রাগ-বর্ণনা আছে, প্রাকৃতিক রূপবর্ণনা আছে, মিলন-বিরহ-জল্পনা আছে। ইব্রাহিম তাঁর স্ত্রী চাঁদ সুলতানের নামেও অনেক গান রচনা করেছিলেন। ইব্রাহিমের কবিত্বশক্তির নমুনা দেখুন—

উপমা সুন্দরী সোহে সুদ সদা বরসাঁত।
বিজলিয়াঁ ঝমকে জগা জোতসোঁ বত্তিসী দাঁত ॥
কিসবত রংগরংগ দিসে জুঁ্য বাদল
ছায়ে বরসে মেঘ সো খোয়ে জল ॥...

গরজে সো তু কহে রাগ মলহার
ইবরাহিম মোর রীঝ নাচে পুকার ॥

ইব্রাহিম আদিল শা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং নয় বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল চাঁদবিবি। স্ত্রীর নাম ছিল চাঁদ সুলতান। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম দেহরক্ষা করেন।

পশ্চিম ও উত্তর ভাবতের গুণীদের মোটামুটি পরিচয় এইখানে শেষ হলেও একদিকে রইলেন ধোঁধী ও ধীরজ, অন্যদিকে ফকীরুল্লা ও করম ইমাম -বর্ণিত সঙ্গীতজ্ঞগণ।

ধোঁধী অকবরের সময়ের নায়ক, তাঁর নামে ধোঁধী-কী-মল্লার আছে এবং দু-চারটি গান আছে। জগন্নাথ কবিরায় -প্রশংসিত বাণীরসাল ধোঁধীর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। এঁর গানের নমুনা দেখুন—

নও ভবন নও রাঘব নও বাস নও আস
নঈ কিরিটকুণ্ডল নঈ নঈ হৈ কলঙ্গীরী।···
ধুঁধীকে প্রভু তুম বহুনায়ক শাসরো
সলোন তোসোঁ রহত উমঙ্গীরী ॥

ধীরজ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইনি কোন্ সময়ের গুণী তা বলতে আমরা অক্ষম। তবে লেখার ধরণ দেখে ধীরজকে ১৬শ শতকের গুণী বলে মনে হয়। তাঁর একটি গান হল—

আজকো সিংগার সুভগ সাঁবরে গুপালজুকো
কহত ন বন আবৈ দেখহি বন আবৈরী।···
কণ্ঠসিরী মোতিনমাল ফেটা কট জরী দুসাল
ছবি নিরখ আলিরি ধীরজ মন লাবৈরী ॥

হরবল্লভকেও অকবরকালীন গুণী বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। আমরা এঁর দু-একখানি গান ছাড়া আর কিছু পরিচয় পাই নি। কাজেই এঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারছি না। ফকীরুল্লা যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা হলেন— গুণসেন, লাল খাঁ কলাবন্ত, জগন্নাথ কবিরায়, রঙ্গ খাঁ, মিশ্রী খাঁ ঢাড়ী, সুবলসেন এবং ভগবান।

গুণসেন নায়ক ভন্নুর বংশধর, কাশ্মীরে বাস করতেন, নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন। এঁর মুসলমানী নাম ছিল অফ্জল। ১৬শ শতাব্দের শেষের দিকে এঁর জন্ম হয়েছিল।

লাল খাঁ কলাবন্ত বিলাস খাঁর শিষ্য এবং জামাতা ছিলেন। ১৫৮৫ থেকে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম। (জহাঙ্গীর বাদশা এক লাল খাঁ কলাবন্তের নাম করেছেন। তিনি ছিলেন মীয়াঁ লাল যিনি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন)। শাজাহানের দরবারে ইনি "গুণসমুদ্র" উপাধি পেয়েছিলেন। ১৬৭৫-৮০ খৃষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়।

জগন্নাথ কবিরায় সম্ভবতঃ ১৫৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মেছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং অল্প বয়সেই গানপ্রবীণ হয়ে উঠেছিলেন। শোনা যায়, প্রথম জীবনে গান রচনা করে এবং সুর দিয়ে ইনি তানসেনকে শোনাতেন। তানসেন নাকি বলেছিলেন যে, কবি ও গায়ক হিসাবে জগন্নাথের স্থান তানসেনের ঠিক পরেই। তা যদি হবে, তা হলে জহাঙ্গীর বাদশার সময়ে এঁর নাম শোনা যায় নি কেন? কাজেই তানসেনের ঐ প্রশংসা নিতান্তই মৌখিক ছিল, জগন্নাথকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনো উদ্দেশ্য এর মধ্যে ছিল না। অবশ্য, জহাঙ্গীরের দরবারের গুণীদের যা নাম দেখি, তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং দেখলেই মনে হয়, অন্য ধরণের নামগুলিকে যেন মুসলমানী উপাধি দিয়ে সাজানো হয়েছে। জহাঙ্গীরদাদ, খুর্‌রম্‌দাদ প্রভৃতি নাম আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত লাগে, অন্তত জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। যাই হোক, জগন্নাথ শাজাহানের দরবারে উচ্চপদ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। এই দরবারেই নাকি জগন্নাথ "কবিরায়" উপাধি পেয়েছিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইমি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাতখণ্ডেজী জগন্নাথকে ভাবভট্টের পিতা জনার্দন ভট্টের সঙ্গে এক করতে চেয়েছেন। কিন্তু জগন্নাথ কোথাও নিজেকে জনার্দন বলেন নি, সঙ্গীতরাজ তিনি ছিলেন না, এবং ঔরংজেবের রাজত্বের প্রারম্ভেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময়ে তাঁর সন্তান থাকলেও তাঁর বয়স হত অন্তত সত্তর বৎসর। অপর দিকে, অনুপ সিং বিকানীরের সিংহাসনে বসবার আগে পর্যন্ত ঔরংজেবের সঙ্গে কর্ণসিংএর যুদ্ধ চলছে, কাজেই রাজ্যময় অশান্তি; সুতরাং ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের অন্তত বছর কতক পরে জনার্দনের পুত্র ভাবভট্ট গ্রন্থ লেখার নির্দেশ পেয়েছিলেন। তা হলে, ভাবভট্ট জগন্নাথ কবিরায়ের পুত্র হলে এই সময়ে তাঁর বয়স হবে সাতাশী-অস্টাশী বছর! এই বয়সে কী পর-পর এতগুলি গ্রন্থ লেখা সম্ভব? তা ছাড়া, ঐ ভাবে অতিশয়োক্তি করে অনুপ সিংএর প্রশংসা করাও কি একজন অতিবৃদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞের পক্ষে সম্ভব? বরং ইতিহাসে যে পাওয়া যায় পণ্ডিত জনার্দন নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ শাজাহানের বৃত্তি ভোগ করতেন, তিনিই ভাবভট্টের পিতা হওয়া সম্ভব; এঁকে জগন্নাথও বলা হত। ভাবভট্ট সব

ব্যাপারেই অতিশয়োক্তি করতেন, পিতার ব্যাপারে ও নিজ ব্যাপারেও তাই করেছেন; অথচ অপরের উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর গ্রন্থে পিতার বৈশিষ্ট্যের বা আপন মৌলিকতার কোনো প্রমাণই তিনি দিতে পারেন নি। আমরা ভেবে নিতে পারি যে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে জনার্দন ভট্ট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ছিলেন, যখন জগন্নাথের বয়স ছিল অন্তত সত্তর। আর তা না হলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, তানসেন যে জগন্নাথের প্রতিভার কথা বলেছিলেন, সে জগন্নাথ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেছিলেন; শাজাহানের দরবারের জগন্নাথ পৃথক ব্যক্তি, যিনি কবিরায়ও বটেন, সঙ্গীতরাজও বটেন। অসুবিধার ব্যাপার এই যে, জগন্নাথ কবিরায় শাজাহানের গুণকীর্তনও যেমন করেছেন, বক্‌সু তানসেনের কথাও তেমনই প্রত্যক্ষদর্শীর মতো লিখেছেন; তা ছাড়া, ফকীরুল্লা ঔরংজেবের সময়েই উপস্থিত থেকে প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর মতো এই গুণী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তানসেনের জগন্নাথ এবং শাজাহানের জগন্নাথ কবিরায়কে পৃথক ব্যক্তি বলে সন্দেহ করা বোধ হয় খুব যুক্তিসহ নয়।

রঙ্গ খাঁ শাজাহানকালীন গুণী। ইনি ১৬শ শতকের শেষের দিকে জন্মেছিলেন। রঙ্গ খাঁর ধ্রুপদপারঙ্গমতার জন্য তাঁকে কলাবন্ত বলা হত। এঁর অপর নাম "দৈরং খাঁ"। একবার ইনি তুল্যওজনের রৌপ্য বখ্‌শীষ পেয়েছিলেন। আশী বছর বয়সে রঙ্গ খাঁর মৃত্যু হয়।

মিশ্রী খাঁ ঢাড়ী ছিলেন বিলাস খাঁর ছাত্র। ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে তাঁর জন্ম। ১৬৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি শা শুজার সঙ্গে বাংলায় গমন করেন। মিশ্রী খাঁ বাংলায় কোনো ছাত্রকে ধ্রুপদ শিক্ষা দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু সেনী সংগীত যে ১৭শ শতকে বাংলাদেশে প্রচারিত হত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশ্রী খাঁর সঙ্গে "গুণ খাঁ কলাবন্ত"ও বাংলায় গিয়েছিলেন। গুণ খাঁ সংস্কৃত প্রাচীন গানও জানতেন। দু জনেই উত্তম কবি ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ধ্রুপদরীতি এবং সেনী ধ্রুপদরীতি বিষ্ণুপুরে প্রচারিত হবার অন্তত দু শ বছর আগে বাংলায় এসেছিল। দরবার থেকে সেই রীতি নিশ্চয়ই সাধারণের মাঝে ছড়িয়েছিল, এবং সে রীতি বিলাস খাঁর নিজস্ব সেনীরীতি।

সুবলসেন সুরৎসেনের পুত্র, তানসেনের নাতি। ইনি ১৬শ শতাব্দের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উত্তম গায়করূপে শাজাহানের রাজত্বকালে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অন্যমতে এঁর প্রকৃত নাম সুহীলসেন। ১৬৫৫-৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

ভগবান ছিলেন অকবরের দরবারের মৃদঙ্গবাদক। তিনি ১৫৫০-৫৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যৌবনেই উত্তম পাখোয়াজীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ভগবান তানসেনের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। পরবর্তীকালে ফকীরুল্লার সঙ্গে থাকতেন। ১৬৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দে ভগবানের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ করম ইমাম যাঁদের নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন **মীরা মধনায়ক** ও **চঞ্চলসেন**। অকবরের রাজত্বকালে **মীরা মধনায়কের** আবির্ভাব হয় এবং সঙ্গীতজ্ঞরূপে ইনি সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আমরা এঁর বিশেষ কোনো পরিচয়ই পাই নি। মনে হয়, অকবরের রাজত্বের শেষ দিকে ইনি আবির্ভূত হন এবং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। **চঞ্চলসেন** খ্যালগায়ক ছিলেন; কিন্তু আমরা এঁর কোনো পরিচয় সংগ্রহ করতে পারি নি। শোনা যায়, চঞ্চলসেন আমীর খুসরোর সঙ্গীতরীতি শিক্ষা করেছিলেন। এঁর বাসস্থান ছিল পঞ্জাবে। ইনি অকবরকালীন গুণী ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। খ্যালের বহু প্রকার রীতির একটি নাকি চঞ্চলসেনেরই আবিষ্কার।

১৬শ শতকের উত্তরভারতীয় গুণীরা যখন ধ্রুপদ এবং খ্যালের চর্চা এবং উন্নতিসাধনে তৎপর তখন দক্ষিণে কর্ণাটক সঙ্গীতের চর্চাও নূতন পথে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও কীর্তনের সংমিশ্রণে অভিজাত কীর্তনের সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভক্তিবাদীদের বিভিন্ন শাখা নূতনরূপে সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করছেন। শাস্ত্রজ্ঞরাও পিছিয়ে নেই, কেউ প্রাচীনের গুণকীর্তন করছেন, কেউ শাস্ত্রের নবরূপায়ণ করছেন, কেউ-বা লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে নবীন শাস্ত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা করছেন।

কর্ণাটে কীর্তন, কৃতি ও পদম্ পল্লবী, অনুপল্লবী ও চরণম্ ধাতুর সাহায্যে প্রসার লাভ করছে, যদিও এ সময়ে প্রতিষ্ঠাবান কোনো গুণীর নাম পাওয়া যায় না। দক্ষিণী পণ্ডিতদের মতে পল্লবী ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহার "চিন্নায়া"র পূর্বে কেউ করেন নি। আমরা সঙ্গীতরত্নাকরে পল্লবী শব্দটির ব্যবহার দেখেছি, অবশ্য পল্লবরূপে—

ততঃ প্রয়োগস্তদনু পল্লবাখ্যং পদত্রয়ম্।
দ্বে স্তো বিলম্বিতে তত্র তৃতীয়াং দ্রুতমানতঃ॥ ৩৪॥

পল্লব এখানে তিনটি; এই তিনটি পরবর্তীকালে কর্ণাটে কি রূপ নিয়েছে জানি না। এই পল্লব নামটি দক্ষিণ ভারতের নয় তো?

১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে "নারায়ণতীর্থ" এলেন তাঁর "কৃষ্ণলীলা-

তরঙ্গিনী" নামক গীতিনাট্য নিয়ে। এই গ্রন্থে রাগ ও রসের বিবরণ আছে। বাংলায় এলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রঘুনন্দন, শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুর।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ঝামটপুরে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভগীরথ ও মাতার নাম ছিল সুনন্দা। শোনা যায় কৃষ্ণদাস সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু গুরু কে ছিলেন তা জানা যায় না। দীক্ষাগুরু ছিলেন রঘুনাথ দাস। ইনি বৃন্দাবনেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন এবং সেইখানেই এঁর মৃত্যুও ঘটে। "গোবিন্দলীলামৃত" নামক গ্রন্থ রচনা করে কৃষ্ণদাস 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। পরে রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী শুনে এবং প্রত্যক্ষভাবে জেনে তিনি "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন, যার বহু পদ কীর্তনীয়াগণ নানা ভাবে গান করেন। ১৫৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হয়।

রঘুনন্দন ছিলেন মুকুন্দ সরকারের পুত্র। ১৬শ শতকের প্রথম দিকে তিনি বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রঘুনন্দন ঠাকুরের শিক্ষাতেই শ্রীখণ্ড কীর্তনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শিষ্য রায়শেখর বাল্যলীলা গোষ্ঠ ইত্যাদি অষ্টকালীয় লীলাকীর্তনের পদ লিখেছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্পসংখ্যক কীর্তনপদ লিখেছেন ও "চতুশ্লোকী টীকা" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রীনিবাসের পাণ্ডিত্য কতটা ছিল তা জানি না, তবে শোনা যায় যে, কীর্তনে তিনি কিছু নূতনত্ব প্রকাশ করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে, ইনি মনোহরসাহী রীতির প্রবর্তক। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস দেহত্যাগ করেন।

নরোত্তম ঠাকুর ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে খেতরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতার নাম নারায়ণী দেবী। অল্প বয়সেই সংসারবিরাগী হয়ে ইনি বৃন্দাবন চলে যান এবং লোকনাথ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই স্থানেই নরোত্তম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন বলে শোনা যায়, কিন্তু গুরু কে ছিলেন তা জানা যায় না। ইনিই কীর্তন গানে মৃদঙ্গাদির আপত্তন রাগ-আলাপ এবং গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন করেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতরীতে এই পদ্ধতিতে প্রথম লীলাকীর্তন হয়।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে নরোত্তম অপ্রকট হন। তিনি 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', 'চমৎকার-চন্দ্রিকা', 'প্রার্থনা' ও 'হাটপত্তন' নামে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর যে লীলাকীর্তন-পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাই গড়েরহাটী

বা গরাণহাটী রীতি নামে প্রচারিত হয়। পরবর্তী সময়ে ঐ নামের অনুসরণে বর্ধমানের কীর্তন-পদ্ধতিকে মনোহরসাহী ও রাণীহাটী এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের কীর্তনকে মন্দারিনী ঝাড়খণ্ডী ইত্যাদি বলা হতে থাকল। আসলে এক-এক স্থানের লোকসঙ্গীতের যে-প্রভাব কীর্তনের উপর ছিল, সেই প্রভাবকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত করে এই নবীন রীতিগুলির প্রচলন হল। এই প্রচলন হয়েছিল বহুজনের সহযোগিতায়, কাজেই প্রচলনকর্তা বলে একজন কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর নয়, যদিও নানা জনে এক-একটি করে বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন।

কীর্তন যখন এই ভাবে রাগসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে উচ্চাঙ্গ কীর্তনে পরিবর্তিত হচ্ছে তখন উত্তরভারতের পরিবর্তনের ইতিহাস লিখছেন কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ এবং দক্ষিণভারতের পরিবর্তনকে শাস্ত্রসম্মত করে নিচ্ছেন অপর কয়েকজন পণ্ডিত।

অচ্যুত ছিলেন বিজয়নগরের রাজা এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব রায়ের ভ্রাতা। ১৫৩০ থেকে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এঁর রাজত্বকাল ছিল। অচ্যুত তাল সম্বন্ধে একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থখানির নাম "তালকলাবিধি"।

অচ্যুতের সভাপণ্ডিত ছিলেন সোমভট্ট। **"সোমনার্য্য"** এই সোমভট্টের শিষ্য ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ইনি ১৬শ শতকের শেষের দিকে "স্বররাগসুধার্ণব" ও "নাট্যচুড়ামণি" নামে দুখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাগগুলি ২০টি মেলে ভাগ করেছিলেন এবং ৯৬টি মেলসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রামামাত্য ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন তিম্মমাত্য। বিজয়নগরের রামরাজার রাজত্বকালে রামামাত্য 'স্বরমেলকলানিধি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে একটি অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্যের কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের গ্রন্থকারের নাম রামামাত্য, তাঁর পিতার নাম তিম্মামাত্য; আবার বিজয়নগরের শাসকের নাম রামরাজা আর তাঁর পিতার নাম তিম্ম। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে তিম্ম ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়ের অমাত্য। মনে হয় না কি যে রামামাত্যই রামরাজা? বিজয়নগরের প্রকৃত রাজা ছিলেন সদাশিব রায়, কিন্তু রামরাজাই রাজ্যশাসনকার্য নির্বাহ করতেন। স্বরমেলকলানিধিতে কুড়িটি মেল পাওয়া যায় অর্থাৎ বিদ্যারণ্যের সময়ের মেল-সংখ্যা থেকে পাঁচটি বেশী এবং রাগসংখ্যা পাওয়া যায় উনষাটটি (মেল হিসাবে) অথবা উনসত্তরটি (উত্তম, মধ্যম ও অধম হিসাবে)। রামরাজ ১৫৪২ থেকে ১৫৬৫ পর্যন্ত

রাজ্যপরিচালনা করেছেন, সুতরাং গ্রন্থখানি ১৫৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছে বলে ধরা যায়।

পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল কর্ণাটিক পণ্ডিত। ১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে খান্দেশে বুরহান খাঁ রাজত্ব করছিলেন। পুণ্ডরীক বুরহান খাঁর সভাপণ্ডিত হয়েছিলেন বোধ হয় ১৫৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে পুণ্ডবীক "সদ্রাগচন্দ্রোদয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কিছুকাল পরে তিনি মানসিংহের ভ্রাতা "মাধবসিংহের" সভায় যোগদান করেন এবং সেইখানে দ্বিতীয় গ্রন্থ "রাগমঞ্জরী" প্রণয়ন করেন। আরও পরে অকবরের সঙ্গীতজ্ঞ সভাসদদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে বোধ হয় পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল "রাগমালা" ও "নর্তননির্ণয়" রচনা করেন। সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে উনিশটি মেল, রাগসংখ্যা পঁয়ষট্টী। রাগমঞ্জরীতে কুড়িটি মেল, রাগ পঁযষট্টীটি। এই গ্রন্থে প্রথম আমরা উত্তরী রাগগুলির সঙ্গে অমীর খুস্‌রো-দ্বারা প্রচারিত রাগগুলির তুলনামূলক বিবরণ পেলাম। রাগমালায় আমরা রাগ-রাগিণী-পুত্র-পদ্ধতি পেলাম। রাগ এখানে ছয়টি, রাগিনী পাঁচটি ক'রে ত্রিশটি এবং পুত্রও পাঁচটি করে ত্রিশটি অর্থাৎ সবশুদ্ধ সেই পঁয়ষট্টীটি রাগ।

পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল ১৭শ শতাব্দের প্রথম দিকে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলে মনে হয়। এঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে ইনি নিজেই বলেছেন— শৈবগঙ্গার নিকটস্থ সাতনুর গ্রামে বিঠ্ঠলের জন্ম হয়।

শ্রীকণ্ঠ ১৬শ শতকের মধ্যভাগে জন্মেছিলেন। জামনগরের শাসক শত্রুশল্যের রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞ-কবি ছিলেন তিনি। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীকণ্ঠ "রসকৌমুদী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে সাহিত্য এবং সঙ্গীত -আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড হল সঙ্গীতবিষয়ক। শ্রীকণ্ঠ দক্ষিণী পদ্ধতিতে স্বর, রাগাদির এবং তিনিই প্রথম পত সা, পত মা ও পত পা'র আলোচনা করেছেন যা পরবর্তীকালে প্রতি সা ইত্যাদি নামে প্রচলিত হয়। অবশ্য এইগুলিকে স্বরমেলকলানিধিকার 'চ্যুত' শব্দের ব্যবহার দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। শ্রীকণ্ঠ আরও একটি নূতন ব্যাপার করেছেন। সেটা হল চৌদ্দটি স্বরের ব্যবহার। তিনটি গান্ধারের পর দুটি মধ্যম এবং তিনটি নিষাদের পর দুটি ষড়্‌জ দিয়ে তিনি ১৪টি স্বর-নাম সৃষ্টি করেছেন। রামামাত্যও ১৪টি স্বরের নাম করেছেন। দক্ষিণ ভারতে ঐ সময় হয়তো ১৪টি স্বর-ব্যবহারের একটা প্রচেষ্টা চলছিল। অথবা এও হতে পারে যে, রামামাত্য সঙ্গীতরত্নাকরকে অনুকরণ করেছিলেন। আর শ্রীকণ্ঠ রামামাত্যকে

অনুসরণ করেছিলেন। এই সময়েই যে মধ্যম গ্রাম লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই বীণা সহযোগে কেবল ষড়্জ গ্রামেরই কথা বলেছেন। শ্রীকণ্ঠ জামনগরের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, তিনি উত্তর ভারতীয়। তাঁর ঐ সংস্কার নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মেল ও রাগ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি স্থানে তিনি অসুবিধা বোধ করেছেন। সেটা হল দক্ষিণী স্বর সপ্তকে সৃষ্ট মুখারী রাগের প্রয়োগে। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, গমকযুক্ত করে ঐ স্বরগুলি দিয়ে মুখারীকে গান করা কষ্টসাধ্য। অনেক দক্ষিণী পণ্ডিত বলেন যে, কর্ণাটে প্রাচীনকালে কাম্বোজী স্বরসপ্তক এবং পরবর্তীকালে হরপ্রিয়া সপ্তক প্রচলিত ছিল, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির উক্তি দেখলে ঐ কথাগুলি বিশ্বাস করা কঠিন হয়। রসকৌমুদীর মেলের মধ্যে সারঙ্গ মেল রয়েছে যার স্বরে দুই মা, দুই নি আছে। এই সারঙ্গ নিতান্তই উত্তর ভারতীয় এবং এর বিবরণ পাই আমরা সঙ্গীতপারিজাত গ্রন্থে। শ্রীকণ্ঠ যেখানে পত সা, পত পা বলেছেন, অহোবল সেখানে তীব্র মা তীব্র নী লিখেছেন, এই প্রভেদ। মনে হয়, শ্রীকণ্ঠ দক্ষিণী ও উত্তরী মত একসঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। দক্ষিণে দুই মা ব্যবহার একসঙ্গে হয় না, সুতরাং পত পা ব্যবহার লেখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, এবং পত পা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সম্বাদ রাখতে গিয়ে পত সা'রও ব্যবহার দেখাতে হয়েছে। কর্ণাটকে যে সারঙ্গ আমরা দেখি সেটি বোধ হয় আগে কর্ণাটে ছিল না, উত্তর ভারত থেকেই ওখানে গিয়েছে, এবং এই পত'গুলিকে বর্জিত করে, শুদ্ধগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র বরালী মা ও কাকলী নী গ্রহণ করে নবীন রূপ লাভ করেছে, অথবা শুদ্ধ মধ্যমকে অপরিবর্তিত রেখে শঙ্করাভরণ মেলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "রসকৌমুদী" উত্তর ভারতের ভৈরবকেও দক্ষিণী মালবগৌড়ের সঙ্গে ব্যবহারে এনেছে, যা এর আগের কোনো দক্ষিণী গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। শ্রীকণ্ঠের সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানি না, তবে তাঁর পিতার নাম সম্ভবত 'মঙ্গল' ছিল এইটুকু বলা যায়।

অহোবল সঙ্গীতপারিজাতের লেখক। ইনি নিজের কোনো পরিচয় দেন নি বলে এঁর সম্বন্ধে নানা মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ পণ্ডিতের পুত্র অহোবল যে ভাবে রাগ কজ্জলীর পরিচয় দিয়েছেন, তাতে অনেকে মনে করেছেন যে, অহোবল বারাণসীর নিকটবর্তী কোথাও বাস করতেন এবং তিনি পঞ্চদশ শতকের গুণী। কারণ, কজরী প্রচলিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। অন্যমতে, অহোবল দক্ষিণ দেশীয় জ্ঞানী। কোনো মতে তিনি পঞ্চদশ শতকে, কোনো মতে সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। পারিজাত গ্রন্থে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, যা

বিভ্রান্তিকর। গ্রন্থে তীব্র, কোমল, পূর্ব, অতি তীব্রতম ইত্যাদি স্বরের ব্যবহার আছে, যা একান্তভাবে উত্তর দেশীয় উচ্চারণবিধি ; সারঙ্গ মেল আছে, যা কর্ণাটক পদ্ধতিতে সম্ভব নয় এবং শ্রীকণ্ঠের গ্রন্থে যার অশাস্ত্রীয ব্যাখ্যা আছে ; দীপক আছে যা তানসেনের পরে থাকা সম্ভব নয় ; ভৈরবী আছে প্রাচীন মূর্তি নিয়ে ; কল্যাণ আছে হিন্দুস্থানী অর্থাৎ উত্তরী গঠন নিয়ে ; বেলাবল রূপ পরিবর্তন করছে ; বঙ্গালী, মেঘনাদ, কুরঙ্গ, সালঙ্গ ইত্যাদি কযেকটি অশ্রুতপূর্ব মেলযুক্ত বাগ আছে ; সিংহরব নামে একটি রাগের পরিচয় আছে যে রাগটিকে ব্যংকটমখী নিজ-আবিষ্কৃত বলে নূতন মেলে ব্যবহার করেছিলেন এবং কোথাও কল্যাণের পরিচয দিতে গিয়ে ইমন বা য়মনের উল্লেখ করেন নি যা পুণ্ডরীক ও সোমনাথ উভয়েই করেছেন। অপর দিকে অহোবল ভৈরবীর মেলে গা, ধা, নি-কে বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন ; আনন্দ-ভৈরবী নামে একটি অল্পপ্রাচীন কর্ণাটক রাগের পরিচয় দিয়েছেন ; বহুপ্রকার বরালী তোড়ী ও কল্যাণের বিবরণ দিয়েছেন ; এবং 'ইতি নবনাটাঃ' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। সমস্ত কিছু মিলিযে পণ্ডিত অহোবলকে ১৬শ শতকের শেষ দিকে ফেলতে হয়, যখন হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি তার নবীন শাস্ত্র ও নামকরণ নিয়ে প্রচাবোন্মুখ হচ্ছে। অহোবল দক্ষিণ ভারতের মেল-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু সপ্তক ব্যবহার করেছেন উত্তর ভারতের। মেল শব্দ ব্যবহার করলেও তিনি মেলের সংখ্যা ঠিক করে জনক-জন্য হিসাবে ভাগ করে নেন নি, অর্থাৎ তিনি যেন মেল শব্দটি দক্ষিণ ভারত থেকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উত্তরের রাগগুলিকে সাজানোর ব্যবস্থা তখনও করে উঠতে পারেন নি, উত্তরী পদ্ধতির বরাটীপ্রকার, নটপ্রকার ইত্যাদি ভাবে গোছানোকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অহোবল একটি মূল্যবান্ তথ্য আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন, যা হল বীণার তার থেকে স্বরসপ্তক সৃষ্টি করা। বীণার তারকে ভাগ করলে যে, সাতটা স্বর ঠিক মতো পাওয়া যায় এ সংবাদ আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, তাই তার উঁচু নিচু করে আন্দাজে স্বর আর শ্রুতি বার করছিলাম। অহোবল ঐ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতিপাদনে উৎসাহ দিলেন। তথ্যের সমস্তটুকু না জানার ফলে অবশ্য অহোবলের হিসাবে কিছু বিভ্রান্তি হল, তবুও তাঁর দানের মূল্য কমলো না। আমরা তাঁর ইঙ্গিতটুকু সম্বল করে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে 'অরিজিন অব শ্রুতিজ্' গ্রন্থে শ্রুতিরহস্যেরও সমাধান করতে সক্ষম হলাম।

১৬শ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলে আর যাঁদের ভাবতে পারি তাঁরা পরিচয়হীন, যেমন তুম্বুরুনাটক, দত্তিলকোহলীয়ম্-এর গ্রন্থকর্তাগণ ; নারদসংহিতার

নারদ এবং রত্নকোষের সাগরনন্দিন্। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর গ্রন্থকার বর্গের অনেকেই এঁদের নাম করেছেন, কিন্তু ১৬শ শতকের কেউই এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। উল্লেখ দেখে সন্দেহ হয়, এঁদের মধ্যে অনেকেই পূর্বভারতীয় লেখক। **"দামোদর সেন"** যে সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থখানি লিখেছিলেন, সেখানি বোধ হয় শুভংকরের সঙ্গীতদামোদরের অংশ হয়ে পড়েছে। বাংলা দেশে যে পঞ্চমসারসংহিতা চলে তাও নারদ ও দামোদর -লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের মিলিত রূপ।

সঙ্গীতজ্ঞ সাধুসন্ত বলতে যা বোঝা যায় এ সময়ে তাঁদের কারও নাম খুঁজে পাই না। দাদু দয়াল ও তুকারাম ভক্তিবাদ প্রচারকালে বোধ হয় ভজন গান গাইতেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানস অপরে গেয়ে গেয়ে শোনাতেন।

দাদু

"দাদু দয়াল" সম্বন্ধে যে ইতিকথা শোনা যায় তা অসঙ্গতিতে পূর্ণ। আমরা বিশ্বাসযোগ্য যা পেয়েছি, তাই প্রকাশ করছি। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে আহম্মদাবাদে দাদুর জন্ম হয়। পিতার নাম সুলেমান, মাতার নাম জানা যায় না। দাদুর প্রকৃত নাম দাউদ। ইনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। অল্পবয়সেই এঁর বৈরাগ্য জন্মে এবং মানুষের মাঝে ভেদাভেদ বস্তুটিকে জয় করে রাম ও রহিমন্ ভজনায় মগ্ন হলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে দাদু "ব্রহ্মসম্প্রদায়" গঠন করেন। সর্বধর্মসমন্বয় ছিল দাদুর উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন, মানুষের বাইরের বেশ কিছু নয়, অন্তরের শুদ্ধিই সব, সেখানে ভগবান আছেন। একাগ্র হয়ে তাঁকে অনুভব করতে হবে। আমি হিন্দু জানি না, মুসলমান জানি না, আমি চাই ভগবান্‌কে।

"ন তহাঁ হিন্দু দেহরা, ন তঁহা তুরুক মসীতি।
দাদু আপৈ আপ হৈ নহঁী তহাঁ রহ রীতি।"

বললেন, মন্দির বলুন, মসজিদ বলুন ভগবান কিছুই ভাবেন না, তিনি আপনাতে আপনি প্রকাশিত হন ; কোনো ভেদবুদ্ধির ধার ধারেন না। প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই এক ভগবানই আছেন— দাদু অরশখুদায়কা। ভজন গানের মাধ্যমে দাদু এই কথাই প্রচার করে গিয়েছেন, মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে, সংস্কারের জড়তা অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস করেছেন। দাদুর গুরুর নাম ছিল বুরহান-উদ্দীন। গুরুর কথা তিনি এক জায়গায় বলেছেন, যখন আমি ভগবানকে পাওয়ার পথ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়গত পথ ত্যাগ করলাম তখন আমার উপর ক্রুদ্ধ হলেন প্রত্যেকেই, কিন্তু "সদ্‌গুরুকে পরসাদ থৈ মেরে হরখ ন সোক।"

কবীর নানকের মতো দাদুও সংসারে থেকেই সংসারের অজ্ঞানতার উর্ধ্বে ওঠার পথ খুঁজেছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন, সন্তানাদিও তাঁর ছিল। স্ত্রীর নাম ছিল "হব্বা"। শোনা যায়, দুটি পুত্র এবং দুটি কন্যা সন্তান ছিল দাদুর, যার মধ্যে গরীবদাস ও মসকীন-এব নামই বেশী শোনা যায়। গরীবদাস ছিলেন দাদুপন্থের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

দাদু ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে নবানা নামক স্থানে দেহরক্ষা করেন।

শোনা যায় ফৎপুর সিকরীতে অকবর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দাদুব বাণী সংগ্রহ কবেছিলেন শিষ্য সন্তদাস ও জগন্নাথ দাস এবং নাম দিযেছিলেন "হরডে বাণী"। অপর শিষ্য বজ্জবজী তাঁব বাণীর জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কেন জানি না, বাউলবাও দাদুকে গুরু বলে তাঁদের রচনার মধ্যে স্বীকার করেছেন।

দাদুপন্থীরা দাদুর রচিত ভজনগুলি রাগসঙ্গীতের অনুকরণে গান করতেন কিনা জানি না, কিন্তু ভজনগুলি কোনো-না-কোনো রাগনামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত থাকতে দেখা যায়। মারুরাগযুক্ত একটি গান আছে—

কিঁউ বিসরৈ মেরা পীব পিয়ারা
জীবকী জীবন প্রাণ হমারা।...
মাতা বালক দূধ ন দেবৈ
সো কৈসেঁ করি পীবৈ
নিরধনকাধন অনত ভুলানা
সো কৈসৈঁ করি জীবৈ॥...

তুলসীদাস

তুলসীদাস ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৬, ১৫৪৩ ইত্যাদি তারিখও পাওয়া যায়, কিন্তু আগেরটিই বেশী সমীচীন বলে বোধ হয়। জন্মস্থান খুব সম্ভব রাজাপুর। কোনো মতে সোরোঁ নামক স্থানে তুলসীদাসের জন্ম হয়। তুলসীদাসের পিতার নাম আত্মারাম দুবে ও মাতার নাম ছিল হুলসী। অল্প বয়সেই তুলসীদাসকে মাতাপিতার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হয়। এঁর গুরুর কাছেই তারপর থেকে তুলসীদাস স্থান পান ও দীক্ষান্তে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। গুরুর নাম কোনো মতে শেষ সনাতনজী, কোনো মতে নরহরি বা নরসিংহ চৌধুরী। যাঁরা শেষোক্তদের নাম করেন, তাঁহাদের মতে তুলসীদাস যখন কাশীতে বাস করতে থাকেন তখন

শেষ সনাতনজীর কাছে ১৫ বৎসর বেদ পাঠ করেন। কাশী থেকে রাজাপুরে ফিরে যান তুলসীদাস কিছু দিনের জন্য। জনশ্রুতি যে এইখানেই ইনি রত্না নামে একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করেন এবং রত্নারই উপদেশে সংসাববিরাগী হয়ে কাশী যান, এবং তারপব নানাস্থানে পর্যটন করে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায স্থায়ীভাবে বাস কবতে থাকেন ও "রামচরিতমানস" গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে কাশীতে তুলসীদাস দেহত্যাগ করেন।

তুলসীদাসের কাব্য ছিল সঙ্গীতময়। রাগরাগিণীব মাধ্যমেই তুলসীদাসের কাব্যরস পবিবেশিত হত। তুলসীদাস বলতেন "হরিপদ প্রীতি ন হোয়, বিন হরিগুণ গাযে সুনে"। ইনি "বিনয়পত্রিকা," "দোহাবলী," "কবিতাবলী" ও "গীতাবলী" ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বিনয়পত্রিকার পদগুলি খুব সম্ভব বিশুদ্ধ রাগে গাওয়া হত এবং রাগগুলির নাম যা পাওযা যায় তার থেকে ঐ সময়ে প্রচলিত রাগের একটা আন্দাজ করা যায়। মারু, ভৈরব, সারং, কল্যাণ এবং সুহা বেলাবলকে ঐ সময়ে যথেষ্ট প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। তবে দণ্ডক নামটি একটু খটকা বাধায়, যদিও বড়ু চণ্ডীদাসের দণ্ডক শব্দটির কথা ভাবলে অনুমান করা যায় যে, দণ্ডক নামক কোনো দেশী রাগ-গীতি-পদ্ধতি তখন ভারতের পূর্ব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

তুলসীদাসের ইষ্টদেবতা ছিলেন রাম। কিন্তু অন্য দেবতারও স্তুতি তিনি করেছেন নির্মল হৃদয়ে, এবং বর ভিক্ষা করেছেন যেন শ্রীরামে তাঁর অচলাভক্তি থাকে। তুলসীদাস শেষ বযসে অযোধ্যা ত্যাগ করে চিত্রকুট ভ্রমণ সাঙ্গ করে কাশীতে যান এবং এইস্থানেই তাঁর রামচরিতমানস গ্রন্থ লেখা সম্পূর্ণ হয় বলে শোনা যায়। কাশীতে সংকটমোচন হনুমানজীর মূর্তি স্থাপনা করেছিলেন তুলসীদাস, যা আজও অসীঘাটের পাশে বর্তমান আছে। জনশ্রুতি যে তুলসীদাসের সঙ্গে অবদর রহীম খানখানা, অম্বরের মানসিংহ, নাভাজী ও মধুসূদন সরস্বতীর গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তুলসীদাস গোস্বামীর একটি অতিপ্রচলিত গান হল—

জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁবর পন্‌ছী বন বোলে
চন্দ কিরণ সীতল ভঈ চকঈ পিয় মিলন গঈ
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন পল্লব দ্রুম ডোলে।...

তুকারাম মহারাষ্ট্রের সন্ত। অভঙ্গের প্রধান রচয়িতা বলতে এঁকেই বোঝায়। ১৬শ শতকের শেষ দিকে, বা কোনো মতে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে দেহূগ্রামে তুকারামের জন্ম হয়। পিতার নাম ছিল বোলোজী এবং মাতার নাম কনকাবাঈ।

অল্পবয়সেই তুকারামের দুইবার বিবাহ হয় এবং সংসারপালনের ভারও তাঁর উপর এসে পড়ে। সংসারের নানা উৎপীড়নে তুকারাম সংসার ত্যাগ করে বিঠ্‌ঠলজীর আরাধনায় মগ্ন হন এবং অভঙ্গপদ রচনা করে গানে ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করেন। এই পদগুলির রাগ ও তালের ব্যবহারে কোনো বন্ধন নেই বলে এদের নাম হল অভঙ্গ। তুকারামের অভঙ্গগুলি মহারাষ্ট্রের সম্পদ। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তুকারামের মৃত্যু হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর সাঙ্গীতিক প্রসঙ্গ সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সাধুসন্তের প্রভাব ক্রমেই লুপ্ত হয়ে আসছে, দরবারী লঘুচিত্ততা একটু একটু করে গায়ক-বাদকদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। বিত্ত ও প্রতিপত্তি বিদ্যাকে গ্রাস করছে। সুযোগের লালসা শিল্পীকে ধর্মপরিবর্তনে উন্মুখ করছে। শাস্ত্র অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকছে। ইন্দ্রপ্রস্থ মত, গণেশ মত ইত্যাদি নবীন গায়কসৃষ্ট শাস্ত্র গড়ে উঠছে আর তার ফলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত আপন ঐতিহ্য থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। বাংলা রাগসঙ্গীত ভুলে যাচ্ছে। কীর্তনের মাঝে সে নানা নবীনতা আনছে, যদিও মার্গগীত-পদ্ধতির কিছু বিধি এই কীর্তনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার মেল-পদ্ধতিকে নিয়ে; ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করে সে আরও রাগ আবিষ্কার করছে এবং মেলসংখ্যা কৃত্রিম উপায়ে কত পর্যন্ত উদ্ভাবন করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা করছে। ফলে প্রাচীন মূর্চ্ছনাবিধি এবং সম্বাদ-নিয়ম ভেঙে-চুরে গিয়েছে। কর্ণাটক স্বরসপ্তকেরও এই সময়ে কিছু পুনর্গঠন হয়েছে, রে ও ধা-র সঙ্গে গা ও নি-র সম্পর্কটার সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। উত্তর ভারতের স্বরসপ্তকও এই সময়ে তার মধ্যকালীন রূপ ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সপ্তকের রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে, দ্বাদশটি স্বর ক্রমে সপ্তকের বিভাগ বলে স্বীকৃতি লাভের চেষ্টায় আছে।

শাস্ত্রকাররা লক্ষ্যকে নিয়ে ব্যস্ত; যদিও প্রাচীন শ্লোক আবৃত্তি করতে তাঁরা খুবই পটু আছেন। রাগরাগিণীর ধ্যান এবং চিত্র তৈরি করা আগেই সামান্য ভাবে শুরু হয়েছিল, এখন তার চর্চা বহুলপরিমাণে বাড়ছে। এদের মধ্যে নবীন স্রষ্টা বা প্রতিভাবান খুব অল্প কয়েকজনই যাঁরা শুধু চর্বিত-চর্বণ করে গেলেন, বা নিতান্ত আকস্মিকভাবে সঙ্গীত-ইতিহাসের পাতার কোণে আশ্রয় পেলেন, তাঁদের সঙ্গীত-প্রসঙ্গে টেনে আনা এখনকার মতো স্থগিত রইল।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দের প্রথম দিক হল জহাঙ্গীর বাদশার শাসনকাল। এই কালে যে সমস্ত গায়ক-বাদকদের নাম শোনা যায় তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা আগেই করেছি। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন জগন্নাথ কবিরায় রঙ্গ খাঁ, লাল খাঁ কলাবন্ত, গুণসেন, জহাঙ্গীরদাদ, খুর্‌রম্‌দাদ, পরভেজ প্রভৃতি। তানসেনের সমসাময়িক লাল খাঁও ছিলেন. যাঁর কথা তুজুক-ই জহাঙ্গীরীতে বিবৃত হয়েছে। তানসেন কলাবন্তও একজন ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তানতরঙ্গ এ সময়ে গ্বলিয়রে, সরৎসেন কোথায় জানি না, সুরৎসেন বোধ হয় দরবারে আছেন কিন্তু পণ্ডিত হিসাবে; এঁর পুত্র সুবলসেন বা সুহীলসেন উত্তম গায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তবু দরবারের মান্যতা বিশেষ পাচ্ছেন না। জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুভান খাঁর পৌত্র রজীর খাঁ নৌহার অমীর খুস্‌রোর খ্যালরীতির গান উত্তমরূপে পরিবেশন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর কথাও দরবারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তানসেন পরিবারের আরও বহুজন ছিলেন, নবাৎ খাঁর পরিবারেও বীণাবাদক ও গায়ক ছিলেন কিন্তু জহাঙ্গীর বাদশার শাসনকালে তাঁদের গুণপণার কোনো পরিচয়ই আমরা পাই না। বরংচ বাদকরূপে "সরসনৈন", রসবীন খাঁ, অল্লাদাদ ধাড়ী, বায়জীদ রব্বানী প্রভৃতির নাম পাই।

"সরসনৈন"-এর নাম ছিল "হয়াৎ"। ইনি অল্পবয়সেই জহাঙ্গীরের দরবারে বাদকরূপে পরিচিত হন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ফকীরুল্লার সঙ্গে এঁকে দেখা যায়।

"রসবীন খাঁ" বীণকার ছিলেন। শাজহানের দরবারেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "মহম্মদ"।

"অল্লাদাদ ধাড়ী" ছিলেন সারঙ্গী নবাজ। শাজহানের রাজত্বকালে এঁর মৃত্যু হয়। জালন্ধর এঁর জন্মস্থান ছিল।

"বায়জীদ রব্বানী" ছিলেন উৎকৃষ্ট রবাব-বাদক। এঁর শিষ্য সুঘরসেন কলাবন্ত ও উৎকৃষ্ট বাদক ছিলেন।

এই সব বাদকের গুরু কে বা কারা ছিলেন তা জানা যায় না, অথচ দেখা যাচ্ছে যে তানসেনের পৌত্র উদয়সেন দয়ালসেন, কিংবা দৌহিত্র শের খাঁ, হসন্‌ খাঁ প্রভৃতির কোনো প্রসিদ্ধির কথা শোনা যায় না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, সে

সময়ে রবাব, বীণা ইত্যাদির উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক অনেকেই অজ্ঞাতপরিচয় থেকেও এই সব নাম করা গুণীদের শিক্ষিত করে তুলেছিলেন এবং এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন গ্বলিয়রে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণী। এই সময়ে পখাবজীও ছিলেন, কিন্তু শাজহানের সময়ের আগে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

যে গায়কদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে কারো কারো পরিচয় আছে গানের ভিতর। সে পরিচয় আবির্ভাবকালের, অথবা সাঙ্গীতিক প্রতিপত্তির কিংবা রচনাবৈশিষ্ট্যের।

"নিডর একহী নর শাহ জহাঙ্গীর
রাজা রাম সম বীর ইন্‌কো কহাবে।··
অকবরনন্দন জগবন্দনকো গুণ
নিত স্থরতসেন গাবে॥"

গানটিতে সুরতসেন যে জহাঙ্গীর বাদশার দরবারে ছিলেন তার প্রমাণ মিলছে।

"শাহ জহাঙ্গীর আজ
তখৎ বৈঠে
সোভা দসদিস ছাবে অরু সব
আনন্দ পাবে।···
গুণসেন অসীস করত
তুম চিরঞ্জীব রহো শাহ জগমে
সব তুমকো গুণমে মন লাবে॥"

গানটিতে জহাঙ্গীরের দরবারের এক গুণসেনকে পাচ্ছি, যিনি খুব সম্ভব শাজহানের সময়ের গুণসেন, তবে পৃথক কোনো ব্যক্তিও যে হতে পারেন না তা নয়।

আর গান পাই বিলাস খাঁর। রচনাশৈলী দিয়ে বিচার করলে এঁদের রচনা এমন কিছু উচ্চস্তরের নয়।

অন্য কোনো গুণীর গান আমরা খুঁজে পাই নি। কাজেই রাগদর্পণের বিবরণটুকু জানিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ করতে হচ্ছে। যাঁরা মানতরঙ্গকে তানসেনের শিষ্য বলেন, তাঁরা অবশ্য জহাঙ্গীরের সময়ে এঁকে খুঁজে পাবেন এবং গানও জোগাড় করতে পারবেন; কিন্তু অপরপক্ষে কোনো প্রমাণ না দেখিয়ে, যাঁরা এই মানতরঙ্গকেই (এমন-কি তানতরঙ্গকেও) তানসেনের পৌত্র বলে প্রচার করেন তাঁদের কাছে মানতরঙ্গের শাজহান-বিষয়ক গান খুঁজে পাবেন।

শাজহানের রাজ্যকালে পৌঁছবার আগে একটা কথা বলার আছে। আমরা সরস সারং ও সুরজ মল্লার নামে দুটি রাগ পেয়ে থাকি। এই রাগ দুটি কী ভাবে স্রষ্ট সে সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। আমাদের নিজস্ব ধারণা এই যে, সরস বলতে সরৎকেই বোঝায়, যে সরৎ ছিলেন তানসেনের পুত্র.। সরস সারং সেনীঘরেই খুঁজে পাওয়া যায়। সুরজ মল্লার-এর স্রষ্টিকর্তা যে সুরজ, আমরা তাঁকে তানতরঙ্গের পুত্র বলে অনুমান করি, কারণ সুরজ খাঁর রাগ সেনী ঘরে প্রচলিত হওয়াটা একটু অস্বাভাবিক লাগে। তানতরঙ্গের পুত্র এই "সুরজসেন" জহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু তার বেশী আর কিছু জানা যায় না।

শাজহানের রাজত্বে এসে আমরা পেলাম বৃদ্ধ লাল খাঁ কলাবন্তকে যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে; আরো পাই এঁর পুত্র খুশ্‌হাল খাঁ ও বিস্রাম খাঁকে, মধ্যবয়সী রঙ্গ খাঁকে, বৃদ্ধ জগন্নাথ কবিরায়কে, তুলসীরাম কলাবন্ত ও ধর্মদাস কলাবন্তকে, গুণসেনকে, সুবলসেন ও হমীরসেনকে, বাজীদ খাঁ কলাবন্তকে, শেখ বহাউদ্দিন ও শেখ শের মহম্মদকে, মীয়া দাদূ ঢাড়ী বল্লী ঢাড়ী রহীমদাদ ঢাড়ী সবাদ খাঁ ঢাড়ীকে, সালমচন্দ ডাগরকে, বখ্‌ৎ খাঁকে, মীর সালহ কব্বাল এবং রোজা কব্বালকে। হসন খাঁ নামক এক অজ্ঞাতপরিচয় গুণীকেও এই সময়ে পাচ্ছি যাঁর সঙ্গে নবাৎ খাঁর বংশধর হসন্ খাঁর কোনো সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর নয় বলে বোধ হয়। বাদকদের মধ্যে ছিলেন সুখরসেন কলাবন্ত, অমীর, শৌকী, অবুলবফা, মৃদঙ্গ রায়, তাহির ঢাড়ী, অমানুল্লা পখাবজী ও ফিরোজ ঢাড়ী পখাবজী। মুগল খা ও হসামুদ্দীন ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞানী; আর লেখক ছিলেন শের খাঁ লোদী, অবদুল মজীদ লাহোরী এবং ফকীরুল্লা সৈফ্‌ খাঁ। ফকীরুল্লার রাগদর্পণ গ্রন্থই আমাদের পূর্বোক্ত সমস্ত বিবরণ জানিয়েছে।

খুশ্‌হাল খাঁ লাল খাঁ গুণসমুন্দ্রের পুত্র (গুণসমুন্দ্র = গুণসমুদ্র)। টোড়ীরাগে ইনি সিদ্ধ ছিলেন বলে শোনা যায়। খুশ্‌হাল খাঁ এবং তাঁর ভাই বিস্রাম খাঁ শাজহানের দরবারে রত্নস্বরূপ ছিলেন।

তুলসীরাম কলাবন্ত প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্য কোনো পরিচয় অজ্ঞাত।

ধর্মদাস কলাবন্ত প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক ছিলেন। ফকীরুল্লার সময়ে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন কাজেই গায়কি ঠিক থাকত না। শেষ বয়সে ইনি অকবরাবাদে গিয়ে বাস করেছিলেন।

মোহব খাঁ ও **বাজেব খাঁ** নামে আরও দুইজন উত্তম ধ্রুপদগায়ক ঐ সময়ে ছিলেন।

গুণসেন-এর সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। ইনি নায়ক ভন্নুর বংশধর ছিলেন। তিনি সংগীতশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ ছিলেন এবং মার্গসঙ্গীত জানতেন। এইজন্য নায়ক উপাধি পেয়েছিলেন। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুবলসেন ও পুত্র **হমীরসেন** উত্তম ধ্রুপদগায়ক ছিলেন। শাজহানের রাজত্বের শেষ দিকে এঁদের মৃত্যু হয়।

বাজীদ খাঁ কলাবন্ত সৃজনীশক্তিসম্পন্ন গায়ক ছিলেন, কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শেখ বহাউদ্দীন প্রথম জীবনে শাজহানের শিকারের সঙ্গী ছিলেন; পরে সন্ন্যাসী হয়ে যান। সন্ন্যাসী জীবনে তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে উত্তমরূপে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ধ্রুপদ, খ্যাল এবং তরানা গাইতে পারতেন এবং উত্তম রচনাকারও হয়েছিলেন। রবাব, বীণা ও অমৃতী বাদনে দক্ষ ছিলেন। নিজে 'খ্যাল' নামে নামে একটী যন্ত্রও নির্মাণ করেছিলেন। ১৭শ শতকের শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেখ শের মহম্মদ শেখ বহাউদ্দীনের সাথি ছিলেন। চুটকলা, খ্যাল ও তরানা চমৎকারভাবে গাইতে পারতেন। ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে দেহ ত্যাগ করেন।

মীয়াঁ দানু ঢাড়ী প্রসিদ্ধ সবু-বাদ্যকার ছিলেন।

বল্লী ঢাড়ী গায়ক ছিলেন। আকবরাবাদে ১৭শ শতকের শেষদিকে এঁর মৃত্যু হয়।

রহীমদাদ ঢাড়ী মার্গগীত জানতেন অর্থাৎ সংস্কৃত গান জানতেন এবং উত্তম গীত রচনা করতে পারতেন।

সবাৎ খাঁ ঢাড়ী উত্তম গায়ক ছিলেন। গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঝুনঝুন নামক স্থানে বাস করতেন।

সালমচন্দ ডগর উচ্চশ্রেণীর গায়ক ও রচনাকার ছিলেন।

বখ্‌ৎ খাঁ ধ্রুপদ গানে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে দেহত্যাগ করেন।

গোপালচন্দ ঢাড়ী নামেও একজন গায়কের উল্লেখ এ সময়ে পাওয়া যায়।

মীর সালহ কব্বাল উচ্চশ্রেণীর গায়ক ও রচনাকার ছিলেন। নব্বই বছর বয়সে ঔরংজেবের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যু হয়।

রোজা কব্বাল উত্তম গায়ক ছিলেন। ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথমদিকে দেহত্যাগ করেন।

সুঘরসেন কলাবন্ত বায়জিদের প্রধান শিষ্য ছিলেন; রবাব অতি উৎকৃষ্ট বাজাতেন।

অমীর সুরনাবাদ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

অকবরের রাজত্বকালে সুরনা যন্ত্রের উৎকৃষ্ট বাদকরূপে আমরা নাম পাচ্ছি উস্তাদ শাহ মহম্মদের।

শৌকী চমৎকার তম্বুরা বাজাতে পারতেন। তম্বুরাতে গান বাজাতেও পারতেন খুব সুন্দরভাবে। কাশ্মীরে ১৭শ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে এঁর মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে অকবরের রাজত্বকালের উস্তাদ ইয়ুসুফ, সুলতান হাশিম, মহম্মদ আমীন ও মহম্মদ হুসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা তম্বুরা বাদ্য অতি চমৎকার ভাবে বাজাতেন। তম্বুরা আরবদেশীয় বাদ্য, যাতে বীণার মতো খানিকটা জায়গায় পর্দা আছে।

অবুল বফার খুব সুন্দর বাজনার হাত ছিল; তম্বুরা বাজাতেন। এঁর পিতার নাম ছিল তাতার খাঁ। ১৭শ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মৃত্যু হয়।

মৃদঙ্গ রায় তারযন্ত্র অতি সুন্দরভাবে বাজাতেন— অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলা চলে। মার্গপদ্ধতিও জানতেন। এঁর অপর নাম ছিল 'রূপা'। ফকীরুল্লার সময়েও বেঁচে ছিলেন।

তাহীর ঢাড়ী ডফ বাজাতেন।— বাজাবার পদ্ধতি ছিল অভিনব।

ডফ বলতে খঞ্জরী বোঝায়। হোলী ইত্যাদি গানে এই যন্ত্রের খুব বেশী ব্যবহার হয়। অকবরের কালে আমরা ডফ-বাদক কোনো গুণীকে পাই না।

অমানুল্লা পখাবজী উত্তম মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। শাজহানের রাজত্ব থেকে ফকীরুল্লার সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন।

ফিরোজ ঢাড়ী উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। লাহোরে বাস করতেন।

এঁদের এইটুকু পরিচয় নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে, কারণ অন্য কোনো স্থান থেকে এঁদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পারছি না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ধ্রুপদে গুণীয়রের প্রভাব ক্রমে কমে আসছে, সেনী-বৈশিষ্ট্য বিস্তার লাভ করছে এবং খ্যাল-গায়কদের নাম এবং প্রসিদ্ধির বিবরণ মিলছে। হিন্দু গায়কের সংখ্যা কমছে, তাঁদের প্রতিপত্তিও হ্রাস পাচ্ছে, মুসলীম প্রাধান্য প্রকাশ পাচ্ছে।

এই মুসলীমরা ধর্মান্তরিত হিন্দু কিনা তা অবশ্য জানা যায় না, তবে কয়েকটি নাম খাঁটি মুসলমানের বলেই ধারণা হয়। হিন্দুদের মধ্যে গুণসেনকে পাওয়া যায় যিনি মুসলমান হয়ে অফ্‌জল নাম নিয়েছিলেন। অন্যান্যদের চেনা যায় না। বলা বাহুল্য, এর ফলে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, কী ভাবে কোন্ সঙ্গীতজ্ঞের বংশ তার শাখা বিস্তার কবতে করতে ঔরংজেবের কালে এসে পৌচেছিল তার কোনো বিবরণই আমরা জোগাড় করতে পারি নি। শুধু অমুক ভালো গাইতেন, কিংবা বাজাতেন, কিংবা নাচতেন এইটুকু জানালেই বা জানলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হল বলে মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যাই হোক, শুধু গানে নয়, পখাবজ ইত্যাদিতেও দেখি সবই মুসলীম গুণী, বীণা ইত্যাদিতেও তাই— হিন্দুদের দেখতে পাই না। অথচ আজও ঘরাণা বলতে যা বুঝি তার আদিপুরুষ হিন্দু বলে প্রতিপন্ন করতে সকলেই উৎসুক! এর কারণ আমরা নির্ণয় করতে পারি নি। কোথায় যেন হরিদাস স্বামী, বৈজু, গোপাল বা তানসেনের একটু সম্পর্ক থাকলে এই সব ঘরাণার ঐতিহ্যের গর্বটুকু বাড়ে এই রকম একটা আভাস এঁদের কথায় পাওয়া যায়; কট্টর মুসলমান থেকেই এই ঘরানা জন্মেছে বললে কেন জানি না এঁদের নিজেকে একটু ছোটো মনে হয়; অথচ এক সেনী ঘরানা ছাড়া কোন ঘরানাই ঔরংজেব পর্যন্তও সুষ্ঠুভাবে নিজ বংশতালিকা দাখিল করতে পারে না। আগে যাঁরা সঙ্গীতের ইতিহাস লিখতেন তাঁদের গ্রন্থে ঐ সব বংশতালিকাও আমরা পাই না, এমন-কি বংশের মূলপুরুষের পরিচয় পাওয়া নিয়েও মুশ্‌কিলে পড়তে হয়।

ইতিহাস বলে যে, ঔরংজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, অতএব গান-বাজনা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু তাঁর রাজত্বে দু-একজন গায়কের নাম পাচ্ছি যাঁরা ঔরংজেব বাদশার গুণকীর্তন করে গান লিখেছেন। হয়তো গানের সঙ্গে পান-দোষ, নৃত্য ইত্যাদির অবনতিকারক পরিবেশ দেখেই ঔরংজেব যত্র-তত্র গান-বাজনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য ফকীরুল্লার বিবরণ পাঠ করে মনে হয় যে, ঔরংজেবের রাজত্বকালে যে সকল গুণী ছিলেন তাঁরা অনেকেই ফকীরুল্লার সঙ্গেই ছিলেন, তথবা তাঁর জানিত কোনো স্থানে বসবাস করছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ইতিহাসে দেখতে পাই, দরবারের নাচ-গান বন্ধ হয় নি, আনুষঙ্গিক দোষগুলিও দিব্য বহাল আছে এবং সেনী বংশের গুণীরা ও খ্যালগায়করা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। সুতরাং আমরা ভেবে নিতে পারি যে, ঔরংজেবের দরবারে অন্ততঃ পরিবেশে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ ছিল না, এবং ছিল না বলেই "গৌরা গণেশ

সুরসতী”র মতো শুদ্ধকল্যাণ রাগের সামান্য দু-একখানি চীজের অন্যতম চীজ আমরা লাভ করেছিলাম।

ঔরংজেব রাজত্ব করেছিলেন ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত গুণী বর্তমান ছিলেন তাঁরা হলেন সুজান খাঁ ও খুশাল শাহ যাঁদের দরবারে উপস্থিত দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের গানের মধ্য দিয়ে।—

অম্বরণ ডরন লাগে পানী প্রতাপসে দিল্লীশ্বর শাহ ঔরংজেব।···

রৈন দিন সুজান গাবে তুব গুণ জগজন মোহী হোয দেখে তুব টেব॥

গানটিতে সুজানের নাম আছে। আর

গৌরা গণেস সুরসতী ঔর পরব্রহ্ম···

খুশাল শা বরনত অল্লাকে নূর

আলমগীর দীন দুনীকে প্রতিপালক

জগমে আয়ো॥

গানটিতে খুশাল শাহের নাম পাচ্ছি। সুজান খাঁর কোনো পরিচয় আমরা পাই নি। দু-জন সুজান খাঁর নাম পাওয়া যায় সঙ্গীতের ইতিহাসে। একজন সুজান খাঁ ছিলেন খান-খানানের দরবারে। ইনি হাজী সুজান খাঁ কিনা তা আমরা বলতে পারি না। আগ্রা ঘরানার ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে, হাজী সুজান খাঁ তাঁদের ঘরানার প্রবর্তক এবং তিনি ছিলেন তানসেনের জামাতা। আমরা প্রথমত আগ্রা ঘরানার বংশধরদের বিবরণে সামঞ্জস্য খুঁজে পাই নি। দ্বিতীয়ত সেনী ঘর থেকে এই দামাদ সম্পর্কে অস্বীকৃতি পেয়েছি। সেনী মতে তানসেনের একটি মাত্র কন্যাই ছিলেন, যিনি নবাৎ খাঁর হস্তে সমর্পিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সুজান খাঁর দেখা পেলাম ঔরংজেবের দরবারে। ইনি হাজি সুজান খাঁ হলে আগ্রা ঘরানার পারম্পর্য রক্ষা পায় বটে, কিন্তু অলখ দাস, মলক দাসকে নিয়ে গণ্ডগোল হয়। মনে হয়, ঘরানার হিসাব-নিকাশে কোথায় যেন একটা ফাঁকির ব্যাপার সর্বত্র প্রচলিত আছে। যাই হোক, সুজান খাঁ যে একজন গুণী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কয়েকটি সুন্দর রচনা আমরা আজও পেয়ে থাকি, যদিও আগ্রা ঘরানার সঙ্গে তার কতটুকু সম্পর্ক সেটা আমরা জানতে পারি না। “জালিম অজব এক জোগী জহর খায়” কিংবা “পাতী আঈ প্যারে পৈতে পঠীন জাত” অথবা “রূপজোবন গুণ-বিস্তাবর’ ইত্যাদি গান সঙ্গীতজ্ঞ মহলে অতি প্রসিদ্ধ। খুশহাল খাঁর সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে, তবে ইনি ছাড়া আর একজন নাজীর খুশাল খাঁও এই সময় বর্তমান ছিলেন, যিনি ঔরংজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

নাজীর খুশাল খাঁ হলেন তানসেনের কন্যাবংশের গুণী সদারঙ্গের পিতামহ। আগে যে গানখানির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানি কোন্ খুশাল খাঁর লেখা তা বলা শক্ত। ঔরংজেবের রাজত্বকালে সদারঙ্গের পিতা লাল খাঁও বর্তমান ছিলেন। এঁরা ছাড়া ছিলেন সেনী সুদেসসেন বা সুধীনসেন, সিধার খাঁ, রাগরস খাঁ, গুণ খাঁ কলাবন্ত, উদয় সিং, মিশ্রী খাঁ ঢাডী, শেখ কমাল, শেখ সাদুল্লা, পুজা, কবীর কবাল ও তারাচাঁদ কলাবন্ত।

সুদেস বা সুধীন সেন ছিলেন সুবলসেনের পুত্র। গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধ না হলেও এঁর রচনাশক্তি ছিল উচ্চস্তরের। প্রথমে শা শুজার সঙ্গে ছিলেন, পরে ফকীরুল্লার সঙ্গে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে চলে যান।

গুণ খাঁ কলাবন্ত ও মিশ্রী খাঁ ঢাড়ী শা শুজার সঙ্গে বাংলায় গিয়েছিলেন এবং সেইখানেই দেহরক্ষা করেছিলেন। গুণ খাঁ মার্গসঙ্গীত জানতেন।

সিধার খাঁ ও রাগরস খাঁ সেনী বংশীয় বিলাস খাঁর প্রপৌত্র ছিলেন। রাগরস খাঁ রবাববাদ্যে নিপুণ ছিলেন। কোনো মতে এঁর পুত্র মসীদ খাঁ সিতার বাদ্যে নবীনতা এনেছিলেন। সিধার খাঁর পুত্র হলেন হসন খাঁ এবং এই হসন খাঁর পুত্র ছিলেন গুলাব খাঁ যিনি মহম্মদ শার দরবারে সেনী ধ্রুপদীয়া রূপে প্রধান আসন অধিকার করেছিলেন। এঁর একখানি গান হল—

রঙ্গভরে দরস দেখত
মন ইচ্ছা উপজত
রসকে রঙ্গীলে লাল…
গুলাবকে প্রভুকে রস বস
করলীনো…

লাল খাঁরও একখানি প্রসিদ্ধ গান আছে, যাতে তাঁর আবির্ভাবকালের নির্দেশ পাওয়া যায়—

প্রসাদ ভয়ো প্রসিদ্ধ শাহকো…
আলমগীরকো আল্লা কীনো
দোনো জগৎকে প্রতিপালক…
লাল কহে খট দর্শন
নিবাস করন…

দৌলত অফ্জু বা উদয়সিং বা ইদে সিং ছিলেন খড়গপুরের রাজা রামসিং এর পৌত্র, রোজ অফজুর পুত্র। ইনি অমীর খুসরো ও সুলতান হুসেন শর্কীর

খ্যাল-পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খ্যাল ও তরানার গান-রচনাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

শেখ কমাল ছিলেন মীয়াঁ দাহূ ঢাডীর শিষ্য এবং প্রসিদ্ধ গায়ক। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ফকীরুল্লার সঙ্গে ইনি কাশ্মীরে ছিলেন।

শেখ সাদুল্লা লাহোরী প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন—ফকীরুল্লার সঙ্গে থাকতেন।

পূজা ছিলেন শেখ শের মহম্মদের ভাই। ইনি গায়ক হিসাবে বড় না হলেও উত্তম গীতরচনাকার ছিলেন। ফকীরুল্লার কর্মচারী ছিলেন ইনি।

কবার কব্বাল শেখ শের মহম্মদের প্রধান শিষ্য ছিলেন। খ্যাল গানে ইনি নবীন পদ্ধতিব প্রয়োগ করতেন।

তারাচাঁদ কলাবন্ত তম্বুরাবাদক ছিলেন। শৌকীর শিষ্য ছিলেন ইনি। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে মারা যান।

সেনী বংশ ব্যতীত আর সকলেরই জীবনী সম্বন্ধে যা কিছু বিবরণ দিয়েছেন ফকীরুল্লা। এ সময়ের অন্য কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরবর্তীকালে আর যাঁরা যা লিখেছেন সব কিছুর মধ্যেই অনুমান খুব বেশী পরিমাণে প্রবেশ করেছে। সে অনুমানও এক-এক সময়ে এত অদ্ভুত ও অসমঞ্জস হয়েছে যে তা নিয়ে ইতিহাস লিখলে হাস্যাস্পদ হতে হয়।

হিন্দুস্থানে যখন এই অবস্থা তখন বাংলায় গড়েরহাটী, মনোহরশাহী, মন্দারিনী, রেনেটী, ঝাড়খণ্ডী ও টেঁয়ারছপ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নূতন আর কিছু হচ্ছে না। ঐ পদ্ধতিগুলির প্রবর্তক সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সে কথা আগেই জানিয়েছি। গড়েরহাটীর প্রবর্তক নরোত্তম ঠাকুর একথা সর্ববাদীসম্মত। মনোহরসাহীর প্রবর্তক শ্রীনিবাস আচার্য অথবা বিপ্রদাস ঘোষ (?) অথবা মনোহরদাস ও বংশীবদন। রানিহাটীর বা রেনেটীর প্রবর্তক শ্যামানন্দ অথবা গোকুলানন্দ অথবা বিপ্রদাস ঘোষ। ঝাড়খণ্ডীর প্রবর্তক কবীন্দ্র গোকুল। টেঁয়ারছপ-এর প্রবর্তক গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাস।

বিপ্রদাস ঘোষ ছিলেন শ্যামানন্দের শিষ্য। ইনি দেবীপুরনিবাসী ছিলেন।

শ্যামানন্দ ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের সহচর। তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন, বৈষ্ণবগ্রন্থ আনয়নকালে তিনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গী হয়েছিলেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। কোনো মতে শ্যামানন্দ উৎকলবাসী। অন্য মতে দুঃখী

কৃষ্ণদাসই পরে শ্যামানন্দ নাম পেয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কৃষ্ণমণ্ডল আর মাতার নাম ছিল দুরিকা। অল্প বয়সেই তিনি বৃন্দাবনে যান এবং সেখানেই নরোত্তমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শ্যামানন্দের গুরু ছিলেন হৃদয়চৈতন্য।

মনোহরদাস অউলিয়া ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হন। নরোত্তমের সমসাময়িক এই মনোহরদাস সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। বর্ধমানের মনোহর-সাহী-পরগণায় তাঁর বাস ছিল।

বংশীবদন ছিলেন মঙ্গল ঠাকুরের পৌত্র। শোনা যায়, ইনি মনোহরদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বংশীবদন কান্দরা গ্রাম ও ময়নাডালের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে কাঁদরা ও ময়নাডাল বীরভূমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। মনে রাখতে হবে, চৈতন্যদেবের সমসময়ে আর একজন বংশীবদন ছিলেন।

গোকুলানন্দ ছিলেন নেড়াবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। রানীহাটী পরগনায় এঁর নিবাস ছিল। বংশীবদন ঠাকুরের সমসাময়িক ছিলেন এই গোকুলানন্দ।

কবীন্দ্র গোকুল পঞ্চকোটবাসী ছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত পদ পাওয়া যায়।

গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস পদকর্তা ছিলেন। চমৎকার কীর্তন গাইতে পারতেন এবং প্রসিদ্ধ "পদকল্পতরু"র লেখকও তিনিই। ১৮শ শতকের শেষের দিকে বৈষ্ণবদাস বর্তমান ছিলেন। টেঁয়া বৈদ্যপুরে এঁর বাসস্থান ছিল।

বলা বাহুল্য, এতগুলি প্রবর্তকের মাঝে মন্দারিনীপদ্ধতির প্রবর্তকের নাম নেই। অথচ কেন নেই, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন কখনো তোলা হয় নি। আসলে ঐ পদ্ধতিগুলি অনেক আগে থেকেই ছিল, নরোত্তমের খেতরী উৎসবের পরে ঐ পদ্ধতিগুলি নিয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। যেখানে বিখ্যাত কীর্তনীযাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে তাঁদের নাম এক-একটি পদ্ধতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে সেরকম কিছু পাওয়া যায় নি সেখানে প্রাচীন নামটিই প্রচলিত রয়ে গিয়েছে। মন্দারন পরগনায় সে রকম কাউকে পাওয়া গেল না কাজেই স্থানীয় গীত-পদ্ধতি বলে তাঁর পরিচয় রয়ে গেল। রয়ে গেল বললে ভুল হবে— সে লুপ্ত হয়ে গেল, এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেল ঝাড়খণ্ডীকেও। ব্যাপারটা রহস্যময়। বীরভূমের ও বর্ধমানের পদ্ধতিগুলি উন্নতিলাভ করল, তাদের প্রসার বাড়ল। আর মেদিনীপুরে যা ছিল তাও লোপ পেল কেন? তবে কি মেদিনীপুর পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবকে অস্বীকার করেছিল? তাইবা কী করে বলা যায়? রেনেটীও

তো কিছুকাল পরে লোপ পাবার অবস্থায় পৌঁচেছিল। আপাতদৃষ্টিতে এর কারণ হল, তখন কীর্তনপদ্ধতির প্রধান যাঁরা ছিলেন তাঁরা লোকপদ্ধতির কীর্তনকে অপাংক্তেয় করে উচ্চাঙ্গ কীর্তন প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

যাই হোক, এই পদ্ধতি কয়টির জন্মের সঙ্গে যা ছিল অন্তরঙ্গ তাই বহিরঙ্গ হল অর্থাৎ লীলাকীর্তন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হল। তার বিভাগ হল দু-প্রকারের—১) নায়িকাভেদ ও ২) পদাবলী। এ সময়ে লীলাকীর্তনের রচয়িতারূপে যাঁদের পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। জ্ঞানদাস ১৬শ শতকের প্রথম দিকের পদকর্তা ও গোবিন্দদাস শেষের দিকের। গোবিন্দদাসের পরে আর সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা হিসাবে কেনো নাম পাই না। বরংচ সঙ্গীতগ্রন্থ-রচয়িতা রূপে পাই নরহরি চক্রবর্তীকে। কিন্তু এঁর আবির্ভাব হয়েছিল ১৮শ শতাব্দীতে।

তাই বলে ১৭শ শতকে সংগীতগ্রন্থ-রচয়িতার অসদ্ভাব ছিল না। সঙ্গীত-সারোদ্ধার ও রাগমালা-রচয়িতা হরিভট্ট ছিলেন, নাদদীপক-রচয়িতা ভট্টাচার্য ছিলেন; সঙ্গীতদামোদর ও হস্তমুক্তাবলীর লেখক শুভংকর ছিলেন এবং সঙ্গীত-দর্পণকার হরিবল্লভ ছিলেন। অপর দিকে রাগবিবোধ-রচয়িতা সোমনাথ ছিলেন, রাগতরঙ্গিণীকার লোচন ছিলেন। সঙ্গীতদর্পণকার দামোদর ছিলেন। হৃদয়-কৌতুক ও হৃদয়প্রকাশ-রচয়িতা হৃদয়নারায়ণদেব ছিলেন, রাগতত্ত্ববিবোধ-লেখক শ্রীনিবাস ছিলেন এবং ভাবভট্ট ছিলেন। কর্ণাটক শাস্ত্র প্রণেতারূপে ছিলেন সঙ্গীত-সুধার গ্রন্থকার রঘুনাথ ভূপ বা গোবিন্দ দীক্ষিত, চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা-রচয়িতা ব্যংকটমখী, অকলংক, এবং সংগ্রহচুডামণির গ্রন্থকর্তা গোবিন্দ। মুসলীম রচয়িতা-দের মধ্যে ছিলেন রাগদর্পণ-প্রণেতা ফকীরুল্লা সেফ খাঁ, মুরাতুলখ্যাল রচয়িতা শের খাঁ লোদী, বাদশানামা-প্রণেতা অব্‌তুল মজীদ লাহোরী এবং তোফতুল হিন্দ গ্রন্থের লেখক মীর্জা খাঁ। সঙ্গীতশাস্ত্রবিশেষজ্ঞরূপে নাম ছিল মুগল খাঁ, হসামুদ্দীন খাঁ ও মুল্লা অব্‌তুল সলাম লাহোরীর।

হরি ভট্ট ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন, এইটুকুই অনুমান করা যায়। "সঙ্গীতসারোদ্ধার" ও "রাগমালা" নামে দুখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। রাগমালায় শুদ্ধ, ছায়ালগ বিভাগ দেখা যায়, যেখানে শুদ্ধকে রাগাঙ্গ বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে কয়েকটি রাগের রূপবর্ণনা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

ভট্টাচার্য যে কে ছিলেন জানি না; সম্পূর্ণ নামও আমরা পাই নি। মনে

হয়, ১৭শ শতকের প্রথম দিকেই ইনি বর্তমান ছিলেন এবং "নাদদীপক" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থে কোনো নূতন বিষয় নেই। ঈশ্বর-দেবী সংবাদে নাদ, স্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা আছে। গ্রন্থে রাগ ৬টি, রাগিণী ৩০ ও রাগপুত্র ৪৮টি।

শুভংকর কবেকার ব্যক্তি বা কজন এ সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট আছে। এঁর রচিত বলে দু'খানি গ্রন্থের নাম আমরা পাই— একখানি "সঙ্গীতদামোদর" অপরখানি "হস্তমুক্তাবলী"। সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থখানি আমরা খণ্ডিত অবস্থায় পেয়েছি, তবে তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যে বাংলার কীর্তনের কিছু বিবরণ অনুপ্রবেশ করেছে, এটা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং শুভংকর যে বাঙালী এটা অনুমান করা চলে। কিন্তু ঐ তাল অংশের লেখক যে শুভংকর একথা নিশ্চয় করে বলা চলে না। বস্তুতঃ সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থখানি দুটি গ্রন্থের সংমিশ্রণ বলে ধারণা জন্মায়— যাদের লেখক হলেন দামোদর সেন ও শুভংকর। এই দামোদর সেন যদি গোবিন্দদাসের সঙ্গে সম্পর্কিত দামোদর সেন হন, তা হলে তাঁর আবির্ভাবকাল হয় ১৫২০ থেকে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু এঁর গ্রন্থে তাল অধ্যায়ে ডাঁশপাহিড, দশকোশী, গঞ্জন ইত্যাদি তাল পাওয়া সম্ভব কিনা সেইটুকুই বিবেচ্য। মনে হয়, শিবনারদ সম্বাদে তালমালা লেখক দামোদর পরবর্তী অন্য কোনো ব্যক্তি হবেন। অবশ্য ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে পূর্বোল্লিখিত তালগুলি ছিল না, একথাও জোর করে বলা কঠিন। সুতরাং দামোদর সম্বন্ধে আমাদের উক্তি তর্কের অপেক্ষা রাখে। শুভংকর ১৭শ শতকের প্রথম দিকের ব্যক্তি বলে মনে হয়। তাঁর তালের বিবরণের সঙ্গে দামোদরের তালের নাম ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। তবে রাগের বর্ণনা দুজনেরই এক রকম, অর্থাৎ দুজনেই নারদসংহিতা নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েই কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। কিন্তু রাগনাম ইত্যাদি বিষয়ে দামোদর ও শুভংকরে মিল নেই। দামোদর যেখানে রাগগুলির নাম বলেছেন মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট, সেখানে শুভংকর নাম করেছেন— ভৈরব, বসন্ত, মালবকৌশিক, শ্রী, মেঘ ও নটনারায়ণ।

শুভংকর কীর্তনে ব্যবহৃত তালের বর্ণনা দেন নি এবং নাট্য-অধ্যায়কে নিয়েই ব্যাপৃত থেকেছেন বেশী; আর এই অবসরে তিনি হস্তমুক্তাবলীর উল্লেখ করেছেন একাধিকবার। অন্যদিকে দামোদর সেন দোজ, জ্যোতি, গঞ্জন, সম, ধরণ, ডাঁশপাহিড়, দশকোষী, ছুটকা, মদনদোলা, ধরাধারা ইত্যাদি কীর্তনাঙ্গ তালের নাম করেছেন, আর নাট্যপ্রসঙ্গকে খানিকটা এড়িয়ে গিয়েছেন। তবু একথা স্বীকার

করতেই হবে যে, দামোদর গ্রন্থখানির মধ্যে দুই বা তিনজন গ্রন্থকারের লেখা এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে কোন্‌টুকু কার লেখা তা খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব। সঙ্গীতদামোদরে সঙ্গীতকল্পবৃক্ষ (রায় গণেশ -কৃত), নাট্যদর্পণ, সঙ্গীতচূড়ামণি, রত্নকোষ (সাগরনন্দিন-কৃত) ও সঙ্গীতসর্বস্ব গ্রন্থের উল্লেখ আছে ; অপরদিকে ভরত-সংহিতা, তুম্বুরুনাটক ইত্যাদির নামও আছে। ভরতসংহিতা থেকেই খুব সম্ভব সকলেই স্থূঢ় প্রবন্ধের ক্ষুদ্র গীতি ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। (মনে হয় এই গ্রন্থখানি পূর্বভারতের, যেখানকার লেখকবর্গ ব্যতীত অপর স্থানের কোনো জ্ঞানী এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি।)

সঙ্গীতদামোদরে আমরা রাসক প্রবন্ধের অপর নাম হিসাবে ছটিকৈলা এবং নিঃসারুক প্রবন্ধের অপর নাম হিসাবে রূপক শব্দটির ব্যবহার দেখি। এ ব্যবহার কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে করা হল সে সম্বন্ধে অবশ্য সঙ্গীতদামোদর নীরব, তবু গ্রন্থকার এই অপর নামগুলির পরিচিতি জানিয়ে চুটকলা ইত্যাদির রূপনিরূপণে আমাদের অশেষ সহায়তা করেছেন। শুভংকর যেমন হস্তমুক্তাবলী নামক গ্রন্থও প্রণয়ন করেছিলেন, নরহরি চক্রবর্তীর মতে দামোদর সেনও সেই রকম পঞ্চমসার-সংহিতা নামক আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নারদকৃত পঞ্চমসার-সংহিতার সঙ্গে এই গ্রন্থখানি মিশে গিয়েছে। তবুও কোথাও কোথাও তাঁকে আমরা অতি সহজেই খুঁজে পাই। তালাধ্যায়ে এক জায়গায় আছে— গুরু দ্রুতদ্বয়ং যস্য চরণে চরণে ভবেৎ। দশকোশীতি তালঃ স্যাৎ খ্যাততালেতি কুত্রচিৎ। অপর এক স্থানে আছে— যস্যাঃ প্রয়াতি পতিরাভি মুখং যুবত্যাঃ মা খণ্ডিতেতি কথিতা কবিশেখরেণ। দশকোশী, কবিশেখর ইত্যাদি নিতান্তই কীর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বা দামোদর সেন প্রমুখ বাঙালীর পক্ষেই জানা বেশী স্বাভাবিক। জেনে রাখা ভালো যে, বাঙালী লেখকরা নারদকৃত গ্রন্থখানিকে নারদসংহিতা নামেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার শুভংকর কোথাও তাঁর বংশ বা শিক্ষাগত কোনো পরিচয় আমাদের জানান নি, শুধু গ্রন্থ মধ্যে আপনাকে কবিচক্রবর্তী বলে অভিহিত করেছেন। এঁদের কারোই অন্তর্ধান সম্বন্ধে কোনো সংবাদ আমরা জানি না।

হরিবল্লভ

দুজন হরিবল্লভের উল্লেখ আমরা পাই এবং তাঁরা প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সঙ্গীতদর্পণকার হরিবল্লভ ১৭শ শতকের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয় আর বৈষ্ণব হরিবল্লভ ছিলেন ১৭শ শতাব্দের

মধ্যভাগে। সঙ্গীতদর্পণ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট, কিছু কিছু উদ্ধৃতি আমরা এখানে-ওখানে পেয়ে থাকি। লেখক হিন্দীভাষায় গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্র এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা তা আমরা বলতে পারছি না। বৈষ্ণব হরিবল্লভ ছিলেন বাঙালী। ইনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন এবং কীর্তনপদাবলীর ইনি ছিলেন প্রথম সংকলয়িতা। সংকলন-গ্রন্থখানির নাম ক্ষণদাগীতচিন্তামণি। হরিবল্লভ কীর্তনবিষয়ক পদ নিজেও রচনা করেছিলেন। কিন্তু অলংকারবহুল হওয়ায় সেগুলি কীর্তনীয়াদের কাছে বিশেষ সমাদব পায় নি। বাঙালী হরিবল্লভের প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ইনি প্রসিদ্ধ নরহরি চক্রবর্তীর পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তীর গুরু ছিলেন। সঙ্গীতদর্পণ রচনা করে হরিবল্লভ হিন্দিতে রাগরূপের বর্ণনা করেছেন এইটুকুই আমরা উদ্ধৃতি হিসাবে পেয়েছি। প্রাচীন সঙ্গীতদর্পণের সঙ্গে এঁর গ্রন্থের কোনো অংশ মিশে গিয়েছে কিনা সেটা বলা সম্ভব নয়। এই পশ্চিমভারতীয় হরিবল্লভের মৃত্যুকাল আমাদের অজ্ঞাত; বাঙালী হরিবল্লভ দেহরক্ষা করেন ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে।

সোমনাথ

সোমনাথ ছিলেন রাজমহেন্দ্রীনিবাসী মেংগনাথের পৌত্র ও মুদ্রলের পুত্র। ইনি একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ, বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ এবং দক্ষিণী ও উত্তরী সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অন্ধ্রদেশীয় এই পণ্ডিত ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে বা তন্নিকটবর্তী সময়ে "রাগবিবোধ" নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সোমনাথ প্রথম "থাট" শব্দটি ব্যবহার করেন; প্রথম উল্লেখ করেন যে, রাগাদির রূপ সম্বন্ধে মতানৈক্য অত্যন্ত প্রবল এবং সেই মতানৈক্য দূর করবার চেষ্টাতেই তিনি একটি নির্দিষ্ট মতকে গ্রহণ করছেন এবং প্রথম অলংকার গমকাদির চিহ্নযুক্ত স্বরলিপি প্রকাশ করেন। সোমনাথ আমীর খুসরো -প্রবর্তিত কয়েকটি রাগনাম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কয়েকটি রাগের লোকপ্রসিদ্ধ নামের উল্লেখ করেছেন এবং স্বকীয় পদ্ধতিতে ৯৬০টি মেলের উদ্ভাবন করেছেন, যদিও ব্যবহারে ২৩টি মেলের কথাই বলেছেন। বীণা সম্বন্ধে অতি খুঁটিনাটি তথ্য সোমনাথই সর্বপ্রথম জানিয়েছেন এবং তথ্যগুলি স্পষ্ট করবার জন্য নিজেই টীকাকার হয়েছেন। রাগবিবোধ থেকেই আমরা টোড়ীর রূপপরিবর্তনের ইঙ্গিত পাই, কল্যাণ যে ইমনের প্রভাবে নূতন রূপ নিয়েছিল তা বুঝতে পারি এবং ইমনকল্যাণ নামটি যে কল্যাণযমন শব্দের মধ্যে

লুকিয়ে ছিল সেটা অনুমান করতে পারি। শিবমত ভৈরব বলে আজ যাকে চালানো হচ্ছে, সে যে কিছুকাল আগে পর্যন্ত সোমমত ভৈরব ছিল, এ তথ্য আমরা প্রাচীন উস্তাদদের কাছে পাই এবং সেই রূপটি যে প্রকৃতপক্ষে সোমনাথের ভৈরবের ধার করা তা বুঝতে দেরী হয় না। দেখা যাচ্ছে, আমরা সোমনাথের কাছে বহুভাবে ঋণী। কিন্তু সোমনাথ তাঁর বিদ্যা কী ভাবে অধিগত করলেন, উত্তরী পদ্ধতি কার কাছে শিখলেন, এ সব সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমাদের কাছে পরিবেশন না করায় আমরা ইতিহাসের পারম্পর্য আবিষ্কারের মস্তবড় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম; কী ভাবে উত্তরী পদ্ধতি অন্ধ্রে উপস্থিত হল, কেন খুসরোর রাগগুলি উত্তরকে ত্যাগ করে অন্ধ্রে অধিষ্ঠিত হল, কে কব্বাল সম্পত্তি দক্ষিণে নিয়ে গেল তা জানবার উপায় রইল না।

লোচন

লোচনের সম্পূর্ণ নাম লোচন ঝা। এঁর পিতা ছিলেন বাবু ঝা। মিথিলার উদ্যান বা উজান গ্রামে লোচনের পূর্বপুরুষ বসবাস করতেন। লোচন ১৭শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন এবং রাজা মহিনাথ ও নরপতি ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। নরপতি ঠাকুরের অজ্ঞাতেই ইনি "রাগতরঙ্গিণী" নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কবি লোচন শর্মা ১৭শ শতাব্দের শেষ দিকে রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর পূর্বে ইনি "সঙ্গীত-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। রাগতরঙ্গিণী লিখবার প্রধান কারণ ছিল তখনকার দিনে প্রচলিত সংকীর্ণ দেশী রাগগুলি সম্বন্ধে অলোচনা করা। কিন্তু এই আলোচনাকালে উদাহরণ স্বরূপে লোচন কেন বিদ্যাপতির পদাবলী বেছে নিলেন তার কারণটুকু বোঝা যায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, লোচনও নিতান্ত স্থানীয় রাগগুলিকে পরিচিত করাচ্ছিলেন, অতএব স্থানীয় ভাষায় লিখিত অথচ কাব্যসম্পদে পূর্ণ কবিতা বেছে নেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল, তবু অন্য কোনো কবির কথা তাঁর মনেই পড়ল না, এইটুকুই খুব আশ্চর্যের কথা। গ্রন্থের মধ্যে কিন্তু আমরা অন্যান্য কবির রচনা পাই। আর রচনাগুলি সবই লীলাকীর্তন অনুসারী। মনে হয়, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিবর্গ এই কথাটিই লোচন 'বিদ্যাপতি রচিতা গীতাঃ' কথাটির মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, লোচন তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কতভাবে উপকার করেছেন সেইটুকুই এখন দেখা যাক। বিদ্যাপতির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাঁকে বলেছেন কবিশেখর বিদ্যাপতি। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যাপতির

একটি উপাধি ছিল কবিশেখর। অন্য জায়গায় লোচন আর-এক কবিশেখরের উল্লেখ করেছেন যিনি নসরৎ সাহের সমসাময়িক ছিলেন। এই কবিশেখরকেও লোচন "ইতি বিদ্যাপতেঃ" বলে বিদ্যাপতির সঙ্গে এক করেছেন। গিয়াসুদ্দীন সুলতানের সমসাময়িক বিদ্যাপতির কথাও এই একই গ্রন্থে আমরা পাই। বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যাপতি নামটুকু দেখেই গ্রন্থকার তাঁর কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, বিদ্যাপতি একজন কি বহুজন এটা দেখতে যান নি। কবিশেখর উপাধি ব্যাপারেও সেই একই পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন। যদিও আমরা কবিশেখরকে হুসেন শাহ থেকে নসরদ্ শাহের সময়ের মধ্যে দেখতে পাই। তবু স্বীকার করতেই হবে যে লোচনের এই উদাহরণগুলি ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান জুগিয়েছে। রাগরাগিণীর দিক থেকেও গ্রন্থকার বহু নূতন তথ্য দিয়েছেন— ভঠিআল, বরাডী, জোগিয়া, মালব, সম্ভোগিণী ইত্যাদি অনেক রাগের নাম করেছেন, যেগু'লি রাগরাগিণী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লোচন হনুমৎ-এর মতানুসারে ৬টি রাগের নাম করেছেন। যথা ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ, আর এদের ৫টি করে পত্নীর নাম দিয়েছেন। এই রাগিণীগুলির বহু প্রকারভেদ লোচন বর্ণনা করেছেন যা তখনকার দিনে ত্রিহুতে প্রচলিত ছিল। এর পর লোচন দেশীয় সংকীর্ণ রাগগুলির উল্লেখ করেছেন, যার কয়েকটি আমাদের ঐতিহাসিক ভ্রান্তিনিরসনে সাহায্য করবে। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে দণ্ডক শব্দটি আমরা পেয়েছি, যার অর্থ সেখানে বুঝি নি। লোচন দণ্ডক আসাবরী, ও দণ্ডককোড়ার রাগ দুটির বিবরণ দিয়ে দণ্ডক শব্দটিকে স্পষ্ট করেছেন। পঞ্চম তরঙ্গে লোচন যন্ত্রজ রাগের আলোচনাকালে ঠাটের উল্লেখ করেছেন সংস্থিতি নাম দিয়ে; তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "বীণায়াং সর্ব রাগানাং স্বরাণাং সংস্থিতিস্তু যা তস্যা বাদনমাত্রেণ স্বরব্যক্তি প্রজায়তে।' অর্থাৎ এই প্রকরণে তিনি রাগের স্বররূপ প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি স্বরসপ্তকের রূপ প্রকাশ করেছেন, জানিয়েছেন যে তাঁর সময়ে দীপক রাগ প্রচলিত ছিল না (সর্বৈর্মিলিত্বা দীপকোপিলেখ্যঃ) আর ভৈরবী রূপ বদলাচ্ছে। অনেকে লোচনকে ১৪শ এমন-কি ১১শ শতকের ব্যক্তি বলবার প্রয়াস পেয়েছেন, দীপক ভৈরবী ইত্যাদির বিচার দেখলে সে প্রয়াস বৃথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক বোধ হবে। শুধু তাই নয়, লোচন নিজেই এক জায়গায় বলে গিয়েছেন, "এতেন রাগিণীষ্বপি রাগপদ প্রয়োগঃ সাধুঃ, অতএব··· দেশাখরাগঃ কিল মল্লমূর্ত্তিরিতি।" দামোদর "প্রয়োগোপি সংগচ্ছতে" —অর্থাৎ তিনি ১৭শ শতকের সঙ্গীতদর্পণকার দামোদরের নামোল্লেখ করে আপনাকে ১৭শ শতকের বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

লোচনের বহু রাগের রূপ আজও প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হৃদয়নারায়ণ ঐ রাগরূপগুলিকে নিজগ্রন্থে সযত্নে স্থান দিয়েছেন। লোচন শর্মার জীবনী বা মৃত্যুকাল সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানি না। তাঁর সংস্কৃতজ্ঞান ও কাব্যের নমুনা আমরা পাই এবং তা উচ্চস্তরের বলেই আমাদের ধারণা জন্মে।

দামোদর

বাংলার বাইরে যে সকল লেখক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম হল দামোদরের। দামোদর মহারাষ্ট্রদেশীয়. লক্ষ্মীধরের পুত্র। খুব সম্ভব ইনি ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৬২৫-৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইনি সঙ্গীতদর্পণ নামে একখানি সংকলন-গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিই দামোদরের একমাত্র পরিচয়। এঁর সম্বন্ধে অন্য কোনো পরিচয় আমরা পাই নি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে, বেদ নামক যে গ্রন্থকার "সঙ্গীত-মকরন্দ" নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ ১৭শ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রচনা করেছিলেন তিনি ছিলেন দামোদরের পুত্র অনন্তের শিষ্য। দামোদরের সঙ্গীতদর্পণ গ্রন্থখানি, কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে না; শুধু নৃত্য সম্বন্ধীয় প্রকরণটি প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য অধ্যায়গুলি সংগীতরত্নাকর ও অপরাপর গ্রন্থের সংকলন বললে অত্যুক্তি হয় না। মনে হয়, প্রাচীনতর সঙ্গীতদর্পণের প্রসিদ্ধি ভুলক্রমে দামোদরকৃত সঙ্গীতদর্পণের স্কন্ধে চাপানো হয়েছে। তবু যে কয়েকটি ব্যাপারে সঙ্গীতদর্পণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। একটি হল শারীরবিবেক অন্তর্গত বিভিন্ন চক্র সম্বন্ধে আলোচনা যা অন্য কোনো সঙ্গীতগ্রন্থে পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয়টি হল গানের পাঁচটি নাম; গীত, রূপক, বস্তু, প্রবন্ধ ও গেয়— যা অন্য দু-একটি গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে মেলে না। তাল অধ্যায়ে পাই ৩২ প্রকার মঠের পরিচয়, যা অন্যত্র দুর্লভ; আর নৃত্য অধ্যায়ে মুখচালি ইত্যাদির যেরূপ বিশদ আলোচনা আছে অন্য সঙ্গীত গ্রন্থে তদ্রূপ মেলে না। দামোদর মধ্যযুগে প্রচলিত নৃত্যপদ্ধতি ও নৃত্যপ্রকার সম্বন্ধে অতিবিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, যার থেকে আমরা আধুনিক কালে ব্যবহৃত নৃত্যরীতির রূপান্তর অনুমান করে নিতে পারি; কতকগুলি নৃত্য পরিভাষাকেও আমরা আধুনিক নৃত্যে আজও সেই অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখি। সঙ্গীতদর্পণের যতিনৃত্য আজও যতিস্বরম্ হয়ে বেঁচে আছে; আজও যতিবাদ্যাক্ষরগুলি অর্থাৎ তকিট তকিট ধিকিট থৈ থাতি থৈ থৈ থৈ ইত্যাদি ভারত-নাট্যমের বিশিষ্ট অংশ ও দাক্ষিণাত্যের শব্দম্ সঙ্গীতদর্পণেরই শব্দনৃত্যের সংস্করণ।

দামোদর গ্রন্থ লিখেছিলেন বলেই, আমরা দক্ষিণী জৈথিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্ ইত্যাদির অর্থ এবং ব্যবহার-বিশিষ্টতা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি; আর কিছুর জন্য না হোক, শুধু এইটুকু উপকারে জন্যই আমরা দামোদরের কাছে ঋণী।

হৃদয়নারায়ণ দেব

'গড়া'র অধিপতি হৃদয়নারায়ণ শাজহানের সমসাময়িক। ১৭শ শতকের প্রথম দিকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা ছিলেন প্রেমনারায়ণ শাহ। প্রেমনারায়ণ যুদ্ধে ঝুঝর সিংএর হাতে নিহত হন, যিনি গড়া রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে শাজহান গড়া রাজ্য হৃদয়নারায়ণকে অর্পণ করেন। কিন্তু বেশীদিন ইনি রাজত্ব করনে পারেন নি; ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে আবার রাজ্য হারিয়ে ইনি পুত্র ছত্রশা ও হরসিংকে নিয়ে জব্বলপুরের নিকটস্থ মণ্ডলায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। হৃদয়নারায়ণ দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থ-গুলির মধ্যে রাগতরঙ্গিণী ও সঙ্গীতপারিজাতের অনুকরণ অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে আছে। "হৃদযকৌতুক" গ্রন্থখানিতে রাগতরঙ্গিণীর সংস্থিতিগুলিকে সংস্থান নাম দিয়ে সাজানো হয়েছে, বহুস্থলে ভাষা পর্যন্ত এক রাখা হয়েছে। "হৃদযপ্রকাশে" সঙ্গীতপারিজাতের অনুকরণে সংস্থিতিকে বলা হয়েছে মেল এবং সারংগ মেল সৃষ্টির কারণে মধ্যমকে বলা হয়েছে অতিতীব্রতম গান্ধার। গ্রন্থ দুখানিতে রাগগুলির সংক্ষিপ্ত স্বরপরিচয়ও দেওয়া আছে। অনুকরণ হলেও হৃদয়নারায়ণ যে গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনো স্বকীয়তা প্রকাশ করেন নি, তা নয়। শুদ্ধ মেল, একটি বিকৃত স্বরযুক্ত মেল, দুটি স্বরযুক্ত মেল ইত্যাদি বিভাগ হৃদয়নারায়ণ দেবই প্রথম কল্পনা করেছিলেন; হৃদযরমা মেল এঁর নিজস্ব সৃষ্টি যাতে ইনি উচ্চশ্রুতির ব্যবহার দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। হৃদয়নারায়ণের গ্রন্থ আমাদের আর একটি দিক দিয়ে সাহায্য করেছে, কতকগুলি রাগনাম সেখানে আছে যা আধুনিক কয়েকটি রাগের রূপপরিবর্তনের আভাস দেয়— শুদ্ধকল্যাণ, শুদ্ধনাট, শ্রী, বাগেশ্বরী ইত্যাদি রাগ কী ভাবে প্রাচীন নাম ও রূপ ত্যাগ করে নবীন নাম এবং রূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তার ইঙ্গিত গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে দু-একটি মন্তব্যের প্রয়োজন ঘটছে। আমরা দেখেছি যে, সংগীতপারিজাত, রাগতরঙ্গিণী ইত্যাদি হৃদয়নারায়ণের গ্রন্থের উৎস; সব কখানি গ্রন্থেই অতি তীব্রতর গান্ধারের প্রয়োগের কথা লেখা আছে; কোন্‌খানি আগে রচিত হয়েছে, কোন্‌খানি পরে সে ব্যাপার নিয়েও যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। তবু ইতিহাসের

দিক দিয়ে এবং বিষয়বস্তুর স্থাপনার দিক দিয়ে কিছু তর্কের অবকাশ থাকছে। হৃদয়নারায়ণ ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে যদি রাজ্য ফিরে পেয়ে থাকেন এবং তাঁর গ্রন্থে যদি গড়াদেশনরেশ বলে নিজ পরিচয় দিয়ে থাকেন তা হলে হৃদয়নারায়ণ নিশ্চয়ই ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত হবার পূর্বে গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন। অপর দিকে লোচন রাগ-তরঙ্গিণী রচনা করেছিলেন ১৬০৩ শকে অর্থাৎ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। দুজনেই ভৈরবীতে গান্ধার ও নিষাদ কোমল বলেছেন। হৃদয় কোনো মন্তব্য করেন নি, অথচ লোচন ভৈরবীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদিকে অহোবল ভৈরবীর পরিবর্তনকে সযত্নে নিজগ্রন্থে মেনে নিয়েছেন। হৃদয় যেখানে রাগরূপের সামান্য উল্লেখ করেছেন সেখানে লোচন অবান্তরবোধে বা বাহুল্যভয়ে শুধু রাগনাম দিয়ে ক্ষান্ত থেকেছেন, আর অহোবল অনেকটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হৃদয় ঠাট, সংস্থান ও মেল তিনটি নামই ব্যবহার করেছেন, লোচন শুধু সংস্থিতি এবং পারিজাতকার শুধু মেল নামটিই গ্রহণ করেছেন। এতগুলি তথ্য আলোচনার ফলে আমরা ধারণা করতে পারছি যে, তিনজনে সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, যদিও ২৫-৩০ বছর আগে-পরে তাঁদের গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল; অথবা তাঁদের সময় নির্ণয়ে ভুল আছে। এমন কোনো গ্রন্থ হয়তো লোচন ও অহোবল পেয়েছিলেন (দুজনেই পূর্বদেশীয় বলে তা পাওয়াও সম্ভব ছিল) যার বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদিত তথ্য ও তত্ত্ব দুজনেই অনুসরণ করেছিলেন; আর হৃদয় ঐ অনুসরণকে আশ্রয় করেছিলেন। আমাদের ধারণা এই যে, অহোবল সঙ্গীতদর্পণকারের কিছু পূর্ববর্তী ছিলেন যে সময়ে ভৈরবী নূতন রূপ গ্রহণ করছে; লোচন ছিলেন দর্পণকারের কিছু পরে যখন তিনি ভৈরবীর রূপ পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছেন; আর হৃদয় এসেছিলেন তারও পরে এবং এসে প্রতিপাদ্য বস্তুগুলিকে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ বিবেচনা অনুসারে পরিপাটি করে সাজিয়েছিলেন। কল্যাণের স্থানে শুদ্ধকল্যাণ, শ্রীগৌরীর স্থলে শ্রী ঐ ইঙ্গিতই দেয়।

শ্রীনিবাস

অজ্ঞাতপরিচয় শ্রীনিবাস সম্বন্ধে দু-একটি কাহিনী কোথাও কোথাও প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে এঁর জন্মকাহিনী, জন্মস্থান সম্বন্ধেই আমরা অজ্ঞ, সেখানে কাহিনী যে নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত তা বুঝতে দেরি হয় না। এ কাহিনী এসেছে সঙ্গীতপারিজাতের অনুকরণজাত "রাগতত্ত্ববিবোধ" নামক গ্রন্থখানির প্রচারের কারণে। গ্রন্থখানিতে অহোবলের প্রতিপাদিত বিষয়গুলিকে

ঠিক সেই ক্রম ও পারম্পর্য অনুসারেই স্থান দেওয়া হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন পারিজাত গ্রন্থখানিই রাগতত্ত্ববিবোধ নাম গ্রহণ করেছে। আমরা অবশ্য শ্রীনিবাসকে এতটা জঘন্য পরস্বাপহরণকারী বলে মনে করি না। কারণ আমরা জানি, মধ্যযুগে এমন টোকাটুকি অতি স্বাভাবিক রীতি ছিল; তা ছাড়া শ্রীনিবাস তাঁর গ্রন্থে এমন কিছু কিছু বস্তুও দিয়েছেন যা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব; সুতরাং তাঁকে আমরা চোর অপবাদ দিতে পারি না। শ্রীনিবাস গমকের কতকগুলি নাম দিয়েছেন, যা সোমনাথ ও অহোবলের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। কিন্তু এ গুলি ছাড়াও 'পূর্বাহত', 'হতহত', 'তারাহত' নামগুলি শ্রীনিবাস উদ্ভাবন করেছিলেন যা সোমনাথের রাগবিবোধেও পাই না। সোমনাথ ও আহোবল মধ্যযুগের বীণাবাদনের বিভিন্ন গমকব্যবহারের প্রায় সব কিছুই জানিয়েছেন, বাকিটুকু জানিযেছেন শ্রীনিবাস।

শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় স্বকীযতা হল রাগরূপপ্রকাশক ধাতুগুলির নূতন নাম প্রচার। নামগুলি হল— উদ্‌গ্রাহ, স্থাযী, সঞ্চারী ও মুক্তায়ী বা সমাপ্তি। এই ধাতুগুলির ছোট অংশকে শ্রীনিবাস বলেছেন "তান"। দেখা যাচ্ছে ১৭শ শতকে স্থায়ী শব্দটি ধ্রুবর স্থান অধিকার করেছে এবং সঞ্চারী শব্দটি ধাতুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

মুক্তায়ী শব্দটি অবশ্য আভোগের অর্থপ্রকাশক, কাজেই এই শব্দ কোনো নূতনত্ব দেখাচ্ছে না। গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা শ্রীনিবাসকে যতটুকু আবিষ্কার করলাম, তার বেশী এঁর সম্বন্ধে আমরা জানি না, শুধু অনুমান করে নিতে পারি, ইনি উত্তরভারতীয় এবং বাংলার কাছাকাছি কোনো স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীনিবাসের জীবিতকাল ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগ বলে ধরে নেওয়া চলে।

লোচন, অহোবল ও শ্রীনিবাসের গ্রন্থ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে, ভারতীয় সঙ্গীতে জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বা তারও আগে শ্রুতির শাসন শেষ হয়েছে এবং ১২টি স্বরের ব্যবহার স্থায়ী আসন পেয়েছে। দক্ষিণে এরূপ ব্যবহার বহু আগে থেকেই ছিল, ৭ম শতকেও তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি; এখন কর্নাটক প্রভাব, মুসলিম প্রভাবও খুব সম্ভব য়ুরোপীয় প্রভাবের ফলে উত্তরভারতেও ১২টি স্বরের সপ্তক প্রচলিত হল॥

ভাবভট্ট নিজগ্রন্থে আপনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জনার্দন ভট্ট, মাতা ছিলেন স্বপ্নভবা। ধবলপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন ইনি।

১৭শ শতকের প্রথম চতুর্থাংশের শেষ ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। পিতা জনার্দন ভট্ট শাজহানের দরবার-পণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞানী বিধায় সঙ্গীতরাজ বলে সম্বোধিত হতেন। ভাবভট্টও সঙ্গীতজ্ঞানী ছিলেন এবং ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইনি অনুপসিংহের দরবারে চলে যান আর বিকানীরে অবস্থানকালে অনুপসঙ্গীতবিলাস, অনুপসঙ্গীতরত্নাকর, অনুপসঙ্গীতাংকুশ এবং মুরলী-প্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে ভাবভট্ট আপনাকেও সঙ্গীতরাজ রূপেই সম্বোধন করেছেন।

করণসিংহের পুত্র অনুপসিংহ ১৬৭৪ থেকে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিকানীরে রাজত্ব করেন, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে ভাবভট্ট তাঁর গ্রন্থগুলি ১৭শ শতকের শেষ ভাগে ও ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থগুলিতে নূতন কোনো কথা নেই, তবে বিভিন্ন কানরা, মল্লার, নট ইত্যাদি বিভাগ বেশ সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে; ধ্রুপদ ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়া আছে; আর দু-একটি চমৎকার প্রয়োজনীয় মন্তব্য আছে, যেমন "জো দরবারী সো সুদ্ধ কহাবে" অর্থাৎ যাকে দরবারী বলছি আসলে সে শুদ্ধ কানরা।

ভাবভট্ট সংস্কৃত ও হিন্দী দুই ভাষাতেই গ্রন্থ লিখেছেন। অনুপসঙ্গীত-বিলাসে ইনি ৭০টি রাগের বিবরণ দিয়েছেন। অনুপসঙ্গীতরত্নাকরে ইনি ২০টি মেলকে আশ্রয় করে রাগ বিভাগ করেছেন। ভাবভট্ট রাগগুলির যা পরিচয় দিয়েছেন তা খুব স্পষ্ট নয়, সুতরাং সেই পরিচয়-দ্বারা আমাদের খুব উপকার হয় না। ইনি অনুকরণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কাজেই নিজে কী বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় নি অনেক ক্ষেত্রে। তবে ভাবভট্ট-কৃত ধ্রুবপদের সংজ্ঞা অনন্য হয়ে রইবে চিরকাল।

রঘুনাথ নায়ক

উত্তরভারতীয় গুণীজ্ঞানীদের সমসময়ে ১৭শ শতাব্দীতে যে সকল দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ বর্তমান ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে ছিলেন রঘুনাথ নায়ক।

রঘুনাথ নায়ক ছিলেন তঞ্জোরের রাজা; ইনি ১৬০৪ থেকে ১৬৬০ (?) খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

ইনি বিদ্বান ও সঙ্গীতমর্মজ্ঞ ছিলেন। বহু গুণী-জ্ঞানীকে রঘুনাথ তাঁর সভায় স্থান দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্যংকটমখীর পিতা গোবিন্দ দীক্ষিত। গোবিন্দ দীক্ষিতের সহায়তায় রঘুনাথ "সঙ্গীতসুধা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই

গ্রন্থে ১৫টি মেলের ও ৫০টি রাগের বর্ণনা আছে। রঘুনাথ শুদ্ধ মেল ও মধ্য মেল -বীণার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন যা তাঁর পূর্বে একমাত্র সোমনাথ স্পষ্টভাবে করেছিলেন।

রঘুনাথ নায়কের রাজত্বকালে কয়েকজন দক্ষিণী সঙ্গীতজ্ঞেরও উদ্ভব হয়েছিল, যাঁরা দক্ষিণভাবতীয় সঙ্গীতকে নানাভাবে উন্নত করে গিয়েছিলেন। ১৭শ শতকের এইসব গুণীর মধ্যে আমরা নাম করতে পারি "মার্গদর্শী শেষ অইয়ংগর" "ঘনং সৌনইয়" "ক্ষেত্রজ্ঞ" ও "ভদ্রাচলম্ রামদাসে"র। এঁদের পরে এসেছিলেন "গিরিরাজ কবি" ও "শাহজী"; অবশ্য আবও অনেকেই ছিলেন যাঁদের নাম দক্ষিণী ইতিহাসকাবেবা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন।

মার্গদর্শী শেষ অইয়ংগর একজন কীর্তনরচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। ইনি শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথ স্বামীর ভক্ত ছিলেন। ১৬শ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করে ১৭শ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ইনি বর্তমান ছিলেন।

ঘনং সৌনইয় অন্ধ্রদেশীয। এই সংগীতজ্ঞ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কীর্তন এবং পদম্ -পদ্ধতির কতকগুলি গান তেলেগু ভাষায় রচনা করেছেন। ১৭শ শতকের প্রথম দিকে ইনি বর্তমান ছিলেন।

ক্ষেত্রজ্ঞ অন্ধ্রদেশীয়। এই সঙ্গীতজ্ঞ ১৭শ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণা জেলার মুব্বপুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁকে ক্ষেত্রাইয়া নামেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ গ্রামের গোপাল স্বামীর ভক্ত ছিলেন এবং অল্পবয়স থেকেই গোপালের নামে ভজনাত্মক গান রচনা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে এঁর কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ হয় এবং ইনি অতি মনোহর ও উচ্চশ্রেণীর পদম্-পদ্ধতির কবিতা রচনা করতে থাকেন, যার তুলনা দক্ষিণ ভারতে নেই। পদম্-এ রাগ-প্রয়োগও করতেন ইনি ভাবানুকূল করে। বিজয়রাঘব নায়কের রাজত্বকালে ক্ষেত্রজ্ঞ বহুকাল তঞ্জোরে অবস্থান করেছিলেন, পরে নানা তীর্থে ভ্রমণ করে আপনার ভক্তি অর্ঘ্য গানের মাধ্যমে ভগবানকে অর্পণ করে ফিরেছেন। ১৭শ শতকের শেষদিকে ক্ষেত্রজ্ঞের মৃত্যু হয়।

ভদ্রাচলম্ রামদাস ছিলেন তেলেগু ব্রাহ্মণ গোপন্নামাত্যের পুত্র। ১৭শ শতকের প্রথম ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রামদাস রামভক্ত ছিলেন এবং রাম ভজনাত্মক উচ্চশ্রেণীর কীর্তন রচনা করেছিলেন। ইনি ১৭শ শতকের শেষভাগে দেহত্যাগ করেন।

গিরিরাজ কবি ছিলেন বিখ্যাত ত্যাগরাজের পিতামহ। তেলেগু জাতীয়

এই ব্রাহ্মণ ১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কীর্তনকার ছিলেন এবং পণ্ডিত হিসাবে তঞ্জোররাজ শাহজীর সম্মানাস্পদ ছিলেন।

শাহজী ছিলেন তঞ্জোরের মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি একোজীর পুত্র। ইনি ১৬৮৪ থেকে ১৭১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেছিলেন। শাহজী বহুভাষায় পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ এবং কীর্তন ও পদম্-রচনাকার ছিলেন। শাহজীর জীবনীর পরে আবার আমরা শাস্ত্রকারদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ব্যাংকটমখী

ব্যাংকটমখীর প্রকৃত নাম ছিল বেংকটেশ্বর দীক্ষিত। এঁর পিতা ছিলেন গোবিন্দ দীক্ষিত ও মাতার নাম ছিল নাগমাম্বিকা। গোবিন্দ দীক্ষিত রাজা রঘুনাথ নায়কের মন্ত্রী ছিলেন। ব্যাংকটমখী ১৬শ শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিজয়রাঘবের রাজত্বকালে রাজসভার প্রধান গায়ক হন। ইনি তানপ্পাচার্য নামক এক গুণীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। ব্যাংকটমখীর মতে তানপ্পাচার্য ছিলেন সঙ্গীতরত্নাকর-প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের শিষ্যবংশীয়। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বেংকটমখী "চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা" নামক একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। চতুর্দণ্ডী বলতে বেংকটমখী কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। পূর্বে চতুর্দণ্ডী মানে ছিল চারিটি গান ক্রিয়া, অর্থাৎ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণ। পরবর্তীকালে চতুর্দণ্ডীর মানে হয় গীত, আলাপ, স্থায় ও প্রবন্ধের মিলিত অবস্থা। বেংকটেশ্বর তাঁর গ্রন্থে এগুলি ছাড়া বীণা, শ্রুতি, স্বর, মেল, রাগ এবং তালের কথাও বলেছেন। অথচ নাম রেখেছেন চতুর্দণ্ডী। চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকায় যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল সপ্তকে বারোটি স্বর ব্যবহার করে অংকশাস্ত্রের সহায়তায় "বাহাত্তরটি মেলে"র প্রবর্তন। বেংকট ৭২ মেল প্রবর্তনকালে এক-একটি স্বরের ৫টি করে শ্রুতি পর্যন্ত গতায়াত স্বীকার করেছিলেন, যার ফলে হিন্দুস্থানী রে, গা ইত্যাদি স্বরগুলি কখনো নিজনামে কখনো-বা অন্যনামে পরিচিত হয়েছে— যে নিয়ম উত্তর ভারতে অচল। অবশ্য বেংকটের রগা, রগি ইত্যাদি আমরা সপ্তম শতকে কুডুমিয়ামলাই লিপিতেও দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বেংকট যখন ৫ শ্রুতি গতায়াতের কথা বলছেন, তখন উত্তর ভারতীয় অহোবল, লোচন ৬ শ্রুতি গতায়াতের পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এই গতায়াত পদ্ধতিটি কী ভাবে জন্মালো জানা যায় না। আমরা পদ্ধতিটি সম্বন্ধে অল্পকাল পূর্বে একটা অনুমান গড়ে তুলেছি মাত্র। এই অনুমানের ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে,

দক্ষিণে যখন ৭২ মেল সম্ভব, উত্তর ভারতে তখন ৯০টি ঠাট হওয়া উচিত। যাই হোক ব্যংকটমখার এই মেল-প্রবর্তন দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত-রীতিকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ প্রদান করল, তার প্রাচীন সংস্কার লুপ্ত করে দিল। অনেকের মতে এই ৭২ মেলের কোনো নামকরণ ইনি করে যান নি, অন্তত বেংকটের গ্রন্থে কোথাও নামের কোনো ইঙ্গিত নেই ; সুতরাং নামগুলি পরবর্তীকালে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রচার করেছিলেন। এঁদের এই মতকে গ্রহণ করাও শক্ত, বর্জন করাও শক্ত ; তবে পরবর্তীকালের "রাগলক্ষণম্" গ্রন্থে নামগুলি যখন রয়েছে, তখন সেগুলি পূর্বকালীন বেংকটেশ্বর-লিখিত অন্য কোনো গ্রন্থের নামের অনুলিপির সামান্য পরিবর্তিত অবস্থা যে নয়, তাই বা নিঃসন্দেহে বলতে পারি কি করে ? বেংকটের আরো দু-একখানি গ্রন্থ ছিল বলে তো শোনা যায়। তবে বেংকট কচটতপয়াদির প্রয়োগ যে করেন নি একথা সত্য— যে প্রয়োগ সর্বপ্রথম করেছিলেন অকলংক। বেংকট তাঁর সময়ে প্রচলিত রাগকে বিভক্ত করেছিলেন ১৯টি মেলে, যার মধ্যে সিংহরব নামে তাঁর নিজের কল্পিত একটি মেল ছিল। বেংকট সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানি না। বেংকটেশ্বর দীক্ষিতের পরে যে সঙ্গীতশাস্ত্রীকে আমরা পাচ্ছি তিনি হলেন "অকলংক"।

অকলংক

অকলংক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। কোনো মতে ইনিই গোবিন্দ আচার্য, সংগ্রহচূড়ামণি গ্রন্থের লেখক। আমাদের মনে হয় ইনি পৃথক ব্যক্তি। অকলংক সঙ্গীতসারসংগ্রহ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাতে ২৪টি শ্রুতিসংখ্যার হিসাব আছে এবং যড়্জ ও পঞ্চমকে পাঁচটি করে শ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অকলংকই মেল-নামকরণে কচটতপয়াদি পূর্বনাম সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন যার জন্য মেলসংখ্যা ও মেলনাম জানবার সহজ উপায় পাওয়া গিয়েছিল। অকলংক বেংকটের মেলগুলির নামও কিছু কিছু পরিবর্তিত করেছিলেন। ত্যাগরাজের গুরু-বংশে অকলংকের ৭২ মেলের নাম জানা ছিল। কিন্তু নামগুলি ছিল উলটাপালটা করা। অকলংক সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সবই ত্যাগরাজের শিষ্যবংশ থেকে পরবর্তী কালে পাওয়া গিয়েছিল। ইনি একদিকে যেমন ৭২ মেলের প্রচলনে সহায়তা করেছিলেন তেমনি ২৪ শ্রুতির ব্যবহার দেখিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই ২৪ শ্রুতির তথ্য অকলংক কোথা থেকে পেয়েছিলেন সে সংবাদ আমরা পাই নি, তবে মনে হয় প্রাচীন কর্ণাটে বা দক্ষিণ-ভারতের অন্য কোথাও হয়তো এই ২৪ শ্রুতির হিসাব প্রচলিত ছিল।

অকলংককে অনুসরণ করেছিলেন গোবিন্দ আচার্য।

গোবিন্দ আচার্য

গোবিন্দ আচার্য অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। ইনি কোনো আন্ধ্রদেশীয় সঙ্গীত-জ্ঞানী হওয়াই সম্ভব। গোবিন্দ আচার্য ৭২ মেলের প্রচলনে সহায়তা করেছেন, কিন্তু ২৬টি মেলের নূতন নাম দিয়েছেন। দক্ষিণী বীণাকেও ইনি পরিবর্তিত করে রূপ দিয়েছেন। এঁর গ্রন্থের নাম "সংগ্রহচুড়ামণি"। মনে হয়, এই গ্রন্থের কিছু অংশ "রাগলক্ষণম্" নামক গ্রন্থে ঘোষিত করা হয়েছিল। গোবিন্দ আচার্য খুব সম্ভব ১৭শ শতকের শেষ দিকে জন্মেছিলেন।

১৭শ শতকে উত্তর ভারতে কয়েকজন মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞানী জন্মেছিলেন, যাঁদের অনেকেই সঙ্গীত-ইতিহাস সৃষ্টিতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন বলে আজ আমরা মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে দ্বিধাহীনচিত্তে অনেক তথ্য পরিবেশন করবার সাহস পাচ্ছি। এই সব সঙ্গীতোৎসাহ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সৈফউদ্দিন মহম্মদ ফকীরুল্লা।

ফকীরুল্লা

ফকীরুল্লা ১৭শ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঔরংজেবের রাজত্বকালে কাশ্মীরের সুবাদার ছিলেন। ইনি কট্টর মুসলিম ছিলেন। বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে এঁর হাত ছিল। ধর্মান্ধ হলেও ফকীরুল্লা ছিলেন সঙ্গীত-প্রেমিক এবং হিন্দুদের সঙ্গীতকে ইনি উদারভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ঔরংজেবের সংকীর্ণ নীতির ফলে যখন সঙ্গীতজীবীদের শিল্পচর্চা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তখন ইনি বহুসংখ্যক গুণী-জ্ঞানীকে আশ্রয় দিয়ে সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফকীরুল্লা "রাগদর্পণ" নামে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থখানিতে মানসিংহ তোমরের "মানকুতুহল" গ্রন্থের বহু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে; তা ছাড়া, অকবর থেকে ঔরংজেবের রাজত্বকালের মধ্যে যে সকল গুণী ছিলেন বা সঙ্গীতের যে সকল উপাদান ছিল তাদের অনেক কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থের সহায়তার ফলেই আমরা বহু সঙ্গীতজ্ঞের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হয়েছি।

মীর্জা খাঁ

মীর্জা খাঁ বা মীর্জা খাঁ ইবন ফকরুদ্দীন মহম্মদ ১৭শ শতকের শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন —ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে এঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। আজম খাঁর আশ্রয়ে ইনি "তোফ্‌তুল হিন্দ্" নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন, যার একটি অংশে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মীর্জা খাঁ রাগরাগিণী-বিভাগ স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু নামকরণে নিজস্ব মত প্রচার করেছিলেন। ইনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম বেলাবল ঠাটকে শুদ্ধ সপ্তক বলে প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

শের খাঁ লোদী ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি "মুরাতুল খ্যাল" নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর "আবদুল মজীদ লাহোরী" "বাদশানামা" নামক গ্রন্থের মাধ্যমে শাজহান ও ঔরংজেবের উপাদান সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

মুগল খাঁ ও হুমামুদ্দীন খাঁ ঔরংজেবের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। ফকীরুল্লার মতে এঁরা সঙ্গীতশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১৭শ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে যাঁরা এসেছিলেন এখন তাঁদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। এই আলোচনায় আমরা তাঁদের কথাই বলব যাঁরা মহম্মদশার রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং ইংরাজ রাজত্বের গোড়াপত্তন দেখে গিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঔরংজেবের কঠোর ধর্মনীতি প্রচারের ফলে সঙ্গীতজীবীরা যখন রাজ-অনুগ্রহ হারালেন, তখন তারা ছড়িয়ে পড়লেন নানাদিকে এবং কিছুকালের মধ্যেই অনেকে সঙ্গীতজগত থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলেন। বিভিন্ন রাজ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে চর্চা রয়ে গেল বটে, কিন্তু স্থানীয় হওয়ায় তার প্রভাব বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল না, আর এইভাবে ঘরানা নামক বস্তুটি নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকল। তানসেন, বৈজু, গোপালের ধ্রুপদ দরবারে প্রচলিত রইল বটে, কিন্তু উৎসাহের ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তার প্রচার ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকল। ঔরংজেবের পরবর্তী বাদশা যাঁরা এলেন, তাঁরা ব্যসনপ্রিয় ও লঘুচিত্ত হওয়ার জন্য দরবারেও ধ্রুপদের আদব কমতে থাকল, আর খ্যাল ইত্যাদি গানরীতি তাদের কমনীয়তা চপলতা ও নূতনত্বের সহায়তায় দরবারে উচ্চ আসন অধিকার করতে আরম্ভ করল। এই সময়ে ধ্রুপদী বলতে বোঝাত শুধু গুলাব খাঁ ও ইচ্ছাবরসকে; বাকী সকলেই ছিলেন খ্যালী। ন্যামৎ খাঁ কবাল, গুলাম রসুল, মিঞা জানী, হাসির খাঁ ছিলেন জন্মগত অধিকারে খ্যালী, আর সদারং, অদারং, মনরং ধ্রুপদী হয়েও খ্যালকে গ্রহণ করেছিলেন যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্য।

গুলাব খাঁ

গুলাব খাঁ ছিলেন বিলাস খাঁর পুত্রবংশীয় হসন্ খাঁর পুত্র। ইনি মহম্মদ শার দরবারে ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু সেনী বংশাবলী দেখলে ঐ প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। মনে হয় মহম্মদ শার সময়ে হসন্ খাঁই বর্তমান ছিলেন। গুলাব খাঁ তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক। আমরা জানি, গুলাব খাঁর পুত্র হলেন ছজ্জু খাঁ, যার পুত্র জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বাসৎ খাঁ ১৮শ শতকের শেষভাগে জন্মেছিলেন; সুতরাং গুলাব খাঁর জন্ম ১৮শ শতকের আগে হওয়া সম্ভব নয়। তা হলে মহম্মদ শার রাজত্বকালে ইনি দশ-পনেরো বছরের বালক ছাড়া কিছু হতে পারেন না। আমরা এইটুকু বলতে পারি যে, মহম্মদ শার রাজত্বের শেষ দিকে গুলাব খাঁ দরবারে আসন পেয়েছিলেন। কিন্তু ফকীরুল্লার বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি যে সিধার খাঁ যখন ঔরংজেবের রাজত্বকালে ছিলেন এবং হসন্ খাঁ যে সময় পূর্ণবয়স্ক, তখন মহম্মদ শার আমলে গুলাব খাঁর পূর্ণযৌবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অবশ্য

গুলাব খাঁর এমন কোনো গান পাই না যা থেকে আমরা এঁকে মহম্মদ শার সময়ের ব্যক্তি বলে ভেবে নিতে পারি ; র এই কথাই বেশী বিচারসহ মনে হয় যে সেনী পুত্রবংশীয় কন্যাবংশীয় গুণীরা এই সময়ে দরবার ত্যাগ করে অন্যত্র স্থান করে নেবার চেষ্টা করছেন, শুধ্ সদারং মনোরঞ্জনকারী খ্যাল সৃষ্টি করে দরবারে সেনী আসন প্রতিষ্ঠিত রাখবার প্রয়াস পাচ্ছেন। যাই হোক প্রচলিত মত অনুসারে গুলাব খাঁ মহম্মদ শার রাজত্বকালে দরবারের ধ্রুপদগায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেনী ঘরানার একজন বিশিষ্ট গুণী হিসাবে তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ধারণা সেনী পুত্রবংশীয় দরবারী গুণীবর্গ তখন গান অপেক্ষা রবাবের চর্চা বেশী করছেন, যে জন্য পরবর্তীকালে ছজ্জু খাঁ প্রভৃতি গুণীদের আমরা রবাবীয়া রূপেই খুজে পাই। গুলাব খাঁর কোনো গানে মহম্মদ শার নাম নেই— সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁর নামে এখনো দু-একখানি ভালো ধ্রুপদগান পাওয়া যায়। যেমন—

রঙ্গভরে দরস দেখত মন ইচ্ছা উপজত
রসকে রঙ্গীলে লাল।...
গুলাবকে প্রভুকে রস বস কর লীনো
গহনলাল কৃপাল দয়াল ॥

অথবা

চম্পবরণ নেত্রকমল বিসাল পুহ পনমাল
কামিনী হোয় মধু ঋতু আয়ী অব।...
গুলাবকে প্রভুকে লগী বিরহীগণ
নিত নিত পুকার আয়ী অব ॥

গুলাব খাঁ সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা জানি না। কোনো মতে গুলাব খাঁ নামে আর একজন গুণী ছিলেন যিনি অকবরের সমসাময়িক। অকবরের নাম-দেওয়া একখানি গানও গুলাব খাঁর রচনা বলে এই মতে দেখানো হয়ে থাকে। দুঃখের বিষয় গানখানিতে গুলাব খাঁর নামই নেই। গানখানি হল—

ভুজঙ্গী লালত কীনী দুরঙ্গী
গাতহি গাত পীত উমঙ্গী।...
ইয়া ছব সোঁ ওপ ভঙ্গৈরী
অকবর শাহ ঔর তুম অঙ্গসঙ্গী ॥

আর-একটি গানে অবশ্য অকবর শাহও আছেন, গুলাব খাঁও নায়ক উপাধি

নিয়ে উপস্থিত আছেন। অসুবিধা এবং সন্দেহের কথা এই যে, গানখানি আমরা পেয়েছি অন্য নায়কের ও অন্য লেখকের বা গায়কের নামে। গানখানি হল—

দিল্লীপতি নরেন্দ্র অকবর শাহ
জাকো ডর ডরে ধরণী পুহপমাল হলায়ো।…
কহত নায়ক গুলাব তুম চিরঞ্জীব রহো
শাহ দেত করোরন আরত ধায় ধায়
মৃগমাল পহরায়ো॥

আর, আমরা যে ভাষা পেয়েছি তা হল—
"দিল্লীপতি নরেন্দ্র **সিকন্দর শাহ**"

ইত্যাদি যার শেষ অংশে আছে "কহত **নায়ক গোপাল** তুম চিরঞ্জীব রহো" ইত্যাদি। সুতরাং এই গানটির উপর নির্ভর করে কোনো নায়ক গুলাবকে আকবরের রাজত্বকালে টেনে নিয়ে যাওয়া চলে না।

ইছাবরস

ইছাবরস সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারনাই নেই। তানবরস, মানবরস, নেমবরস ইত্যাদির মতো ইছাবরসও অজ্ঞাতপরিচয়; এঁদের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তাও আমরা বলতে অপারগ। কোনো মতে এঁকে সদারঙ্গের জামাতা বলে প্রচার করা হযেছে, কিন্তু এই প্রচারের সপক্ষে কোনো তথ্য পরিবেশন করা হয় নি। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, ইছাবরস মহম্মদ শার দরবারের গুণী ছিলেন। হয়তো তিনি ১৭শ শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই আন্দাজটুকু আমরা তাঁর গানের প্রকৃতি দেখে করে নিতে পারি। ইছাবরসের কবিতাগুলি কিছু উন্নত ধরণের। তাঁর দু একটি গানের নমুনা হল—

গুণ সমুন্দ্র তামে তন জহাজ
মন সৌদাগর লে চঢ়ী সাঁস
পবনকী জোর।…
ঐসো ধুরপদ জহাজ নিরখ
ছত্রপতি মহম্মদ শা লে আয়ো
ঔর ইছাবরসকো দিয়োলাখ করোর।

কিংবা

তুম নৈনমে মানো কেঁওকী ঘটাসে
উমড ঘুমড আয়ী।...
ইঙ্খাবরস পিয়া মহম্মদ শা কহত
ইযে দিনমে সস উপজায়ী।

কিংবা

আনি ইয়েহো আয়ে লাল মদমাত
কেসব বোবি অবীবগুলাল উডোঙ্গী।...
ইঙ্খাবরস পিয়া কবহি সহোঙ্গী
অবহি নন্দসোঁ জায় কহোঙ্গী।

সদারঙ্গ

সঙ্গীতজগতে স্রষ্টা হিসাবে তানসেনের পবেই স্থান পেয়ে থাকেন নিয়ামৎ খাঁ সদারঙ্গ। তানসেনের কন্যাবংশেব মুখ উজ্জ্বলকাবী এই ব্যক্তি ছিলেন ঔরংজেবের সমসাময়িক নাজির খুশাল খাঁব পুত্র লাল খাঁ সানীর সন্তান। ঔবংজেবের রাজত্ব-কালেই সদারঙ্গের জন্ম হয়। এঁর প্রকৃত নাম নিযামৎ খাঁ বা ন্যামৎ খাঁ, কিন্তু স্রষ্টা হিসাবে ইনি যে একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন— সেটি হল সদারঙ্গ। আমরা এঁর গানে কোথাও নিয়ামৎ খাঁ নাম পাই নি, শুধুমাত্র মনরঙ্গ-কৃত একখানি গান থেকে জানতে পেরেছি যে সদারঙ্গের প্রকৃত নাম নিয়ামৎ খাঁ। গানখানি হল—

আদ মহাদেব বীণবজায়ী
পাঈ ন্যামৎখান পিয়া সদরঙ্গ করকরম দিখাঈ।
সপ্ত স্বরনকী স্বর স্বরকী সপ্তক কর মনরঙ্গ
উনঞ্চাস কূটতান লেত সবগুণীজনকো সমঝাঈ॥

সদারঙ্গ ঠিক কোন্ সময়ে জন্মেছিলেন জানতে গেলে এঁর রচিত একখানি গানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। গানখানি হল—

আবন কহ গয়ে অগম ভঈলবা
উনকো; ভুজ ফরকত হৈ অঁখি মোরীবাঁঈ।
সগুন বিচারো রেখোরে বখনা
বেগ মিলনবা হোয় সদারঙ্গীলে আলমগীর সাঈ।

গানখানির মধ্যে আলমগীব শব্দটি আছে। এর অর্থ পৃথিবীপতিই হোক আর যাই হোক, সদারঙ্গ কখনোও হিন্দী বৃজভাষার গানের মধ্যে মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করে শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। অতএব এই আলমগীর হলেন বাদশাহ আলমগীব। প্রশ্ন হল, প্রথম বাদশাহ না দ্বিতীয়। দ্বিতীয় বাদশাহ সিংহাসনে বসেছিলেন ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে আর গত হয়েছিলেন ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তারও আগে আহম্মদ শা ছিলেন ১৭৪৮ থেকে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁর নাম নিয়েও কিছু রচনা তো সদারঙ্গের থাকা উচিত ছিল। তা যখন নেই তখন ধরে নিতে হবে যে মহম্মদ শার রাজত্বকালেই সদারঙ্গের মৃত্যু হয়েছিল। অতএব যে আলমগীরের কথা বলা হয়েছে তিনি ঔরংজেব আলমগীর। খুব সম্ভব এই গানটি সদারঙ্গের অল্পবয়সের লেখা যখন আলমগীর বর্তমান ছিলেন। এই বিচারে সদা-রঙ্গের জন্মসময় হয় ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। বংশবৈশিষ্ট্য অনুসারে সদারঙ্গ ছিলেন বীণকার ও ধ্রুপদধমারগায়ক। এঁর ধ্রুপদ ও ধমার -পদ্ধতির বহু রচনাও আছে। ধ্রুপদের সংখ্যা কিছু কম বটে, কিন্তু ধমার আছে অসংখ্য। প্রকৃতপক্ষে সদারঙ্গের জন্যই ধমার এত জনপ্রিয় হতে পেরেছিল। এঁর আগেকার কালের ধমার-কবিতা তো বলতে গেলে খুঁজেই পাওয়া যায় না। সদারঙ্গের ধ্রুপদও রচনা হিসাবে উচ্চস্তরের এবং ইনি কবি ছিলেন বলে রচনায় কিছু কাব্যিক সৌন্দর্যও লক্ষ্য করা যায়, শুধু নায়কের প্রশংসা দিয়ে কবিতাটি শেষ হয় না। উদাহরণ দেখুন—

সব বনমে কৈসে সোহে ঋতুরাজ দিন আঈ
মন্দ মন্দ পবন বহত বহু বরণ হোয় সুমন।...
সদারঙ্গকে প্রভু আজ লেতহি মুরলজী সাজ
বজাৱে পঞ্চমরাগ সুর নর হোয় মগন।

সদারঙ্গ সরগম দিয়ে এবং তিলানা দিয়েও ধ্রুপদরীতির গান লিখেছেন। যেমন—

সগমপধনিসস রিসনিধমপধমগ...
শুধ মুদ্রা শুধ বাণী সাচে সুরনসোঁ
অলাপ করে, সব রাগ জানে ঠারে
ঠারে কর দিখাৱে
তব গুণিয়নমে নায়ক কহাৱে।...
ধধপ মধপ মগরিস।

কিংবা

জালুম দের্ দের্ তাহুম তানা দেরেনা··
কিত বল জোই নীকি তান মহ্বুববন্দি
করত সদারঙ্গ ভুল সনিধপমগনিসগ।

সদারঙ্গের ধমাররীতির রচনা প্রায় প্রতি রাগের উপরেই আছে, সুতরাং তাঁর সংখ্যানির্ণয় করার প্রয়োজন কী। ধমার গানের ভাষা বা ভাব একই, কাজেই তার মাঝে বিচিত্রতা সম্পাদন করা শক্ত; তা সত্ত্বেও সদারঙ্গ একই প্রকৃতির গানকে নানা ভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। সদারঙ্গ প্রকৃত কবি ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ধ্রুপদ-ধমারের কবি সদারঙ্গ জনসাধারণে এবং সঙ্গীত-জগতে যে স্রষ্টা বলে পরিচিত হযেছিলেন সেটা তাঁর খ্যাল-সৃষ্টির জন্যে। বিলাসস্রোতে ভাসমান বাদশাহরা যখন চটুলতার ভক্ত হয়ে উঠেছেন, যখন জীবনটা হয়ে উঠেছে নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর তখন সদারঙ্গ গাম্ভীর্যকে চটুলতার সঙ্গে মিশ্রিত করে এমন-এক অপরূপ বস্তু সৃষ্টি করলেন, যা তরলতাকে দূরীভূত করে অন্তত ক্ষণিকের জন্যও জীবন সম্বন্ধে একটা মূল্যবোধ এনে দিতে সমর্থ হয়েছিল। সেই অপরূপ বস্তু হল কলাবন্তী খ্যাল, যা আমীর খুসরো এবং সুলতান হুসেন শর্কীর খ্যালের সঙ্গে ধ্রুপদীয় বিশিষ্টতার মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। সদারঙ্গের খ্যালরচনায় আছে নায়িকাভেদ, নায়কপ্রশংসা, ঋতুবর্ণনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমাবেশ। ১৭শ শতকের সাহিত্যে কাব্যে যে লীলাবর্ণনা প্রধান হয়ে উঠেছিল সেই লীলাবর্ণনা মানবীয় প্রকৃতি নিয়ে সদারঙ্গের নায়িকাভেদে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কত বিচিত্র সেই প্রকাশ এবং কত বিভিন্ন রাগরূপের মধ্য দিয়ে সেই প্রকাশ আপনাকে গোচরীভূত করেছে। সদারঙ্গের ভাষাজ্ঞানই-বা কত অদ্ভুত। তিনি ব্রজভাষা, লক্ষ্ণৌবী ভাষা এবং পঞ্জাবী ভাষায় এত দক্ষ ছিলেন যে তাঁর কবিতায় এই-সব ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার করতে তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হত না। সদারঙ্গ মহম্মদ শার প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং কবিতার নায়ক হিসাবে বহুসংখ্যক কবিতায় মহম্মদ শার উল্লেখ করেছেন। আজও জাত-খ্যাল বলতে যা বোঝায় তার বেশীর ভাগ সদারঙ্গের রচনা। সদারঙ্গের প্রভাবে অমীর খুসরো ইত্যাদির রচনা ও গীতি-বৈশিষ্ট্য লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে। এমন-কি কবাল ঘরানার বেশীর ভাগ গুণী সদারঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও রচনা গ্রহণ করেছেন। অমীর খুসরোর রচনা-পদ্ধতিকে অনুকরণ করলেও সদারঙ্গ এ র পদ্ধতিকে উন্নততর করেছিলেন। সদারঙ্গের অপর কীর্তি হল বীণবাদ্যের উন্নতি এবং স্বতন্ত্রভাবে কণ্ঠসঙ্গীতের অনুসরণে আলাপচারীর প্রচলন।

সদারঙ্গ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার মতামতও শোনা যায়, কিন্তু সে মতামতের বিশেষ মূল্য নেই। কারণ সেনী ঘরানার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে সদারঙ্গ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত বিবরণই পাওয়া যায়; রামপুর দরবারে, ছম্মন খাঁ সাহেবের বিবরণে উজীর খাঁ সাহেবের বংশতালিকায় আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয়েছে।

সদারঙ্গের দুই পুত্র ছিলেন, অদারঙ্গ ও মহারঙ্গ।

অদারঙ্গ

সদারঙ্গের প্রথম পুত্র অদারঙ্গ ১৭শ শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণত বয়সে মহম্মদ শার দরবার-গায়ক হয়েছিলেন। এঁর প্রকৃত নাম ছিল ফিরোজ খাঁ। ইনি বীণকার ছিলেন এবং ধমার ও খ্যালের অনুশীলন করতেন। নিজ রচনায় অদারঙ্গ নায়ক-প্রশংসা করেন নি কেন তার কারণটা বোঝা যায় না, যেখানে সদারঙ্গ বেশীর ভাগ গানে মহম্মদ শার গুণকীর্তন করেছেন। নায়ক প্রশংসা না থাকায় অদারঙ্গ ঠিক কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন সেটা বোঝা যায় না। অদারঙ্গ-রচিত একখানি গান পাওয়া যায় যাতে ইনি রতন সিং-এর নাম করেছেন। গানখানি ধ্রুপদ, ভাষা হল—

অরজ সুন লীজিয়ে হমারে রাও রাজা
বহাদুর রতন সিংহ দীন দুলহ আপকে।···
অদারঙ্গ তেরো হি কহাবত।···

এই রতন সিং যে কে তা বোঝা যায় না। নাগপুরের রতন সিং হলে অনেক পরের ব্যাপার হয়ে যায়, যখন অদারঙ্গ অন্তত ৯০ বছরের বৃদ্ধ হয়ে পড়েন; সে ক্ষেত্রে ঐ বয়সে রতন সিং-এর প্রশংসাসূচক গান লেখা একটু অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। যদি ঔরংজেবের রাজত্বকালের রতন সিং হন (?) তা হলে অদারঙ্গকে সদারঙ্গের পুত্র ভাবা চলে না, কারণ তখন অদারঙ্গের জন্মসময় সদারঙ্গের সমসময়ে বা আগে হয়ে যায়। গানখানি অন্যত্র জাফর খাঁর নামে পাওয়া যায়, যদিও ভাষাটা সামান্য তফাৎ এবং একটু যেন আধুনিকত্বপ্রাপ্ত। মহম্মদ শার রাজত্বকালে অদারঙ্গ ছিলেন এই কথা প্রমাণ করবার জন্য একখানি গানের উল্লেখ করা হয়। গানখানি হল—

অব তুম মানো মেরী বাত
প্যারী তুম পর বার জাউঁ।
মহম্মদ শাহ পিয়া গরে লগাবে
অদারঙ্গ কয়ত রায়॥

গানের ভাষা দেখলেই বোঝা যায় গানটিতে আধুনিক হাত পড়েছে এবং অর্থ পর্যন্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, অদারঙ্গের ভাষার মাধুর্যও এতে নেই; সুতরাং মনে করা স্বাভাবিক যে, এ গানটি অদারঙ্গের রচনা নয়। অদারঙ্গের রচনায় ভাবগাম্ভীর্য লক্ষণীয়। তাঁর গানে সদারঙ্গের মতো নায়িকাভেদ, ঋতুবর্ণনা ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়। বৃজভাষা পঞ্জাবী ভাষাও তিনি খ্যাল গানে যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। অদারঙ্গ রাগস্রষ্টাও ছিলেন; তাঁর রচিত অদারঙ্গী বা ফিরোজ-খানী টোড়ী সঙ্গীতগুণীমহলে প্রসিদ্ধ। অদারঙ্গের কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুতারিখ আমাদের জানা নেই। কোনো কোনো মতে অদারঙ্গকে সদারঙ্গের ভাই বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সে মত বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই, কেননা উজীর খাঁ সাহেবের ঘরের বিবরণ অন্যরকম পাওয়া যায়।

সদারঙ্গ, অদারঙ্গ খ্যাল গান গাইতেন কিনা আমরা জানি না। অন্তত তাঁদের ঘরানায় এত গান প্রচলিত নেই। আমাদের ধারণা, এঁরা রচনা করতেন, হয়তো বা সুরও দিতেন, কিন্তু গানগুলির পরিবেশনের ভার থাকত অন্যের উপর, গানের অলংকরণ ইত্যাদিও অন্যেরাই করতেন। এই প্রসঙ্গে হসন খাঁ, গুলাম রসুল, মীয়াঁ জানী, মনরঙ্গ প্রভৃতির নাম সকলে করে থাকেন। এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে অবশ্য আমাদের মহারঙ্গ, ন্যামৎ খাঁ প্রভৃতির বিষয়ে কিছু জানা প্রয়োজন।

মহারঙ্গ

মহারঙ্গ ছিলেন সদারঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র। এঁর প্রকৃত নাম ছিল ভূপৎ খাঁ। ইনি ১৮শ শতকের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বীণাবাদ্যে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিলেন। মহম্মদ শার রাজত্বের শেষ দিকে ইনি দরবারে স্থান গ্রহণ করেন। অদারঙ্গ যেমন ধমারী ও খ্যালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, মহারঙ্গও তেমনি বীণ-কাররূপে খ্যাত হন। এঁর শিক্ষাতেই জীবন খাঁ ও প্যার খাঁ বীণবাদনে কুশল হয়ে ওঠেন। সদারঙ্গ যেমন সদারঙ্গ শাহ বা শাহ সদারঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁর খ্যালসৃষ্টির জন্য, জীবন খাঁও তেমনি বীণাবাদনে বৈচিত্র্যের জন্য দরবারে জীবন শাহ বীণকার নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মহারঙ্গ সম্বন্ধে আর কিছু আমরা জানি না।

ন্যামৎ খাঁ

মহম্মদ শাহ বাদশাহ হবার আগে থেকেই দরবারে আমরা তিনজন ন্যামৎ

বা নিয়ামৎ খাঁর দর্শন পাই। একজন ছিলেন সেনী ঘরানার সদারঙ্গ ন্যামৎ খাঁ, সে কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় জন ছিলেন ফরুকৃশীয়রের সময়কার সেনীবংশীয় বলে পরিচিত খসুসিয়ৎ খাঁর পুত্র ন্যামৎ খাঁ, যিনি পরবর্তীকালে মহম্মদ শার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং যাঁর ভগ্নী ফরুকৃশীয়রের উপপত্নী ছিলেন। এই ন্যামৎ খাঁর সঙ্গীতজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তৃতীয় জন হলেন অমীর খুসরোর শিষ্যবংশীয় ন্যামৎ খাঁ কবাল, যিনি দিল্লী ঘরানার ধারক এবং রামপুরের বাকর আলী খাঁ সাহেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন। ন্যামৎ খাঁ কবাল সম্বন্ধে আর কিছু আমরা জানি না। তিনি কবালরীতি ও শুদ্ধরীতির খ্যাল গাইতেন এবং কলাবন্তী খ্যালকে কোনো দিনই তাঁর বংশে প্রচলিত হতে দেন নি। ইনি রচয়িতা ছিলেন কিনা বলতে পারি না, কারণ ন্যামৎ খাঁর নাম দেওয়া কোনো গান আমরা পাই নি।

হাসির খাঁ

হাসির খাঁ ছিলেন কবাল বংশেরই অপর একটি শাখার সন্তান। ইনি কবালী খ্যাল গাইতেন কিন্তু সদারঙ্গের কলাবন্তী পদ্ধতির প্রতি পরবর্তীকালে আকৃষ্ট হয়ে আপন সন্তান শক্কর ও মখ্খনকে গুলামরসুলের নিকট শিক্ষার্থী করে পাঠিয়ে দেন। হাসির খাঁ ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে জন্মেছিলেন। তাঁর জীবন-ইতিহাস অজ্ঞাত।

মনরঙ্গ

মনরঙ্গ অজ্ঞাতপরিচয়, তবে এঁর ঘরানা যে ধ্রুপদের ঘরানা ছিল এটা বোঝা যায়। খুব সম্ভব ইনি ১৮শ শতকের দিকে জন্মেছিলেন, এবং যুবাবস্থায় সদারঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রচনাকার হিসাবে মনরঙ্গের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ইনি ধ্রুপদ ও খ্যাল গান রচনা তো করেছেনই, তা ছাড়া সাদ্‌রার নবীন রূপেরও প্রচার করেছেন— যাতে ধ্রুপদের ভাব ও খ্যালের গতিবৈশিষ্ট্য একসাথে মিশে আছে। প্রকৃতপক্ষে সাদ্‌রার চলন দেখলে এ সন্দেহ জাগে যে, এ বস্তুটি কবাল গুণীরাই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কে কোন্ সময়ে করেছেন এটা জানা যায় না। মনরঙ্গের সময়ে এসে আমরা এর পরিষ্কৃত রূপটি দেখতে পাই। মনরঙ্গ ধ্রুপদ ঘরানার সন্তান বলে এঁর খ্যাল গানের ভাষায় ও ভাবে ধ্রুপদবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। "আদ মহাদেব বীণবজাই" এঁর একখানি ধ্রুপদী ভাষাযুক্ত প্রসিদ্ধ খ্যাল

গান। মনরঙ্গ জয়পুরী খ্যালঘরানার প্রবর্তক, যে ঘরানায় আমরা মহম্মদ খাঁ কৌঠীবালকে পেয়ে থাকি। মনরঙ্গের একখানি ধ্রুপদগানও আমরা পেয়েছি। গানখানি হল—

তুম হো বৃজকেলাল অব তুম
কৌন রূপ দিখাবত।...
মনরঙ্গ পাযে অকেলী বন্‌সীলীন
গাবি গারত॥

গুলাম রসূল

গুলাম রসূল ও তাঁর ভ্রাতা মীয়াঁ জানী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এঁরা করাল ঘরানার বংশধর ছিলেন এবং পরে বোধ হয় সদারঙ্গের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। কোনো মতে এঁরা দুজনেই হচ্ছেন সেই কৱাল বচ্চে যাঁদের সদারঙ্গ অল্পবয়স থেকে খ্যালে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। গুলাম রসূল ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে জন্মেছিলেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব শুজা উদ্দৌলার দরবারে শ্রেষ্ঠ গুণীরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁরা বংশানুক্রমে পঞ্জাববাসী ছিলেন, কিন্তু পরে লক্ষ্ণৌএ এসে বসবাস করতে থাকেন। গুলাম রসূল ও মীয়াঁ জানী আসফ্-উদ্দৌলার রাজত্বকালেও (১৭৭৫-১৭৯৭) বর্তমান ছিলেন এবং ঐ বয়সেও গানে ও কণ্ঠমাধুর্যে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। গুলাম রসূলের রচিত গান আজও প্রচলিত আছে বলে শোনা যায়, কিন্তু লেখকের নাম সংযুক্ত না থাকায়, কোন্ কোন্ গান এঁর রচনা তা বলা সম্ভব হয় না। আসফ উদ্দৌলার রাজত্বের শেষের দিকে গুলাম রসূলের মৃত্যু হয়। সদারঙ্গের খ্যালের প্রচার গুলাম রসূলের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ঐ গানে অপূর্ব মাধুর্যের সঞ্চার করেছিলেন এবং বহু শিষ্যকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিয়ে খ্যালের বহুলপ্রচারে সহায়তা করেছিলেন। শক্কর, মখ্‌খন এঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং স্বনামধন্য মীয়াঁ শোরী ছিলেন এঁর পুত্র। মীয়াঁ শোরী অবশ্য খ্যালপ্রচার অপেক্ষা টপ্পাপ্রচারে মন দিয়েছিলেন বেশী। যে মহম্মদ শার রাজত্বকালে এই সব গুণী বর্তমান ছিলেন তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কিনা তা বলতে পারব না, তবে তিনি যে সঙ্গীতপিপাসু ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গানের নায়ক হয়ে তিনি রঙ্গীলে উপাধিটি বয়ে চলেছেন আজীবন। মহম্মদ শা গান রচনা করতে পারতেন কিনা জানি না। এঁর রাজত্বকাল ছিল ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ-পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে আমরা পাই কীর্তনপদ এবং

সঙ্গীতগ্রন্থ -রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীকে, আর উড়িষ্যায় পাই পুরুষোত্তম মিশ্র, নারায়ণদেব ও কবিনারায়ণকে।

নরহরি চক্রবর্তী

নরহরি চক্রবর্তী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ চক্রবর্তী। বৈষ্ণব নরহরি চক্রবর্তী আপনাকে ঘনশ্যাম দাস নামে পরিচিত করিয়েছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে এঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এঁর গ্রন্থে উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। নরহরি গায়ক ছিলেন বলে মনে হয়। তবে তাঁর শিক্ষা কার কাছে হয়েছিল বা কতদূর হয়েছিল তা বলতে আমরা অক্ষম। ইনি কীর্তন পদও রচনা কবেছেন, এমন-কি প্রাচীন শাস্ত্রকে অনুসরণ করে প্রবন্ধ জাতীয় পঞ্চধাতুযুক্ত পদসৃষ্টিরও প্রয়াস করেছেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, পঞ্চধাতুযুক্ত প্রবন্ধ শাস্ত্রশুদ্ধ নয়, অতএব ধারণা করে নেওয়া যায় যে, শাস্ত্রপঠন তখন নূতন উদ্যমে বাংলায় শুরু হযেছে এবং সে উদ্যম এসেছে খুব সম্ভব বৃন্দাবনস্থিত উচ্চাংগ সঙ্গীতজ্ঞাতা সাধকদেব অনুপ্রেরণায়; কিন্তু সেই উদ্যমের মাঝে কণ্ঠস্থকরণ প্রবৃত্তি এত বেশী ছিল যে, বস্তুটির অর্থ কি সেদিকে সব সময়ে নজরটা ঠিক মতো থাকত না। প্রবন্ধে পাঁচটি ধাতুর নাম পাওয়া যায ঠিকই, কিন্তু চারটির বেশী ধাতু ব্যবহৃত হত না, এটা নরহরি চক্রবর্তী লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেন নি বলেই মনে হয়। নরহরি পদরচনায় ব্রজবুলি ব্যবহার করতেন এবং গোবিন্দ দাসকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা কম থাকায় সে চেষ্টা সব সময়ে ফলবতী হত না। অন্য দিক দিযে কিন্তু নরহরি অনন্য। আজ আমরা যে খেতরি উৎসব বিভিন্ন কীর্তনরীতির উদ্ভব সম্বন্ধে এত কথা বলতে পারছি তার মূলে রয়েছে নরহরি চক্রবর্তী -কৃত "ভক্তিরত্নাকার" ও "গীতচন্দ্রোদয়" নামক গ্রন্থ দুখানির ঐতিহাসিক উপাদান। "নরোত্তমবিলাস" গ্রন্থখানি শুধু নরোত্তম ঠাকুরের গীত-পদ্ধতি এবং অন্যান্য কীর্তনকারদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা পূর্ণ। নরহরির "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" গ্রন্থখানি সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ। ভক্তিরত্নাকর, গীতচন্দ্রোদয় এবং সঙ্গীতসারসংগ্রহ পুস্তকের সাহায্য আমরা বাংলার এবং ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। ১৭শ-১৮শ খৃষ্টাব্দে পরিভাষার ব্যাখ্যা কি ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তারও একটা আভাস পাই। নরহরি তাঁর গ্রন্থে সঙ্গীতসার, সঙ্গীতশিরোমণি, সঙ্গীতপারিজাত, কোহলীয়, সঙ্গীতদামোদর, নারদসংহিতা, পঞ্চমসারসংহিতা (দামোদরকৃত), নৃত্তরত্নাকর,

গীতপ্রকাশ, সঙ্গীতরত্নমালা, সঙ্গীতরত্নকোষ, ভরতসংহিতা ও সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

পুরুষোত্তম মিশ্র

পুরুষোত্তম মিশ্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ইনি ১৭শ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন এবং খেমুণ্ডীর রাজা গজপতি নারায়ণদেবের গুরু ছিলেন এ সংবাদটুকু পাওয়া যায়। কোনো মতে এঁর অপর নাম ছিল প্রেমানন্দ দাস, যিনি কবিরত্ন উপাধি পেয়েছিলেন। বৈষ্ণব পুরুষোত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলে ধারণা করা যায়, কিন্তু শিক্ষাগুরু কে ছিলেন তা আমরা বলতে পারি না। "বংশী-শিক্ষা" নামক সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। "বংশীশিক্ষা" গ্রন্থখানি আমরা পাই নি, সুতরাং সে-সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা অপারগ। পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম ছিল "নারায়ণ মিশ্র"।

নারায়ণদেব

নারায়ণদেব ছিলেন খেমুণ্ডীর রাজা। এঁর প্রকৃত নাম বোধ হয় গজপতি নারায়ণদেব ছিল। নারায়ণদেবের পিতার নাম ছিল "পদ্মনাভ"। ১৭শ শতাব্দীর শেষ দিকে নারায়ণদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে উড়িষ্যার খেমুণ্ডী নামক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। নারায়ণদেব গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাই তাঁর সভায় আমরা কবি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের দেখতে পাই। পুরুষোত্তম মিশ্র এঁর গুরু, যিনি একাধারে সিদ্ধান্ত-বাগীশ কবিরত্ন ও সঙ্গীতজ্ঞরূপে পরিচিত ছিলেন। নারায়ণদেব "সঙ্গীতনারায়ণ" ও "অলংকারচন্দ্রিকা" নামে দুখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সঙ্গীতনারায়ণে নূতন বিষয়বস্তু কিছু নেই, তবে কয়েকটি নূতন রাগের বিবরণ আছে। গ্রন্থটিকে সংকলন গ্রন্থ বলা চলে। "অলংকারচন্দ্রিকা" গ্রন্থখানি হল গীত-অলংকারের পরিচয়প্রদানকারী গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আমরা পাই নি, কাজেই কী কী অলংকার বর্ণিত হয়েছে এবং ব্যাখ্যা কী ভাবে দেওয়া হয়েছে, তা বলতে পারছি না। গ্রন্থখানিতে অলংকার-সংখ্যা দেওয়া আছে পঞ্চাশ।

নারায়ণ মিশ্র

নারায়ণ মিশ্র ছিলেন পুরুষোত্তম মিশ্রের পুত্র। উড়িষ্যাবাসী নারায়ণ

পিতার মতোই রাজসভা থেকে কবিরত্ন উপাধি পেয়েছিলেন অনেক সময়ে তাঁকে আমরা কবিনারায়ণ বলেও সম্বোধন করে থাকি। নারায়ণ ১৮শ শতকের প্রথম ভাগের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ খুব সম্ভব ১৭২৫-৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নিজগ্রন্থ "সঙ্গীতসরণি"তে নারায়ণ আপন পরিচয় দিয়েছেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে। "সঙ্গীতসরণি" গ্রন্থখানি একটু অদ্ভুত ধরণের। যদিও নারায়ণ "গীতপ্রকাশ" "সঙ্গীতনারায়ণ" ইত্যাদির নাম উল্লেখ করেছেন, তবু তিনি এমন কতকগুলি বস্তু নিজগ্রন্থে সনিবিষ্ট করেছেন, যা নিতান্তই তাঁর সৃষ্ট এবং প্রাচীন শাস্ত্র -সমর্থিত নয়। প্রবন্ধকে তিনি শুদ্ধ ও সূত্র এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন, এবং বলভদ্রবিজয়, রামাভ্যুদয়সূত্র ইত্যাদি অদ্ভুত নামে প্রচার করেছেন। সূত্র প্রবন্ধকে আমরা যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ভাববো তারও বিশেষ কোনো সম্ভাবনা নারায়ণ রাখেন নি।

নারায়ণ মিশ্রের জীবন-ইতিহাস সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম যুগও শেষ হয়েছে। ১৮শ শতকের মধ্যভাগে ১৭৫৭'র পরেই ইংরাজদের রাজত্বের গোড়াপত্তন হল। এর পরে মুসলিম বাদশাহ যাঁরা এলেন তাঁরা নামে শাসক হলেও কাজে রইলেন নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী হয়ে। তাঁদের ক্ষমতা শেষ হল এবং ইংরাজ যুগ বলতে যা বোঝায় তার শুরু হল। গায়কবাদকরা আশ্রয় হারা হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন, দরবারী সঙ্গীত লুপ্ত হল, সঙ্গীত ক্রমে জনসাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠতে লাগল। ধ্রুপদ চলে এল রেবায়, বেতিয়ায়, কাশীতে, বাংলায়; খ্যাল প্রতিপত্তি লাভ করতে লাগল, জমিয়ে বসল সে লক্ষ্ণৌতে, গ্বলিয়রে, জয়পুরে, মহারাষ্ট্রে। দিল্লীর সমারোহ শেষ হয়ে গেল শুধু এ দিকে ও দিকে কিছু কিছু অবশেষ মাঝে মাঝে দেখা দিতে থাকল। নূতন পরিবেশে নূতন যুগের সূত্রপাত হল।

প রি শি ষ্ট

গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করবার পর দেখা গেল, কিছু বক্তব্য অসাবধানতার ফলে বাদ পড়েছে। আমরা পরিশিষ্ট-ক অংশে সেগুলি বলবার চেষ্টা করছি। বক্তব্য হল—

১। আলোচিত জীবনীগুলির কয়েকটি তথ্য সম্পর্কে।

২। অনাবশ্যকবোধে বর্জিত জীবনীগুলির সঙ্গে অমনোযোগহেতু বাদ দেওয়া প্রয়োজনীয় জীবনীর পরিচয় সম্পর্কে। (এইখানে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে, আলোচ্য গ্রন্থে এমন কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞের জীবনীপ্রসঙ্গ বাদ পড়েছে, যাঁরা পরিচয়হীন অথচ যাঁদের রাগ ও রচনার সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত। চঞ্চলসস, বাণীবিলাস, ছবিনায়ক প্রভৃতি কয়েকজন তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। চঞ্চলসস মল্লার আজও সেনীঘরানায় গাওয়া হয়ে থাকে, এবং বরাড়ী রাগের প্রসিদ্ধ গান "বিরহন বাবরী"কে সেনীঘরানার বিশিষ্ট গান বলেই সকলে জানেন। গানটির সঞ্চারী আভোগ গাওয়া হয় না বলে কেউ বুঝতে পারেন না যে, এটি চঞ্চলসসের রচনা। এর আভোগ হল—

চঞ্চলসস প্রভু বিন তন তলফত রহত
ঔর নিস লাগত ভয়াবরী ॥)

১। গ্রন্থের ৪২ **পৃষ্ঠায়** দ্বিজ চণ্ডীদাসের জীবনী আলোচনাকালে আমরা চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালের এক দ্বিজ চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছি। তিনি কোনো মতে জয়ন্তী ঠাকুরের পিতামহ— জন্ম ১৭শ শতকের শেষে।

৫৯ পৃষ্ঠায় বৈজু সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা বেজু বেগ বাবর বলে একটি নামের উল্লেখ করেছি। বদাউঁনী-উল্লেখিত শেখ বঁজুর সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না ; তবে এই বঁজুনাথ দেখেই যে বৈজু বাবরের সঙ্গে তানসেনের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার জনশ্রুতি গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫৯ পৃষ্ঠায় গোপাললাল উত্তর দেশীয় গুণী এবং বৃন্দাবনের নিকটে কোথাও জন্মেছিলেন এই কথা লেখা আছে। অমীর খুসরো দেহলবীর মতো নায়কগোপালও কোনো মতানুসারে বিলগ্রামী ছিলেন ; এই মতে গোপাললাল বিলগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

১০৬ পৃষ্ঠায় রামদাসের জীবনী আলোচনাকালে বলা হয়েছে যে, তিনি বৈরাম খাঁর দরবারে যান। বদাউঁনী বলেছেন, বৈরাম খাঁ রামদাসকে লক্ষ্ণৌ থেকে

নিয়ে এসেছিলেন, এবং এক সময়ে গান শুনে প্রীত হয়ে তাঁকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

১১২ পৃষ্ঠায় তানসেনের রেবারাজ্যে গমনের কথা আছে। কোনো কোনো মতে ঐস্থানে যাবার আগে তানসেন দৌলত খাঁর নিকটে ছিলেন এবং সে সময়ে আদিল শাহের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গুরুর মতো সম্মান দিয়েছিলেন। খুব সম্ভব আদিল শাহের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হয়ে তানসেন রেবারাজ্যে চলে যান।

১১৩ পৃষ্ঠায় গৌস একজন ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা তিনটি গৌসযুক্ত নাম পেয়েছি—১) গ্বলিয়রের মহম্মদ গৌস, ২) সৈয়দ বন্দগী মহম্মদ গৌস ও ৩) দরবেশ শেখ মহম্মদ গৌস। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত গৌস নাচতে-গাইতে পারতেন বলে বদাউঁনী বলেছেন, কিন্তু এঁর সঙ্গে অপর দুজনের কী সম্পর্ক সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

১১৮ পৃষ্ঠায় বাজবহাদুর অকবরের সভাসদ-মধ্যে পরিগণিত হন এই কথা লেখা আছে। অকবরের সভায় আসার আগে কিংবা পরে যে বাজবহাদুর কোনো এক সময়ে রাজারামের সভায় গিয়েছিলেন তার প্রমাণ একখানি গান থেকে পাওয়া যায়—

> পচনগুণী সব ধুরপদকী কৌন পাবৈ
> বাজবহাদুরকে অঙ্গ।···
> ঐসো দাতা সুরপুরো রাজা রামচন্দ্র
> দেত করোরন রীঝত রাগরঙ্গ॥

১২৬ পৃষ্ঠায় ধীরজকে ১৬শ শতকের গুণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মতে ওরছারাজ্যের ইন্দ্রজিৎ সিং ধীরজ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি তানসেনের সমসাময়িক ছিলেন। (অপর এক ধীরজ ছিলেন সেনী বংশীয় সুখসেনের পৌত্র)।

১২৯ পৃষ্ঠায় মীরা মধনায়কের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা আছে। করম ইমাম বলেছেন, এঁর প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ নিজামুদ্দীন অহম্মদ এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিলগ্রামী সহরে বর্তমান ছিলেন। ধ্রুপদী মধনায়কের একখানি গান হল—

> সারসবদনী সারঙ্গনয়নী চম্পকবরনী
> অমৃতবচনী।···
> মধনায়ক প্রভুসোঁ করত প্রেমমধুর বাণী
> তীনলোক শ্রেষ্ঠ মেরী শ্রীমহারানী॥

১২৯ পৃষ্ঠায় চঞ্চলসেন খ্যালগায়ক ছিলেন এই কথা বলা হয়েছে। ইনি যে খ্যালের বহু প্রকার রীতির একটির আবিষ্কর্তা তাও জানানো হয়েছে। খ্যাল যে, অকবরের সময়ে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি, করম ইমাম সেই প্রমাণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইনি খ্যাল প্রসঙ্গে বাজবহাদুর, সুরজ খাঁ, চাঁদ খাঁর নামও করেছেন ; আর আমরা বলেছি যে, এঁদের ধ্রুপদগানের প্রকৃতি হয়তো এমন ছিল যা থেকে খ্যালপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করা ছিল খুব সহজ ব্যাপার। পরিবর্তনের এই সুযোগ থাকার জন্যই হয়তো ঐ সময়ে তিন রীতির খ্যালের প্রচলন হয়েছিল, যথা—

১) খুসরোর দিল্লী রীতি, ২) হুসেন শর্কীর জৌনপুরী রীতি এবং ৩) ধ্রুপদী রীতি।

এই ধ্রুপদী রীতি পরবর্তীকালে খয়রাবাদী, কবীরী ইত্যাদি রীতির জন্ম দেয়। ধ্রুপদের অনুকরণে খ্যালের রীতিগুলিকেও বাণী বলা হত। চঞ্চলসেন দিল্লী-রীতি বা বাণীর কিছু পরিবর্তন সাধন করে নতুন পঞ্জাবী বাণীর সৃষ্টি করেন।

১৬৩ পৃষ্ঠায় ফকীরুল্লার গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে শাজাহান ও ঔরংজেবের সময়ে যে খ্যাল গান প্রচলিত ছিল তারো যেমন উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি টপ্পা, ঠুংরী জাতীয় গানের চর্চা যে সে সময়ে ছিল তারো ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মীর্জা খাঁও সে ইঙ্গিত তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন।

১৬৭ পৃষ্ঠায় গুলাব খাঁর পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মহম্মদ শার রাজত্বের শেষ দিকে আর-এক গুলাবের নাম পাওয়া যায় যিনি ধ্রুপদী ছিলেন। রাজস্থানের এই গুলাব খাঁ এবং মহম্মদ শার দরবারী গায়ক গুলাব খাঁ বোধ হয় একই ব্যক্তি।

১৭১ পৃষ্ঠায় রতন সিং সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মহম্মদ শার সমসময়ে ভরতপুরের রতন সিং বর্তমান ছিলেন। রাওরাজা বলতে অদারঙ্গ যদি তাঁকে বুঝিয়ে থাকেন, তা হলে অদারঙ্গের আবির্ভাব-কাল আমরা অনুমান করতে পারি ; সেই কাল হবে ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বা কিছু আগে অর্থাৎ ১৬৯০ থেকে ১৭১০এর মধ্যে। অদারঙ্গ বাদশাহ মহম্মদ খাঁ ও দ্বিতীয় আলমগীরকে প্রশংসা করে গান লিখেছিলেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায়, সুতরাং পূর্বোক্ত জন্মকাল অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। তবে মহম্মদ শার দরবারে তিনি আদৌ ছিলেন কিনা সেটাই প্রশ্ন ; থাকলেও হয়তো শেষের দিকে ছিলেন।

১৭২ পৃষ্ঠায় কোনো কোনো মতে অদারঙ্গকে সদারঙ্গের ভাই বলে বর্ণনা করা হয়েছে এই কথা লেখা আছে। কোথাও অদারঙ্গকে জামাই বলে পরিচয় দেবাব চেষ্টাও আছে।

১৭২ পৃষ্ঠায় মহারঙ্গ সদারঙ্গের পুত্র বলে লেখা আছে। জীবন খাঁ ও প্যার খাঁ নামে এঁর দুই পুত্র ছিলেন। ভাতখণ্ডেজীব হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির চতুর্থ খণ্ডে জীবন খাঁ ও প্যার খাঁর পিতার নাম দেওয়া আছে মহাবৎ খাঁ বলে (যাঁকে আমরা বলেছি ভূপৎ খাঁ মহারঙ্গ) এবং সদারঙ্গের ভাই বলে তাঁর পরিচয় দেওযা আছে। অদারঙ্গের নামই নেই। পণ্ডিতজী এই পরিচয়-তালিকা কোন্ সূত্রে পেয়েছিলেন জানি না।

২। মহম্মদ আদিল শা ছিলেন দিল্লীর সুলতান শের শার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নিজাম খাঁর পুত্র। এঁর প্রকৃত নাম ছিল মুবারিজ খাঁ। খুব সম্ভব ১৫২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে আদিল শার জন্ম হয়। এঁর বাল্য ও যৌবন সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না এবং সঙ্গীতশিক্ষার বিবরণও কোথাও পাই নি। তবে এটুকু জানা যায় যে, শের শার পুত্র ইসলাম শা, ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শা এবং ইসলাম শার প্রিয়পাত্র দৌলত খাঁ প্রত্যেকেই সঙ্গীতরসিক ছিলেন; সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, আদিল শা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। গীত ও বাদ্য সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতার জন্য তানসেন ও বাজবহাদুর তাঁকে যথেষ্ট মান্য করতেন এবং বদাউনীকে বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, গীত ও বাদ্যের সূক্ষ্ম কতকগুলি বিষয় তাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলেন। হয়তো ইসলাম শার রাজত্বকালেই এই শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল, কারণ তানসেন আদিল শা বা অদলীর রাজত্বকালে দরবারে ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনে হয় অদলীর নৃশংসতা তানসেনকে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। আপন ভাগিনেয়কে রাজ্যের লোভে হত্যা করে অদলী ইসলাম শার মৃত্যুর (১৫৫৪ খৃ) কয়েকদিন পরেই দিল্লীর বাদশা হন, কিন্তু মাত্র তিন বছরের জন্য (মৃত্যু ১৫৫৭খৃ)।

ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ প্রণয়নকালে উপাদান সংগ্রহকার্যে মধ্যযুগীয় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থের সাহায্য আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের গ্রন্থে লিখিত মন্তব্যের যুক্তিসিদ্ধতা ও ব্যাপকতা নির্ধারণকল্পে ঐ ইতিহাসগুলির কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপিত ও আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১। 'মুন্তখবুৎতৰারিখ' তানসেন ও বাজবহাদুরকে অদলীর শিষ্য বলে বর্ণনা করেছে। তানসেনের গ্বলিয়রে অবস্থান, ইসলাম শার দরবারে কৃতী গায়করূপে প্রবেশ এই শিষ্যত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। বাজবহাদুরকে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে আমরা হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে দেখি, তা হলে তিনি অদলীর কাছে শিখলেন কবে। এইসব বিরুদ্ধ বিচার তৰারিখের বর্ণনার সত্যতার বিপক্ষে গিয়েছে।

এই গ্রন্থেই শেখ বঁজুর সঙ্গীত-পারঙ্গমতার কাহিনী আছে। শেখ অধনের শিষ্য শেখ বঁজু তানসেনকে সঙ্গীতপ্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। এ কাহিনী অন্য কোথাও নেই, এবং এ কাহিনীর পিছনে কোথায় যেন একটু হিন্দু-বিদ্বেষ লুকিয়ে আছে। বদাউঁনী সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যত ভাবে পেরেছেন মুসলীম গুণীদের প্রাধান্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন, এই কারণেই তাঁর বিবরণ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্বাস না করলেও বিবরণটি একটি ক্ষতি করেছে; শেখ বঁজুকে বৈজুনাথ বা বৈজু বাৱরের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার পথকে প্রশস্ত করেছে।

অবশ্য তৰারিখ আমাদের কিছুটা উপকার করেছে— আমরা জানতে পেরেছি যে, তানসেন ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের দরবারে আসবার মতো প্রসিদ্ধ বা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হন নি, অথচ সে সময়ে বাজবহাদুর, রামদাস ও ভগৎ ঐ দরবারে সম্মানিত সঙ্গীতজ্ঞরূপে অবস্থান করছেন। তানসেনের নাম হয় ইসলাম শার দরবারে।

২। 'মিরাতীসিকন্দরী' কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়েছে; জানিয়েছে যে, নায়ক বকষুর এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম নায়ক হুসেন। ইনি দরিয়া খাঁর দরবারে ছিলেন। ঐ দরবারের অন্যান্য গুণীদের নামও ঐ গ্রন্থে আছে, যথা, নায়ক অবু, নায়ক চতর ও তাঁর পুত্র রঙ্গ খাঁ প্রভৃতি। গ্রন্থোক্ত নামগুলি অন্য কোথাও কোনোভাবে না পেয়ে সন্দেহবশে আমাদের গ্রন্থে উল্লেখ করতে পারি নি।

৩। 'মিরাতী আফতাবহুমা' ১ম বহাদুর শার দরবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য

পরিবেশন করেছে; বলেছে যে, ঐ দরবারে সদারঙ্গ এবং তাঁর গুরু দেবকবি ছিলেন। গ্রন্থের এই তথ্য আমাদের অনেক ভাবে উপকার করেছে। আমরা জানিয়েছি যে, সদারঙ্গ ঔরংজেবের রাজত্বকালে অল্পবয়স্ক; কিন্তু তখন থেকেই তিনি খ্যাল গান লিখছেন, এবং কাব্যমাধুর্য ও ভাষাসৌন্দর্য নিয়ে গবেষণা করছেন, কারণ তখন তিনি শাহজাদা আজমের আশ্রিত পণ্ডিত বেদের কাছে কাব্যের পাঠ নিচ্ছেন। (আজমের উৎসাহে এই বেদকবি 'রাগরত্নাকর' নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ লিখেছিলেন)। প্রশ্ন উঠতে পারে, খ্যাল লেখার প্রেরণা সদারঙ্গ কোথা থেকে পেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ফকীরুল্লা ও করম ইমাম। তাঁরা বলেছেন, অমীর খুসরো, হুসেন শর্কী ও ধ্রুপদ বাণীর খ্যাল তখন প্রচলিত ছিল, তবে সীমাবদ্ধ ভাবে। কিন্তু সীমাবদ্ধ হলেও দরবার থেকে সে কোনো সময়েই লুপ্ত হয়ে যায় নি। ঔরংজেব পছন্দ না করলেও অন্তঃপুরে তার প্রসার ছিল এবং শাহজাদারা এ গানে উৎসাহ দিতেন। বিশেষত শাহজাদা আজম ও তাঁর পুত্র যে খ্যালের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এ তথ্য প্রমাণ করবার মতো উপাদান আমাদের হাতে আছে; সে উপাদান হল একখানি অতিপ্রচলিত গান, যার ভাষা গায়কদের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিকৃত হয়ে পড়েছে। ইতিহাস বলে শাহজাদা আজমের এক পুত্র ছিলেন যাঁর নাম বেদরবখৎ। এই বেদরবখতের মঙ্গল কামনা করে এক অজ্ঞাতনামা গায়ক লিখেছিলেন—

সুঘর বনা গাবো সব মিলকে
বেদরবখৎ পিয় প্যারা।
চার জুগ জীবো করোড় বরসোঁ।
শাহে আজমকো নন্দন
জোলোঁ রহে ধ্রুবতারা॥

লেখার পদ্ধতিটি সদারঙ্গের, কিন্তু নাম না থাকায় জোর করে কিছু বলা যায় না। কৱালঘরানার পূর্বপুরুষদের রচনার সঙ্গে পরিচয় না থাকায় মুশকিল হয়েছে আরো বেশী। যাই হোক, আজমের মৃত্যুর পর সদারঙ্গ কোথায় গেলেন তাই নিয়ে যে বিব্রত ভাব আমাদের ছিল মিরাতী আফতাবনুমার উক্তির ফলে সে ভাব আমরা কাটাতে পারলাম। দেখলাম, সদারঙ্গ প্রথমে বহাদুর শার (১ম) দরবারে গেলেন, তারপর গেলেন জহান্দরশার কাছে, অর্থাৎ তিনি কোনো দিনই দিল্লীর দরবার ছেড়ে অন্য কোথাও যান নি।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৯	গ্রামে গেয়	গ্রামেগেয়
৪	২০	সমবেত ভাবে	সমবেতভাবে
৪	২৩	পাবস্পরিক	পারস্পরিক
৫	২৬	শ্রুতি জাতি	শ্রুতিজাতি
১১	২৮	অসাধ্য	অসাধ্য হয়
১৫	৩	নাম ভেদ থাকলেও	কেবলমাত্র নাম-ভেদ থাকলে
১৫	৩	স্বরূপভেদ না থাকলে	স্বরূপভেদ না থাকলেও
১৬	১৮	জন্য রাগ	জন্যরাগ
২১	১২	পোস্তো	পশ্‌তো
২১	১৮	তবানা, তির্‌বটের নাম	তরানার নাম
২৩	২	খ্যাল তরানা তির্‌বট,	খ্যাল তরানা,
২৩	২৩	'শৃঙ্গার প্রকাশ'	'শৃঙ্গারপ্রকাশ'
২৫	২৮	'শৃঙ্গারহাব'	'শৃঙ্গারহার'
৩২	৯	নিবাসী এক	নিবাসী এই
৪৫	১৯	সঙ্গীতরূপে	সঙ্গীতরাজে
৫২	১	কলীগঞ্জ	কলিঞ্জর
৫৩	২৩	ভালু	ডালু
৫৬	২৬	ভাঁড়া	ডাঁড়া
৫৯	২১	নাগবর্ণনা	নাদবর্ণনা
৬১	১৪	নে এসে	নেএসে
৬২	৬	ভাঁতী	ডাঁড়ী
৭১	৮	লহবতালাব	লহরতালাব
৭৭	৭	নরথি	নরসি
৮১	২০	নাঁর	নাঁব
৮৬	১৪	ওরাগসোরটের পদ এই চারখানি গ্রন্থরচনা	এই তিনখানি গ্রন্থ ও 'রাগ সোরট' ইত্যাদির পদরচনা
৯১	১২	আর কোনো	আর কোনো ভাবেই
৯২	১৭	নায়কের	নায়কের গুরুকে ?

৯৯	২৬	রঘুনন্দেব	বঘুনন্দনের
১০১	২৭	মেঘকর্ণ	মেষকর্ণ
১০২	২২	একটিমাত্র স্থলেই পাওয়া সম্ভব	একটি স্থলে একটি মাত্র রূপেই পাওয়া সম্ভব
১০১	২২	সে স্থলে	প্রকৃতপক্ষে, এই রাগরাগিণীবিভাগের সুযোগ নিয়ে
১০৩		নীলাধবী	নীলাম্বরী
১০৩	১৮,২০	সিংঘণার্ষের	সিংঘণার্ষের
১০৩	১৯	সিংঘণার্যও	সিংহনার্যও
১০৩	২৭	কিংবা	মত
১০৬	১০	বদাউনীব	কোনো কোনো
১০৮	২	শেল	শেখ
১০৯	৭	চাঁদ খাঁ	চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ
১০৯	২৪	উচ্চবাক্য	উচ্চবাচ্য
১১২	৪	পৈত্রিক নয।	পৈত্রিক নয়,
১১৩	২২	'তিত্ত'	'তিও' বা 'তিয'
১১৩	২৮	ধ্রুবপদব	ধ্রুবপদাব
১১৮	১৬	১৫৭০	১৫৬০
১২৩	২৬	খগবী	সগরী
১২৪	২২	বরখৎলা	বরখৎবলী
১২৬	১৪	শাসবো	শামবো
১২৮	২২	গুণ খাঁ	কান খাঁ
১৩৪	৪	ভৈববী আছে	ভৈবব আছে
১৫২	১০	বচনা কবে	রচনাকার
১৫৫	২১	মুখঢালি	মুখচালি
১৭৩	২,৪	ফক্কশীয়রের	জহান্দর শার
১৭৩	২	সেনীবংশীয়	কোনো মতানুসারে সেনীবংশীয়
১৭৩	১৯	শতকের দিকে	শতকের প্রথম দিকে